খুনির খোঁজে গোয়েন্দা

ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দ্যেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অপ্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যান্ডস কে - যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পাবেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন - *subhajit819@gmail.com*.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU

খুনির খোঁজে গোয়েন্দা

শ্রীমন্টু চক্রবর্তী
সঙ্কলিত

সরস্বতী লাইব্রেরী
৩, কৃপানাথ লেন ❑ কলকাতা ৭০০০০৫

প্রকাশক
সরস্বতী লাইব্রেরী
৩, কৃপানাথ লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৫

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা ২০০৬

প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ঃ সত্য চক্রবর্তী

প্রাপ্তিস্থান ঃ
সরস্বতী বুক ডিপো
৭০, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট (বড়বাজার)
কলকাতা-৭০০ ০০১

সরস্বতী লাইব্রেরী
১৮এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট (কলেজ স্ট্রীট বই মার্কেট)
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক ঃ
কম্পুকালার, কলকাতা

মূল্য ঃ পঁয়ত্রিশ টাকা।

উপহার

সূচীপত্র

দুই বন্ধুর কীর্তি--প্রফুল্ল রায়	৫
হত্যার পরের ঘটনা—বিমল মিত্র	২০
হত্যাকারী কে—পাঁচকড়ি দে	২৮
খানিকটা তামার তার—হেমেন্দ্রকুমার রায়	৩৯
অন্ধকারে গোলাপ বাগানে— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৪৮
চিতা রহস্য—ইমদাদুল হক মিলন	৫৮
সোনার বিগ্রহ—মঞ্জিল সেন	৬৮
খুনি কে?—খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৮৫
গোবিন্দদার গোয়েন্দাগিরি—সুনির্মল বসু	৯২
রহস্যের সন্ধানে—আশাপূর্ণা দেবী	৯৫
কঙ্কে কাশির কাণ্ড—শিবরাম চক্রবর্তী	১০১
হরবিলাসের মৃত্যু রহস্য—বনফুল	১১৫
নবার ডাইরি—লীলা মজুমদার	১২২
ভয়ঙ্কর ভাড়াটে ও পরাশর বর্মা—প্রেমেন্দ্র মিত্র	১৩০
সবুজ রাক্ষস—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	১৩৯
বেসরকারী গোয়েন্দা—ধীরেন্দ্রলাল ধর	১৫৬
মুখার্জী ভিলায় খুন—বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৬৪
হীরের মুকুট উদ্ধার—তপতী চক্রবর্তী	১৭২

দুই বন্ধুর কীর্তি

প্রফুল্ল রায়

যদিও সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে, এখনও ভাল করে সকাল হয়নি। বম্বে শহর, যার নতুন নাম মুম্বাই। দেশের পশ্চিম প্রান্তে বলে এখানে সূর্যোদয় হয় অনেক দেরিতে। এই মুহূর্তে চারদিকে অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে ঠিকই, আকাশের গায়ে আবছা আলোর ছোপও ধরেছে, কিন্তু পঞ্চাশ ফুট দূরের কোনও কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না।

ছেলেবেলা থেকে সঞ্জুর খুব ভোরে ওঠা অভ্যাস। পাঁচটা বাজলে সে আর শুয়ে থাকতে পারে না। হোটেলে তাদের ডবল-বেড রুমে অন্য একটা খাটে বাবা তখনও ঘুমোচ্ছেন। সে মেঝের কার্পেটের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে একটা বাইনোকুলার নিয়ে ঘরের লাগোয়া ব্যালকনিতে চলে এসেছিল। ক'দিন ধরে ভোরের একটা দৃশ্য তাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে। এই নিয়ে তার নতুন বন্ধু রাজুর সঙ্গে—মানে যার ভাল নাম রজত মেনন, অনেক কথাও হয়েছে। সঞ্জু একবার ডান পাশের একটা রুমের ব্যালকনির দিকে তাকাল। অন্য দিন এই সময় রাজুও ওখানে এসে দাঁড়ায়। আজ তাকে দেখা গেল না। নিশ্চয়ই ওর ঘুম এখনও ভাঙেনি।

সঞ্জুদের হোটেলের সামনে দিয়ে ঝকঝকে রাস্তা চলে গেছে। তার ওধারে লাইন দিয়ে উঁচু উঁচু নারকেল গাছ। তারপর সোনালি বালির জুহু বীচ, সারা পৃথিবী যার নাম জানে। বীচের গা থেকে আরব সাগর ধুধু দিগন্তে গিয়ে মিশেছে।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই অন্যদিনের মতো বীচে কিছু লোকজন চোখে পড়ছে। তবে কেমন যেন ঝাপসা মতো। সবাই এসেছে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য। কেউ জগিং করছে, কেউ দৌড়াচ্ছে, কেউ বালির ওপর শুয়ে বা বসে যোগাসন প্র্যাকটিস করছে। বয়স যাদের বেশি, তারা ধীরে ধীরে হাঁটাহাঁটি করছে।

বীচের দিকে লক্ষ্য ছিল না সঞ্জুর। কোণাকুণি রাস্তার ওপারে যে বিরাট দশতলা বাড়িটা—সেইদিকে সে তাকিয়ে আছে। রাস্তায় মানুষজন নেই। মুম্বাই শহরের ঘুম এত ভোরে কখনও ভাঙে না। অবশ্য স্বাস্থ্য নিয়ে যারা ভাবে কিংবা যাদের জরুরি কাজ থাকে তারা ছাড়া এসময় কেউ বিছানা ছেড়ে ওঠে না।

বিরাট বাড়িটার একতলা জুড়ে একটা ব্যাঙ্ক এবং ছোটখাট দু'চারটে অফিস। ওপরের তলাগুলোতে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের নানা জাতের মানুষ থাকে।

ক'দিন ধরে ভোরবেলার অস্পষ্ট আলোকে ক'টা লোককে দেখতে পাচ্ছিল সঞ্জু। নিজেদের মধ্যে কী পরামর্শ করে তারা ব্যাঙ্কটার তিন দিক ঘুরে দেখে চলে যাচ্ছিল। মিনিট পনের-কুড়ির বেশি তারা কোনও দিনই থাকেনি। একটা লম্বা জিপে করে ওরা আসত; আবার ওই গাড়িটাতেই চলে যেত।

আজ কিন্তু লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে না। এত দেরি করে তারা কখনও আসে না। সঞ্জু এবং রাজু, দু'জনেরই ধারণা হয়েছিল, লোকগুলোর মাথায় খারাপ কোনও মতলব আছে। ওরা যদি আর না আসে, ধরে নিতে হবে, তারা যা ভেবেছে সেটা পুরোপুরি ভুল।

সঞ্জুর বয়স চোদ্দ। এ বছর সে ক্লাস নাইনে উঠেছে। ডিটেকটিভ বইয়ের সে পোকা। তার স্বপ্ন শার্লক হোমস বা এরকুল পোয়ারের মতো দারুণ দারুণ কাণ্ডকারখানার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে রহস্যের সমাধান করা। মা-বাবা বলেন, আগে বড় হও, পড়াশোনা শেষ হোক, তারপর ওসব ভাবা যাবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। রহস্যের গন্ধ পেলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ নিয়ে মা-বাবাকে মাঝে মাঝে কম ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না। বড় বড় ডিটেকটিভদের মতো সঞ্জু বাইনোকুলার, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, অপরাধীদের খোঁজে উঁচু উঁচু বাড়িতে ওঠার জন্য হুক-লাগানো মজবুত দড়ি—পয়সা জমিয়ে জমিয়ে এমন অনেক কিছু কিনে ফেলেছে।

মা, বাবা, এক দিদি আর সঞ্জু—সব মিলিয়ে ওরা চারজন। বাবা অরিন্দম বসু একটা বিরাট কোম্পানির মস্ত অফিসার। হঠাৎ তাঁকে কলকাতা থেকে মুম্বাইতে

বদলি করা হয়েছে। বাড়ির সবাইকে দিন দশেক আগে তিনি এখানে নিয়ে চলে এসেছেন। তাঁদের জন্য কোম্পানি পালি হিলে একটা ফ্ল্যাট দেবে। আপাতত সেটা রং করে, ফার্নিচার দিয়ে সাজানো হচ্ছে। যতদিন কাজটা শেষ না হয় সঞ্জুরা হোটেলে থাকবে।

সঞ্জুর বাবা যে কোম্পানিতে কাজ করেন, রাজুর বাবা রাধাকৃষ্ণ মেনন সেই একই কোম্পানির বড় অফিসার। উনি ছিলেন তিরুবন্তপুরমের অফিসে। সেখান থেকে অরিন্দম বসুর মতো তাঁকেও মুম্বই ট্রান্সফার করে আনা হয়েছে। তিনিও সঙ্গে করে বাড়ির সবাইকে নিয়ে এসেছেন। একই হোটেলে তাঁদেরও রাখা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ মেননরা সব মিলিয়ে তিনজন। তিনি, তাঁর স্ত্রী জানকী মেনন এবং তাঁদের একমাত্র ছেলে রাজু। পালি হিলে সঞ্জুরা যে ফ্ল্যাটটায় গিয়ে উঠবে, তার পাশের ফ্ল্যাটটা দেওয়া হবে রাজুদের। সেটাও এখন ঝেড়েপুঁছে ফিটফাট করা হচ্ছে।

রাজু সঞ্জুরই বয়সী। সেও এ বছর ক্লাস নাইনে উঠেছে। মুম্বই আসার পর দু'জনকে একই স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। সঞ্জুর দিদি লেডি ব্রাবোর্নে বি. এ. ফার্স্ট ইয়ারে পড়ত। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট এনে তারও এখানকার কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

ক'দিনই বা সঞ্জুরা এসেছে! কিন্তু এর মধ্যেই রাজুর সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেছে। সারাদিন গল্প। হোটেলে আর কতক্ষণ থাকে। সামনের জুহু বীচে তো যায়ই। মুম্বইতে বেড়াবার কি মোটে একটা জায়গা! আরও দূরে দূরে তারা চলে যায়। এয়ার-ইণ্ডিয়া পার্ক, এসেল ওয়ার্ল্ড থেকে শুরু করে মেরিন ড্রাইভ, মালাবার হিলসের হ্যাঙ্গিং গার্ডেন, গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া পর্যন্ত দেখে এসেছে। কাউকে না জানিয়েই গেছে। জানাতে গেলে মা-বাবারা একেবারেই রাজী হতেন না।

সঞ্জুর মতো রাজুও ডিটেকটিভ গল্প পড়তে ভীষণ ভালবাসে কিন্তু সত্যিকারের ডিটেকটিভ হবার কথা কখনও ভেবে দেখেনি। সঞ্জু যখন বলল, সে কলকাতায় দু'চারটে রহস্যের জট ছাড়িয়েছে এবং মুম্বইতে এসে আরও একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে তখন রাজুর চোখ উৎসাহে চকচক করে উঠেছিল। মুম্বইয়ের রহস্যটা কী, রাজু জানতে চাইলে ভোরবেলায় সেই লোকগুলোর কথা বলেছিল সঞ্জু। রাজু প্রায় লাফিয়ে উঠে বলেছে, সে-ও পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে ব্যালকনিতে এসে সন্দেহজনক লোকগুলোকে লক্ষ্য করবে। তাকে বাদ দিয়ে সঞ্জু যেন কিছু না করে। সঞ্জু একজন সহকারী পেয়ে খুশি হয়েছিল।....

যে দশতলা বাড়িটার তলায় ব্যাঙ্ক সেদিকে তাকিয়েই ছিল সঞ্জু। সে বেশ দমেই গেছে। একটা রহস্য হাতের মুঠোয় চলে আসতে আসতে হঠাৎ যেন ফসকে গেল।

লোকগুলো যখন আসবেই না তখন আর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। তার চেয়ে বরং রাজুকে ডেকে নিয়ে এক পাক বীচে ঘুরে আসা যাক। সে ঘরের দিকে পা বাড়াতে যাবে, হঠাৎ ডানদিক থেকে রাজুর চাপা গলা ভেসে এল, 'ওই দেখ, সেই জিপটা আসছে-'

কখন ঘুম ভাঙার পর রাজু পাশের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে, জানতে পারেনি সঞ্জু। একটু চমকে উঠে সে লক্ষ্য করল, সত্যিই চেনা জিপটা ডানদিকের একটা বাঁক ঘুরে এধারে আসছে। বলল, 'এখন আর কোনও কথা বলো না। চুপচাপ দেখে যাও ওরা কী করে। আমরা যে ওদের ওপর নজর রাখছি, একদম যাতে টের না পায়।'

রোজই এই কথাগুলো বলে সাবধান করে দেয় সঞ্জু। রাজু মাথা নেড়ে জানাল—আচ্ছা।

অন্যদিনের মতো লোকগুলো আজও ব্যাঙ্ক থেকে খানিকটা দূরে জিপ থামিয়ে নেমে পড়ল। আগে পাঁচজনের বেশি কখনও আসেনি। আজ দেখা গেল—সাতজন। সংখ্যাটা বেড়ে গেছে।

লোকগুলো নেমে ব্যাঙ্কের সামনে ভাগে ভাগে এমনভাবে দাঁড়াল যাতে মনে মনে অদৃশ্য লাইন টেনে ওদের জুড়ে দিলে একটা রেক্টেঙ্গল বা আয়তক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। সেটা বোধহয় পছন্দ হলো না। আবার অন্যভাবে দাঁড়াল। এবার লাইন টানলে ত্রিভূজের আকার নেবে। কিন্তু সেটাও বোধহয় ভাল লাগল না। নিজেদের মধ্যে কী আলোচনার পর শেষপর্যন্ত পাঁচটা কোণ তৈরি করে দাঁড়ায়। তিন জায়গায় একজন করে, বাকি দু'জায়গায় দু'জন দু'জন। এবার কল্পিত লাইন টানলে পেণ্টাগন বা পঞ্চভূজ হবে। খুব সম্ভব এই নকশাটাই লোকগুলোর মনে ধরল। তারা আর দাঁড়াল না। পায়ে পায়ে জিপটার দিকে এগিয়ে গেল।

এদিকে অন্ধকার প্রায় কেটে গিয়ে আরও একটু আলো ফুটেছে। রাস্তায় দু'একটা অটো... ট্যাক্সি বেরিয়ে পড়েছে। বীচ ছাড়াও এধারে-ওধারে কিছু মানুষজন দেখা যাচ্ছে।

সেই লোকগুলো যখন জিপে উঠতে যাবে, রাজু প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে সেই লোকটা না?' তার গলায় প্রবল উত্তেজনা।

রাজু যে লোকটার কথা বলল তাকে আগেও দেখেছে সঞ্জুরা বার তিনেক জুহু বীচে। তা ছাড়া তাদের হোটেলের গায়ে যে পান-সিগারেট আর কোল্ড ড্রিংকসের দোকানটা আছে সেখানেও বেশ কয়েকবার। লোকটাকে মনে করে রাখার কারণ, যখনই পাশের দোকানটায় সে আসে, পর পর পাঁচ-ছ-বোতল কোল্ড ড্রিংকস খায়, তারপর দুটো সিগারেট ধরিয়ে অদ্ভুত কায়দায় আঙুলের ফাঁকে রেখে টানতে থাকে। একসঙ্গে এত কোল্ড ড্রিংক আর দুটো সিগারেট খেতে আগে আর কাউকে

দেখেনি সঞ্জুরা। মনে রাখার আরও একটা কারণ, তার নাকের পাশে একটা বড়, কালো, বেঢপ সাইজের জড়ুল রয়েছে।

যারা রোজ ভোরে ব্যাঙ্কটার সামনে এসে পরামর্শ করে কী সব দেখে যায় তাদের দলে এই লোকটাকে আগে দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না সঞ্জু। দেখলেও চিনতে পারেনি। কেননা অন্য দিন ওরা যখন আসে তখন বেশ অন্ধকার থাকে।

আজ লোকটাকে দেখে রাজুর মতো সঞ্জুরও ভীষণ উত্তেজনা হচ্ছিল। সে কিন্তু রাজুর মতো চেঁচাল না, নিচু গলায় বলল, 'এখন কোনও কথা নয়।'

রাজু আর কিছু বলল না।

লোকগুলো যেদিক থেকে এসেছিল, জিপে উঠে সেদিকে চলে গেল।

রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হবার পর রাজু জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করবে?'

সঞ্জু বলল, 'ভাবতে হবে। ব্রেকফাস্ট করে তুমি আর আমি বীচে যাব। হোটেলে বসে হবে না। কেউ শুনে ফেলবে। ফাঁকা জায়গায় ব্যাপারটা নিয়ে ভাল করে ডিসকাস করা দরকার।'

'ঠিক আছে।'

সকালের খাবার খেয়ে সাড়ে আটটায় দু'জনে জুহু বীচে চলে এল। এই সময়টা এখানে ভিড় কম থাকে। যারা স্বাস্থ্যের জন্য সকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বীচে এসেছিল তাদের বেশির ভাগই ফিরে গেছে। বিশাল সমুদ্রতীর এখন প্রায় ফাঁকাই।

সঞ্জু আর রাজু জলের ধার ঘেঁষে বালির ওপর বসে পড়ল।

বর্ষাকাল বাদ দিলে আরব সাগর বছরের বাকি সময়টা বেশ শান্ত থাকে। এখন ছোট ছোট সকালের সোনালি আলো গায়ে মেখে বীচটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। তবে সমুদ্রের দিক থেকে খুব জোরালো হাওয়া বইছে।

রাজু বলল, 'আমার কী মনে হয় জানো?'

সঞ্জু সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিল; মুখ না ফিরিয়ে সে বলল, 'কী?'

'ওরা ওই বড় বিল্ডিংটার কাছে কিছু একটা করতে চায়।'

'কী করতে?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সঞ্জু বলল, 'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।'

রাজু জিজ্ঞেস করল, 'কিসের আইডিয়া?'

'ওই জড়ুলওয়ালা লোকটাকে খুঁজে বার করে যদি ওর ওপর নজর রাখি, বুঝতে পারব ওদের দলটা কী মতলব আঁটছে।'

'কিন্তু তাকে আমরা পাচ্ছি কোথায়?'

সঞ্জু বলল, 'আমার মনে হয়, লোকটা এদিকেই কোথাও থাকে।'

রাজু বলল, 'এটা মনে হলো কেন?'

'তিন দিন আগে বিকেলবেলায় লোকটা আমাদের হোটেলের পাশের সেই পান-সিগারেটের দোকানে কোল্ড ড্রিংক খাচ্ছিল। আমরা তখন বেড়াতে বেরুচ্ছিলাম।' বলে সঞ্জু জিজ্ঞেস করল, 'ওর পরনে কী ছিল মনে পড়ছে?'

অনেকক্ষণ চিন্তা করে রাজু জানাল, মনে নেই। কারণ সে ভাল করে লক্ষ্য করেনি।

সঞ্জু বলল, 'একটা সিল্কের লুঙ্গি আর গেঞ্জি। কাছাকাছি না থাকলে ওরকম পোশাকে কেউ বাইরে বেরোয় না।

রাজু বলল, 'ঠিক বলেছ। কিন্তু—'

'কী?'

'এখানে এত হোটেল আর এত হাই-রাইজ বিল্ডিং; এসবের ভেতর থেকে খুঁজে বার করবে কী করে?'

'আরে বাবা, সারাক্ষণ কি আর লোকটা ঘরে বসে থাকবে? আমরা এখন অন্য কোনও দিকে বেড়াতে যাব না। বীচে আর এখানকার রাস্তায় ঘুরে বেড়াব। হোটেলগুলোতে গিয়ে ওর ডেসক্রিপশান দিয়ে খোঁজ করব। মনে হয় ওকে ঠিক পেয়ে যাব।'

'ধর, পেয়ে গেলে। তখন কী করবে?'

'সেটা এখনও ভাবিনি। আগে তো লোকটাকে পাই। তারপর দেখা যাবে।'

আলোচনা শেষ করে সঞ্জুরা কিছুক্ষণ বীচে ঘোরাঘুরি করল কিন্তু লোকটাকে দেখা গেল না। বীচ থেকে রাস্তায় যখন ওরা উঠে এল তখন মুম্বই শহরের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। চারদিকে অজস্র মানুষ। অগুনতি গাড়ি স্রোতের মতো ছুটে চলেছে। এর ভেতর থেকে বিশেষ একটা লোককে খুঁজে বার করা অসম্ভব ব্যাপার। তবু সঞ্জুরা চারদিকে নজর রাখতে লাগল।

দুপুরে হোটেলে এসে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ফের বেরিয়ে পড়ল দু'জনে। এবার ওরা হানা দিল হোটেলগুলোতে। সন্ধ্যে পর্যন্ত একটার পর একটা হোটেলে গিয়ে রিসেপশানে লোকটার চেহারার বর্ণনা দিয়ে জানতে চাইল, এরকম কেউ আছে কিনা। সব জায়গাতেই ওদের বলা হলো—নেই। রোজই হোটেলে নানা ধরনের লোক আসছে। তাদের সবার চেহারা রিসেপশানের লোকেদের পক্ষে মনে করে রাখা সম্ভব নয়। তবে কারও মুখে একটা বিশ্রী জড়ুল থাকলে নিশ্চয়ই ওদের চোখে পড়ত।

এরপর দুটো দিন সকাল থেকে রাত আটটা-ন'টা পর্যন্ত বীচ থেকে শুরু করে

সামনের রাস্তা এবং সারি সারি দোকানগুলোতে গিয়ে দেখতে লাগল সঞ্জুরা। কিন্তু না, লোকটা একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। এমন কি, ভোরের দিকে যে দলটা সেই ব্যাঙ্কটার সামনে এসে কী পরামর্শ করে, তারাও এই দু'দিন আসছে না।

রাজু হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'নাঃ, ওদের আর পাওয়া যাবে না।'

সঞ্জু বলল, 'আর, দু'একদিন দেখা যাক। তারপর এ নিয়ে আর ভাবব না।'

আশ্চর্য, সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় লোকটাকে আবার দেখা গেল। সেই পান-সিগারেটের দোকানে কোল্ড ড্রিংক খেতে এসেছে।

সঞ্জুরা বীচের দিক থেকে হোটেলে ফিরে আসছিল, দূর থেকে লোকটাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। রাজু কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে সঞ্জু বলে, 'এখন একটা কথাও নয়। একদম চুপ।'

লোকটা অন্যদিনের মতো পাঁচ বোতল কোল্ড ড্রিংক খেয়ে, জোড়া সিগারেট ধরিয়ে জুত করে টানতে টানতে ডান পাশের ফুটপাথ ধরে এগিয়ে চলল।

সঞ্জু চাপা গলায় বলল, 'ওকে ফলো করতে হবে। এসো আমার সঙ্গে।'

রাজু বলল, 'আমার বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপছে।'

সঞ্জু বলল, 'অত ভয় থাকলে আসতে হবে না। হোটেলে ফিরে যাও।'

'আরে না না, তোমাকে একা যেতে দেব না। যা হবার হবে। আমি তোমার সঙ্গে আছি।'

দু'জনে লোকটাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে পেছন পেছন চলল। তাদের মাঝখানে পঞ্চাশ ফুটের মতো দূরত্ব।

মিনিট চারেক হাঁটার পর একটা মাঝারি হোটেলের পাশ দিয়ে অন্য একটা রাস্তায় ঢুকে পড়ল লোকটা। রাস্তাটা বড় নয়; সেটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে পাশাপাশি একই রকম দেখতে দুটো চব্বিশতলা বাড়ি। বাঁ দিকেরটার নাম 'আকাশগঙ্গা', ডান দিকেরটা 'পাতালগঙ্গা'।

সঞ্জুরা লক্ষ্য করল, লোকটা 'আকাশগঙ্গা'য় ঢুকেছে। ওরা জোরে পা চালিয়ে দিল। কিন্তু লোকটার কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই সে একটা লিফটে ঢুকে পড়ল।

পাশে আরও দুটো লিফট রয়েছে। দুটোই ওপর থেকে নিচে নামছে। রাজু বলল, 'যেটা আগে নামবে সেটায় উঠে লোকটাকে খুঁজতে হবে।'

সঞ্জু বলল, 'এই বিরাট হাই-রাইজে কোথায় হাতড়ে বেড়াবে! আগে জানতে হবে লোকটা ঠিক কোন ফ্লোরে গেল।'

রাজু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী করে জানবে?'

'এদিয়ে এসো—'

লোকটা যে লিফটটায় ঢুকেছিল, রাজুকে সঙ্গে করে সঞ্জু তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লিফটের মাথায় লাল ইনডিকেটরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'ওটা ভাল করে দেখ।'

এক, দুই, তিন—এইভাবে সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। কিন্তু পনের নম্বরের লাল আলোটা কয়েক সেকেণ্ডের মতো জ্বলে রইল। তারপর সেটা নিভে ষোল-সতের পেরিয়ে আঠার নম্বরটা জ্বলে উঠল। এবং জ্বলতেই লাগল। মিনিট তিনেক পর আলোটা নিভে সতেরো, ষোল—এইভাবে সংখ্যা কমাতে লাগল।

সঞ্জু জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বুঝতে পারলে?'

রাজু বলল, 'না।'

'লিফটটা ওপরে উঠে পনের আর আঠার, মানে ফিফটিন্থ্ আর এইটিন্থ্ ফ্লোরে থেমেছিল তারপর এখন নেমে আসছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

সঞ্জু বলতে লাগল, 'ওই লোকটা যখন ওপরে উঠছিল তখন সে একা ছিল না। লিফটে আরও কেউ কেউ থাকতে পারে যাদের আমরা দেখতে পাইনি। লিফটটা দু'জায়গায় যে থেমেছিল সেটা অবশ্য জানতে পেরেছি। লোকটা হয় ফিফ্‌টিন্থ্, নইলে এইটিন্থ্ ফ্লোরে নেমে গেছে। ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল?'

রাজু বলল, 'ঢুকেছে। এখন কী করতে চাও?'

'দেখ কী করি—'

লিফটটা নিচে এসে থামতেই দু'জন বেঢপ চেহারার মোটা মহিলা বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে রাজুকে নিয়ে সঞ্জু ভেতরে ঢুকে পনের নম্বর বাটনটা টিপে দিল। লিফ্‌টটা অটোমেটিক। আপনা থেকে দরজা বন্ধ হয়ে সেটা ওপরে উঠতে লাগল।

ফিফ্‌টিনথ্ ফ্লোরে এসে লিফ্‌টটা থামলে বাইরে বেরিয়ে সঞ্জুরা দেখল এখানে সবসুদ্ধ চারটে ফ্ল্যাট। প্রতিটি ফ্ল্যাটের সামনের দরজার গায়ে পেতলের ফ্ল্যাট-নাম্বার লাগানো রয়েছে।

প্রতিটি ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে কলিং বেল টিপল সঞ্জু। কেউ দরজা খুললেই জিজ্ঞেস করল, এখানে অমিতাভ সেন নামে কেউ থাকে কিনা। সবাই জানাল ওই নামের কাউকে তারা চেনে না।

সঞ্জু রাজুকে বলল, 'না, এখানে নয়। চল, এইটিন্থ্ ফ্লোরে যাওয়া যাক।'

লিফ্‌টটায় চড়ে কখন কেউ নিচে নেমে গিয়েছিল, ওরা টের পায়নি। ওটার আশায় থাকলে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে। মোটে তিনটে তো ফ্লোর। সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে সঞ্জুরা ওপরে উঠতে লাগল।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সিঁড়ি ভাঙার পর রাজু হঠাৎ বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, এভাবে খোঁজ পাওয়া যাবে না।'

সঞ্জু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে গিয়ে বেল বাজালে সেই লোকটাই যে দরজা খুলে দেবে, সেটা নাও হতে পারে। হয়তো সে ভেতরের কোনও ঘরে বসে আছে; অন্য লোক দরজা খুলল।'

একটু চিন্তা করে সঞ্জু বলল, 'রাইট। তা হলেও চেষ্টা তো করতে হবে।'

রাজু এবার কিছু বলল না।

সঞ্জু বলল, 'এইটিন্থ্ ফ্লোরটা দেখি। তখনও যদি না পাওয়া যায়, অন্যরকম প্ল্যান করতে হবে।'

'অন্যরকম বলতে?'

'লোকটা এ বাড়িতে যে আছে তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। তাকে কখনও না কখনও বাইরে বেরুতে হবেই। যতক্ষণ না বেরুচ্ছে, আমরা গেটের কাছে ওয়েট করব।'

এইটিন্থ ফ্লোরে, মানে বাংলার আঠারো তলায় এসে দেখা গেল এখানেও চারটে ফ্ল্যাট। সব ফ্লোরেই বোধহয় একই রকম ব্যবস্থা।

প্রথম দুটো ফ্ল্যাটে কোনও হদিস পাওয়া গেল না। কিন্তু তিন নম্বর ফ্ল্যাটের বেল বাজাতেই দরজা খুলে যে সামনে দাঁড়াল তার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল সঞ্জুর, পা দুটো ভীষণ কাঁপছে। আর ক'দিন ধরে এই লোকটাকেই পাগলের মতো তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

নিজেকে সামলে নিতে খানিকটা সময় লাগল সঞ্জুর। লোকটা একদৃষ্টে তাকে লক্ষ্য করছিল। জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই?'

অন্য ফ্ল্যাটগুলোতে সঞ্জু যা বলেছিল, এখানেও তাই বলল।

লোকটা একটু ভেবে বলল, 'অমিতাভ সেন কত নম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন?'

'সেটা বলতে পারব না। তবে এই 'আকাশগঙ্গা'তেই থাকেন।'

'এই বাড়িতে সবশুদ্ধ বিরানব্বইটা ফ্ল্যাট। কে কোন ফ্ল্যাটে থাকে বলা মুশকিল।'

যেন লোকটার পরামর্শ চাইছে, এমন একটা ভাব করে সঞ্জু জিজ্ঞেস করল, 'কী করা যায় বলুন তো আঙ্কল?'

লোকটাকে যতটা ভীতিকর ভাবা গিয়েছিল, সামনাসামনি দেখে তেমনটা মনে হলো না। সে বলল, 'এক কাজ কর, গ্রাউণ্ড ফ্লোরে বিল্ডিংয়ের কেয়ারটেকারের অফিস আছে। সেখানে যাও; ওরা বলতে পারবে।'

কথা বলতে বলতে খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ফ্ল্যাটের ভেতরটা দেখতে চেষ্টা

করছিল সঞ্জু। একটা সাজানো-গোছানো বিরাট ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল চোখে পড়ল। কিন্তু অন্য কাউকে দেখা গেল না। লোকটা একাই কি এখানে থাকে? না, আরও লোকজন আছে? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

সঞ্জু বলল, 'থ্যাঙ্ক য়ু আঙ্কল।'

লোকটা কিছু বলল না, অল্প হেসে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

কিছুক্ষণ পর লিফটে করে নামতে নামতে রাজু জিজ্ঞেস করল, 'অমিতাভ সেন বলে সত্যি সত্যিই কেউ আছে নাকি?'

সঞ্জু বলল, 'জানি না।'

'ওটা তা হলে তোমার বানানো?'

'একজাক্টলি।'

'অ্যাকটিংটা এমন করেছ যে লোকটা ধরতেই পারেনি।'

রাজুর কথা যেন শুনতে পায়নি, এমনভাবে সঞ্জু বলল, 'লোকটা যে ফ্ল্যাটে থাকে তার নাম্বারটা দেখেছিলে?'

রাজু বলল, 'হ্যাঁ। এইটিন বাই থ্রি।'

'গুড। ওটা ভুলো না।'

'লোকটাকে দেখে কিন্তু খারাপ মনে হলো না।'

'মুখ দেখে কি কার মাথায় কী ঘুরছে সবসময় বোঝা যায়।'

রাজু আস্তে মাথা নাড়াল। বলল, 'ঠিক।'

সঞ্জু বলল, 'এখন আমাদের কাজ হলো, সারাক্ষণ লোকটাকে চোখে চোখে রাখা।'

কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, তাই পরদিন সকালে এলিফ্যান্টা কেভ দেখতে যেতে হলো সঞ্জুদের। বাবা এবং রাধাকৃষ্ণ আঙ্কল, মানে রাজুর বাবা ওঁদের অফিস থেকে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজু এবং সঞ্জুর যাবার ইচ্ছা ছিল না। মুম্বইতে যখন থাকা হবে তখন পরে একবার কেন দশবার যাওয়া যাবে। এলিফ্যান্টা কেভ পালিয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু ওই লোকটার ওপর নজর না রাখলে দারুণ একটা রহস্য হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

বাবা বা আঙ্কেলকে বলা গেল না, কী কারণে তাদের এলিফ্যান্টায় যাওয়া উচিত নয়। নিরুপায় হয়ে অন্য সবার সঙ্গে গাড়িতে উঠতে হলো সঞ্জুদের।

জুহু থেকে গাড়িতে গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া। সেখান থেকে মোটর বোটে আরব সাগরের ওপর দিয়ে এলিফ্যান্টা কেভে পৌঁছুতে ঘণ্টাখানেক লাগে। আদিগন্ত সমুদ্র, দূরে মুম্বই হারবারে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি সুবিশাল জাহাজ— এই সব দৃশ্য দেখতে খুব ভাল লাগছিল।

এলিফ্যান্টায় পৌঁছে পাহাড়-কাটা সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে গুহার ভেতর বহুকালের পুরনো সব শিবমূর্তি দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যায় সঞ্জুরা। শত শত বছর আগে আমাদের দেশ শিল্পে-ভাস্কর্যে কিরকম উন্নতি করেছিল, এগুলো তারই প্রমাণ।

সবই দেখছিল সঞ্জুরা, কিন্তু সেই লোকটাকে কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না। ওদের দু'জনের মাথায় তার চিন্তাটা ঘুরে ঘুরে হানা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে লোকটা সম্পর্কে ওরা এমন চাপা গলায় কথা বলছে যাতে মা-বাবা আঙ্কল-অ্যান্টিরা শুনতে না পান।

এলিফ্যান্টা দেখে ওরা যখন গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়াতে ফিরে এল, তিনটে বেজে গেছে। সবার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। ঠিক হলো, কাছাকাছি কোনও একটা ভাল রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাওয়াটা সেরে নেওয়া হবে। সঞ্জুদের গাড়িটা রয়েছে গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার ওধারে বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল হোটেলের সামনে কার পার্কিংয়ের জায়গায়। খাওয়া হলে গাড়িতে করে তারা জুহুতে ফিরে যাবে।

মুম্বইতে দুপুরে এবং সন্ধ্যেয় বেশ ক'টা খবরের কাগজ বেরোয়। একটা কাগজওলা চিৎকার করে বলছিল, 'ব্যাঙ্ক ডাকাইতি। দশ আদমী মার্ডার হো গিয়া—তাজা খবর—'

লোকটার সামনে একটা নিচু টুলের ওপর প্রচুর কাগজ থাক দিয়ে সাজানো। তাকে ঘিরে রীতিমতো ভিড় জমেছে। সবাই কাগজ কিনছে আর উত্তেজিতভাবে কী যেন বলছে।

ক'দিনের মধ্যে সঞ্জুর বাবার সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ আঙ্কলের দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। ওঁরা গিয়ে একটা কাগজ কিনে আনলেন। প্রথম পাতাতেই বড় বড় হরফে ইংরেজিতে যা লেখা রয়েছে তার বাংলা মানে করলে এরকম দাঁড়ায়। জুহুর একটা ব্যাঙ্কে আজ বেলা এগারোটার সময় বিরাট ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা সবাই মুখোশ পরে এসেছিল, হাতে ছিল লাইট মেশিনগান। ওরা এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে দশজনকে খুন করে। নিহতদের মধ্যে রয়েছে ব্যাঙ্কের ক'জন কর্মী। যারা টাকা তুলতে এসেছিল তাদের মধ্যেও দু'জন মারা যায়। আহত হয়েছে পনের-ষোল জন। ডাকাতদের একজনকেও ধরা যায়নি। একটা জিপে করে তারা এসেছিল। নগদ তিরিশ লাখ টাকা আর ব্যাঙ্কের লকার ভেঙে প্রচুর গয়না লুট করে সেই জিপেই উধাও হয়ে যায়। খবরের সঙ্গে যে ব্যাঙ্কে ঘটনাটি ঘটেছে সেটার এবং মৃত লোকগুলির ছবিও ছাপা হয়েছে। এমন ভয়ঙ্কর, দুঃসাহসিক ব্যাঙ্ক ডাকাতি এর আগে নাকি মুম্বইতে কখনও হয়নি।

রাধাকৃষ্ণ আঙ্কল বললেন, 'কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!'

সঞ্জুর বাবা কাগজের ছবিটা দেখিয়ে বললেন, 'আরে, ব্যাঙ্কটা তো আমাদের হোটেলের কাছে সেই দশতলা বাড়িটায়!'

উত্তেজনায় সঞ্জুর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল, হৃৎপিণ্ডটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। রাজুর কানে মুখ ঠেকিয়ে সে বলল, 'আমরা আজ এলিফ্যান্টা এলাম আর আজই ব্যাপারটা ঘটে গেল! এখন ওই জড়ুলওলা লোকটাকে পেলে হয়।'

রাজু কিছু বলল না। সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর জুহুতে ফিরতে ফিরতে সাড়ে চারটে বেজে গেল। গাড়ি থেকে নেমে সঞ্জু আর রাজু হোটেলের ভেতর গেল না, বাবা আর মায়েদের বুঝতে না দিয়ে ব্যাঙ্কটার কাছে চলে এল। চারদিকে প্রচুর পুলিশ রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে। এখনও রাস্তার নানা জায়গায় রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। এধারে-ওধারে মানুষের জটলা। ঘটনাটা ঘটেছে বেলা এগারোটায় কিন্তু এখনও সবার চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ।

রাজু জিজ্ঞেস করল, 'সেই লোকটার কি খোঁজ করবে?'

সঞ্জু বলল, 'না। আমাদের আবার দেখলে সন্দেহ করবে।'

'তা হলে কী করতে চাও?'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে সঞ্জু বলল, 'চল পুলিশ স্টেশনে যাই।'

রাজু চমকে উঠল, 'পুলিশ স্টেশনে! কেন?'

'আমরা ওই লোকগুলোর ব্যাপারে যা করেছি তার বেশি আর কিছু করা যাবে না। এখন যা করার পুলিশকেই করতে হবে। আমরা শুধু ক্লু দিয়ে ওদের সাহায্য করব। তা ছাড়া—'

'কী?'

'আমরা এরপর কিছু করতে গেলে বাবা-মা আঙ্কল-আন্টি টের পেয়ে যাবেন। তখন ডিটেকটিভ হবার মজাটা টের পাইয়ে ছাড়বেন।'

লোকজনকে জিজ্ঞেস করে ওরা থানায় পৌঁছে গেল। সেখানে ওই ব্যাঙ্ক ডাকাতি এবং দশ দশটা খুন নিয়ে কিছু একটা চলছে। আবহাওয়া ভীষণ থমথমে। তার মধ্যে কনস্টেবলরা এধারে-ওধারে ছোটাছুটি করছে।

গেটের মুখে সঞ্জুদের আটকে একজন আর্মড গার্ড বলল, 'অন্দর যানা মানা হ্যায়।'

সঞ্জু হিন্দীতে বুঝিয়ে দিল, অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে তাদের দেখা করতে হবে। বিশেষ দরকার।

আর্মড গার্ড জানাল, এখন ভেতরে মিটিং চলছে। দরকার থাকলে সঞ্জুরা যেন পরে আসে।

সঞ্জুরা নাছোড়বান্দা। তারা ভেতরে যাবেই, আর্মড গার্ড কিছুতেই যেতে দেবে না। চেঁচামেচি শুনে একটি মধ্যবয়সী, পুলিশের ইউনিফর্ম পরা, গম্ভীর চেহারার

অফিসার বেরিয়ে এলেন। বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে? এত হৈচৈ কিসের?'

সঞ্জু লক্ষ্য করল, বুকে মেটালের লম্বা ব্যাজে লেখা ঃ ইন্সপেক্টর চাপেকার। তিনি মারাঠি। আর্মড গার্ড মুখ খোলার আগেই সঞ্জু বলল, 'স্যার, আমরা অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ইন্সপেক্টর চাপেকর বললেন, তিনিই অফিসার-ইন-চার্জ। ভীষণ ব্যস্ত আছেন, কথা বলার সময় নেই।

সঞ্জু বলল, 'যে কারণে আপনারা ব্যস্ত সেই ব্যাপারেই আমাদের কিছু বলার আছে।'

ধমক দিতে গিয়ে থমকে গেলেন ইন্সপেক্টর চাপেকার। দু'টি অল্প বয়সের ছেলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বললেন, 'আমরা কী ব্যাপারে ব্যস্ত তা জানো?'

'হ্যাঁ। ব্যাঙ্ক ডাকাতি আর—'

সঞ্জুকে থামিয়ে দিয়ে ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে—'

সঞ্জু বলল, আমাদের যা বলার, শুধু আপনাকেই বলব।'

একটু ভেবে ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'ঠিক আছে।' সঞ্জুদের সঙ্গে করে একটা ফাঁকা ঘরে নিয়ে এলেন। তাদের বসিয়ে বললেন, 'বল—'

তারা ক'দিন আগে মুম্বইতে এসেছে, জুহুর হোটেলে আছে, তাদের নাম সঞ্জয় বসু এবং রজত মেনন, ইত্যাদি জানিয়ে সেই লোকটা এবং তার সঙ্গীদের সম্বন্ধে যাবতীয় খবর দিয়ে সঞ্জু বলল, 'লোকটা কোথায় থাকে তাও আমরা জানি।'

শুনতে শুনতে মেরুদণ্ড টান টান হয়ে গিয়েছিল ইন্সপেক্টরের। চোখ দুটো চকচক করছে। বললেন, 'কোথায়?'

'জুহুর 'আকাশগঙ্গা' বিল্ডিংয়ে। ফ্ল্যাট এইটিন বাই থ্রি।' বলে কীভাবে ঠিকানাটা যোগাড় করেছে তাও জানিয়ে দিল সঞ্জু।

মুখোমুখি বসে ছিলেন ইন্সপেক্টর চাপেকার। সঞ্জু আর রাজুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'ভেরি গুড ওয়ার্ক ইয়াং শার্লক হোমস। একসেলেন্ট অবজারভেশন। তোমাদের এই ইনফরমেসনগুলো আমাদের খুব সাহায্য করবে।'

সঞ্জু বলল, 'স্যার, একটা রিকোয়েস্ট আছে—'

'বল—বল—'

'আমরা যে ওই লোকগুলোর ওপর নজর রেখে, ফলো করে এই সব খবর যোগাড় করেছি, আমাদের মা-বাবারা জানতে পারলে একেবারে কেটে ফেলবেন। মানে এ সব—'

'বুঝেছি, বুঝেছি। কোনও মা-বাবাই চান না তাঁদের ছেলেরা খুনী-ডাকাতদের পেছনে ঘুরে বেড়াক। তোমাদের কথা মনে থাকবে।'

সপ্তাহ দুই কেটে গেল।

সঞ্জু আর রাজুদের পালি হিলের ফ্ল্যাট রেডি হয়ে গেছে। ওরা যেদিন হোটেল থেকে সেখানে চলে যাবে, তার আগের দিন সকালে খবরের কাগজে দেখা গেল, ব্যাঙ্ক ডাকাতরা সবাই মুম্বই থেকে নব্বই মাইল দূরে পুনে শহরে ধরা পড়েছে এবং তাদের লুট-করা টাকা আর গয়নার বেশির ভাগটাই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

সেদিনই সন্ধ্যের পর ইন্সপেক্টর চাপেকার সঞ্জুদের হোটেলে এসে হাজির। অফিস থেকে তার কিছুক্ষণ আগেই অরিন্দম আর রাধাকৃষ্ণ চলে এসেছেন।

ইন্সপেক্টর চাপেকার দুই ফ্যামিলির সবাইকে নিয়ে বেশ আসর জমিয়ে বসলেন। কফি খেতে খেতে বললেন, 'হঠাৎ পুলিশের লোক কেন হানা দিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনাদের কৌতূহল হচ্ছে?'

রাধাকৃষ্ণ বললেন, 'হ্যাঁ, মানে—'

সঞ্জু আর রাজু মাথা হেঁট করে বসে ছিল। সব ব্যাপারটা এবার জানাজানি হয়ে যাবে, ভাবতেই তাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

ইন্সপেক্টর চাপেকার সঞ্জুদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'আমার এই দুই ইয়াং ফ্রেণ্ড আর তাদের মা-বাবাকে কনগ্র্যাচুলেট করতে এসেছি। ব্যাপারটা বোধহয় বুঝতে পারছেন না?'

রাধাকৃষ্ণ, অরিন্দম, জানকী, সঞ্জুর মা মণিমালা, তার দিদি রিনি—সকলেই মাথা নেড়ে জানালেন, কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।

ইন্সপেক্টর চাপেকার এবার বললেন, 'আজকের কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছেন, জুহুর ব্যাঙ্কে যারা ডাকাতি করেছে তারা দলবলসুদ্ধ ধরা পড়েছে। এই দুই ক্ষুদে শার্লক হোমসের সাহায্য না পেলে কিছুতেই ওদের অ্যারেস্ট করা সম্ভব হতো না।' তারপর কীভাবে সঞ্জুরা ডাকাতদের সম্পর্কে খবর যোগাড় করে তাঁকে গোপনে জানিয়ে এসেছে, তা তো বললেনই। আরও বললেন, ওদের দেওয়া সূত্র ধরে 'আকাশগঙ্গা'য় তাঁরা ফাঁদ পেতেছিলেন। সেখানে ডাকাতদের কাউকেই পাওয়া যায়নি। তবে ওদের ওই ফ্ল্যাটটা দেখাশোনা করার জন্য একটা লোক ছিল। তাকে থানায় ধরে এনে বেদম পেটাতেই ডাকাতদের পুনের ঠিকানা পাওয়া যায়।

রাধাকৃষ্ণ এবং অরিন্দম ছেলেদের ওপর রেগে উঠতে যাচ্ছিলেন, তাঁদের থামিয়ে দিয়ে ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'ওদের বকবেন না। যে কাজ ওরা করেছে সে জন্যে আপনাদের গর্ববোধ করা উচিত।'

অরিন্দম বললেন, 'ডাকাতগুলো টের পেলে কী হতো বলুন তো? কত বড় রিস্ক। সঞ্জু কলকাতাতেও এমন অনেক কাণ্ড করেছে—'

ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'ভেবে দেখুন ওরা না সাহায্য করলে ডাকাতরা ভবিষ্যতে আরও কত ক্ষতি করত।'

অরিন্দম চুপ করে রইলেন।

ইন্সপেক্টর চাপেকার বলতে লাগলেন, 'আমার ইয়াং ফ্রেণ্ডদের মোটামুটি কথা দিয়েছিলাম, আপনাদের জানাবো না। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি এত বড় একটা ব্যাপার লুকিয়ে রাখা অন্যায়। এবার একটা সুখবর দিচ্ছি।'

সবাই উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইলেন।

ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'মহারাষ্ট্র গভর্নমেণ্ট সঞ্জয় আর রজতকে বড় অনুষ্ঠান করে খুব বড় একটা পুরস্কার দেবে। যে ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছে, তারাও বিরাট কিছু দেবার কথা ভাবছে। খুব শীগগিরই আপনাদের কাছে এসে ওরা তা জানিয়ে যাবে। আজ তাহলে চলি—'

ইন্সপেক্টর চাপেকার উঠে দাঁড়ালেন।

হত্যার পরের ঘটনা

বিমল মিত্র

মা-জননীরা, আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। গল্প লেখা আমার নেশা। আবার পেশাও বটে। কিন্তু তা বলে আমি আপনাদের কখনও গল্প শোনানোর নাম করে মিথ্যে কথা শোনাতে পারি না। সে-কাজ আমার দ্বারা হয় না। প্রতিদিন লেখবার আগে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র তেত্রিশ কোটি দেবতা আর মাতা বসুমতীকে সাক্ষী রেখে আমি লিখতে শুরু করি, যাঁরা শোনেন, তাঁরা কেউ ভাল বলেন, প্রশংসা করেন, আবার কেউ নিন্দে করেন। তা নিন্দে করুনগে, তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই।

আমি আপনাদের গল্প শুনিয়ে খালাস। নিজের বিবেকের কাছে আমি খাঁটি। এই আমার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা। এর চেয়ে বেশি সুখ আমি চাই না। আপনারা বিশ্বাস করুন, আপনাদের আমি শ্রদ্ধা করি, আপনাদের আমি ভক্তি করি। মায়ের জাতির ওপর আমার বিশ্বাসের অন্ত নেই।

এই গৌরচন্দ্রিকাটুকু এ-গল্পের পক্ষে অপরিহার্য। এটুকু না বললে আপনারা আমাকে ভুল বুঝতে পারেন। তাই বলছি, এবার আপনারা গল্পটা শুনুন।

ছোট গল্পের আগে নায়ক-নায়িকার বা পাত্র-পাত্রীর নাম বলা দরকার। কিন্তু এ গল্পের প্রধান চরিত্রের নাম আমি প্রথমে জানতাম না। শুধু আমি নয়, আমার সঙ্গে যত লোক সেদিন ভবানীপুর থানায় ছিল, কেউই জানত না।

ভবানীপুর থানার দারোগাও বার বার মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করেছে—আপনার নাম কী?

মহিলাটি কিছুই উত্তর দেন নি। চুপ করে ছিলেন শুধু।

—বলুন আপনার নাম কী?

—আপনি কোথায় থাকেন?

আপনার স্বামীর নাম কী?

কোন কথারই উত্তর সেদিন দেননি মহিলাটি।

ভবানীপুর থানা তখন মানুষের ভিড়ে ভেঙে পড়েছে। দু' নম্বর বাসে যত লোক ছিল, প্রায় সবাই তখন এসে থানার ভেতরে ঢুকে পড়েছে। যারা ভেতরে ঢুকতে পারেনি, তারা বাইরে থেকে উঁকি মারবার চেষ্টা করছে। পুলিশ কন্‌স্টেবলরা অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে পারছে না আর।

—এখানে কী হয়েছে মশাই?

রাস্তায় বেকার লোকের অভাব নেই কলকাতা শহরে। উত্তেজনার খোরাক চাই সকলের। রাস্তায় বেড়াতে কোথাও কিছু মানুষের ভিড় দেখলেই উঁকি মেরে দেখি। কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলে খুশি হই।

—কী হয়েছে মশাই এখানে? ভিড় কিসের?

—কে জানে মশাই, আমিও আপনার মত, কিছুই বুঝতে পারছি না।

পাশ থেকে একজন বললে, চোর ধরেছে বাসে—

—চোর?

—হ্যাঁ মশাই, শুনছি নাকি মেয়েমানুষ চোর।

মেয়েমানুষ চোর কথাটা বারুদের মত হঠাৎ যেন বাতাসকে বিষাক্ত করে দিলো। যারা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তাদের কানে কথাটা যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের দেখাদেখি আরো কয়েকজন। যারা জরুরি কাজে বেরিয়েছে, তারা কাজ পণ্ড করে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করলো।

কয়েকটা কনস্টেবল তখন একেবারে থানার সামনে রুল উঠিয়ে হেঁকে এল—ভাগো, ভিড় হঠাও—

কিন্তু কে আর শুনছে তাদের কথা। যারা ভেতরে ঢুকেছে একেবারে মহিলাটির কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, তাদেরই বেশি সুবিধে। তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মহিলাটিকে। অনেকক্ষণ থেকেই দেখে আসছে। সেই যখন বৌবাজারে দু'নম্বর বাসে উঠেছিল। লেডিজ সীটে বসেছিল। অবশ্য তখন এমন করে তার দিকে নজর করবার সুযোগ

আসেনি। অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও কোনও মহিলার মুখের দিকে ক্যাট-ক্যাট করে চেয়ে থাকা যায় না। চাওয়া উচিতও নয়। অমন কত মেয়ে বাসে উঠছে, বাস থেকে নামছে কে আর তার হিসেব রাখছে।

—আপনি কোথা থেকে বাসে উঠেছিলেন?

ডবল-ডেকার বাসের একতলায় ঢুকেই দু'পাশে লম্বা লেডিজ সীট। একজন লেডী ওঠে তো আর একজন নামে। কখনও বাসে চাপাচাপি ভিড়। পুরুষেরা প্যাসেজের ওপর পা-দানিতে সিঁড়ির ধাপে ধাপে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে দোল খাচ্ছে, ধাক্কা খাচ্ছে, ঝুলছে। তখন হয়তো লেডিজ-সীটের ওপর একটি মেয়ে সব জায়গাটা জুড়ে বসে আছে। সবাই পকেট সামলাচ্ছে, জামা-কাপড় জুতো বাঁচাচ্ছে। তার ওপর অফিসের ছুটির সময়। সে সময়ে কারো জ্ঞান ছিল না কোনও দিকে। এক-একটা স্টপেজ এসেছে আর যেন মল্লযুদ্ধ শুরু হয়েছে। কারো হাতে ছাতা, কারো পুঁটুলি, কারো ফাইল। জামা ছিঁড়ে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল। সে সময় লেডিস-সীটের দিকে নজর দেবার সময় ছিল না।

—আপনি ঠিক জানেন এটা আপনার এটাচি কেস?

মনে আছে এক ভদ্রলোক উঠেছিলেন ঠিক বোধ হয় মেডিক্যাল কলেজের সামনে স্টপেজ থেকে। ট্রাউজার—ওপন-ব্রেস্ট কোট পরা ছিল। খুব জরুরি কাজেই বোধ হয় যাচ্ছিলেন। হাতে ছিল একটা এটাচি কেস। বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে বললেন—মশাই একটু সরে যাবেন—

কে আর সরে যাবে। কে আর অন্য লোকের দুঃখ বোঝে। কার এত মাথাব্যথা।

কিন্তু তারই মধ্যে ভদ্রলোক এক হাতে এটাচি কেস আর এক হাতে হ্যাণ্ডেলটা ধরে একটা পা পা-দানিতে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন কোনমতে। তারপর ঝুলতে ঝুলতে চলতে গিয়ে হাতটা একটু ব্যথা হয়ে গিয়েছিল বোধহয়। তাড়া সেই কারণেই? সকলেরই তো জরুরী কাজ। সকলেই তো কাজ করতে ছুটেছে। কেউ বাড়ী যাবে, কেউ আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবে, কেউ হাসপাতালে যাবে, নানান ঝঞ্ঝাটে সবাই জ্বলছে। কাউকে দোষ দেওয়া যায় না।

তবু মনে আছে, ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত পা-দানি পেরিয়ে প্যাসেজ থেকে একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন। তারপর একটা লেডিজ-সীট খালি দেখে হাতের বোঝাটা খালি করবার জন্যে এটাচি কেসটা এককোণে রেখে দিয়েছিলেন। এ ঘটনা কেউ দেখেছে, অনেকে দেখেওনি।

আজকের দিনে কারোর এমন সময় নেই যে সব দিকে চোখ মেলে সব কিছু দেখবে। আর তাছাড়া বাসের মধ্যে কেউ কাউকে চেনে না। কে কার পাশে বসলো, তা দেখবারও সময় নেই। শুধু কোথায় কোন্ সীটটা খালি হলো কিম্বা খালি হতে পারে, সেই দিকেই নজর। একটা সীট খালি হবার সূচনা হলেও দশজনে হাঁ হাঁ করে

ঝাঁপিয়ে পড়ে। কে আগে বসতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলে। সেই পাইকপাড়া থেকে বালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত এই-ই হচ্ছে প্রতিটি বাসের ভেতরের ইতিহাস। ভেতরের প্রাত্যহিক মর্মান্তিক ইতিহাস।

ইন্সপেক্টর বললেন—তারপর?

যে ভদ্রলোক গোড়া থেকে সমস্ত ঘটনা লক্ষ্য করে এসেছেন, তিনি বললেন—তারপর এলগিন রোডের কাছে আসতেই এক ভদ্রলোক তাড়াহুড়ো করে সকলকে ঠেলেঠুলে চিৎকার করে বললেন, বাঁধকে—বাঁধকে—

বাস তখনও ভালো করে বাঁধেওনি। ভদ্রলোক বাস থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন। আর ভালো করে থামবার আগেই কণ্ডাক্টর আবার বেল বাজিয়ে দিয়েছে, আর সামনে ট্রাফিক সিগন্যাল-ল্যাম্প গ্রীন ছিল, ড্রাইভারও স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে।

—তারপর?

তখন আমার খেয়াল হলো ভদ্রলোক তো এটাচি কেসটা ফেলে গেলেন। এই ট্রাউজার আর ওপন্-ব্রেস্ট কোট পরা ভদ্রলোকই তো মেডিক্যাল কলেজের সামনে থেকে এটাচি কেসটা নিয়ে উঠেছিলেন, অতি কষ্টে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে শেষকালে ভেতরে ঢুকে ওই খালি লেডিজ-সীটটার ওপর এটাচি কেসটা রেখেছিলেন।

কথাটা কণ্ডাক্টরকে বলতেই সেও ঘণ্টা দিলে।

সবাই মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলুম—ও মশাই, আপনার এটাচি কেস ফেলে গেলেন, ও মশাই, শুনছেন—

ভদ্রলোক তখন কোথায় রাস্তায় নেমে কোন দিকে গেছেন, তার আর পাত্তা নেই। আর বাসটাও তখন পুরো স্পীডে এগিয়ে চলেছে। সবাই মিলে আলোচনা করা হলো ওটাকে বাসের ডিপোতে গিয়ে জমা দেওয়া ভালো। যদি বাড়ি গিয়ে মনে পড়ে তাহলে একবার খবর নিতে পারেন বাস-অফিসে।

—কণ্ডাক্টর, ওটা ডিপোতে জমা দিয়ে দেবেন। আহা! দামী জিনিস হয়তো ভদ্রলোক ফেলে গেছেন। কিন্তু এটাচি কেসটা নিয়ে যেতেই মহিলাটি কেমন বিরক্ত হলো।

বললেন—এটা তো আমার—

—আপনার?

মহিলাটি বললে—হ্যাঁ, আমার, এটা আমার জিনিস—

কণ্ডাক্টর প্রথমে একটু কিন্তু-কিন্তু করছিল। বেশ ধোপ দুরস্ত মহিলা। গলায় সরু সোনার চেন-হার রয়েছে। হাতে সোনার বালা রয়েছে। ছাপা শাড়ি, লং শ্লিভ ব্লাউজ, ডোনটি খোঁপা। যেমন অন্য মেয়েদের থাকে, সেই রকমই। কোনও তফাৎ নেই। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মহিলা। বেশ ছিমছাম গড়ন। বয়েস ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ হবে। কেমন যেন বেশ মিষ্টি মাধুর্য মুখের আদলে।

কণ্ডাক্টর হাত বাড়িয়েও হাতটা গুটিয়ে নিলে। মহিলা ততক্ষণে এটাচি কেসটা নিজের কোলে তুলে নিয়েছে।

কিন্তু বাসের মধ্যে দু-একজন জাঁদরেল প্যাসেঞ্জারও থাকে। তারা সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। তারা সব সময় দুর্বলের পক্ষে। তারা ভয়ত্রাতা, পতিতপাবন।

—আপনার কী রকম? ওটা তো ভদ্রলোক ফেলে গেলেন। আমি তো নিজের চোখে দেখেছি।

বাস সুদ্ধ লোক এতক্ষণে সচেতন হয়ে উঠেছে। সবাই চেয়ে দেখল মহিলাটির দিকে। সকলের দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়ে উঠেছে মহিলাটি।

—আপনি দেখেছেন। হ্যাঁ মশাই, আমি নিজের চোখে দেখেছি। মেডিক্যাল কলেজের সামনে ভদ্রলোক উঠলেন হাতে এটাচি কেসটা নিয়ে, শেষকালে কোথাও রাখবার জায়গা না পেয়ে ওই খালি জায়গায় রেখে দিলেন।

আর একজন পাশ থেকে বললেন, না, না, মশাই, আমিও দেখেছি, ভদ্রলোকের হাতে এটাচি কেসটা ছিল।

—আহা, এতক্ষণ বোধহয় সে ভদ্রলোক বাড়িতে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন।

—মশাই, বাসে এ-রকম কত লোক কত কী ফেলে যান।

উপদেশ দেবার লোকেরও অভাব হয় না। কণ্ডাক্টরকে একজন বললে, আপনি কারো কথা শুনবেন না মশাই, আপনি ডিপোতে গিয়ে ওটা জমা দেবেন—

কণ্ডাক্টর মহিলাটির দিকে আবার হাত বাড়িয়ে দিলে—দিন, এটাচি কেসটা দিন—

—এটা আমার।

—আমার মানে?—আমার মানে আমার।

এতক্ষণ যারা কোন কিছুতেই মাথা ঘামায় না, সেই শান্তশিষ্ট শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকের দলও মুখ ঘোরাল এবার।

—আপনার জিনিস বললেই হল। আমরা দেখলুম অন্য এক ভদ্রলোক এটাচি কেস নিয়ে ওখানে রেখে দিলেন, আর আপনি বলছেন আপনার? আপনার বললেই আমরা ছেড়ে দেব?

বেশ গরম হয়ে উঠল ভেতরে। ড্রাইভার তখন ফুল-ফোর্সে গাড়ি চালিয়েছে। কণ্ডাক্টরের টিকিট কাটা ঘুচে গেল।

—আপনি জিনিসটা দেবেন কিনা বলুন?

মহিলাটি গম্ভীর গলায় বললে, আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই না।

—কথা বলতে আপনাকে কে বলেছে? জিনিসটা দিয়ে চুপ করে থাকুন।

অন্য লেডিজ সিটে যে সব মহিলারা বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও ব্যাপারটা

সংক্রামিত হয়ে গেছে ততক্ষণে। একজন বুড়ি মতন মহিলা বললেন, কেন বাবা, তোমরা অমন করে বলছ? কেউ কি কারো জিনিস এমন করে নিতে পারে?

—নিতে পারে কিনা সে আমরা জানি। যা জানেন না, তা নিয়ে আপনি কথা বলতে আসবেন না।

আর একজন মাঝ-বয়েসী মহিলা ওপাশে বসেছিলেন। তিনি বললেন, আপনারা কেন ওঁকে অমন করে বলছেন? মেয়েদের সম্মান রেখে কথা বলতে পারেন না।

আপনি আর এর মধ্যে কথা বলতে আসবেন না মা, আমরা যথেষ্ট সম্মান রেখে কথা বলছি।

এটাচি কেসটা হাতে নিয়ে ভদ্রমহিলা এবারে উঠল। স্টপেজ এসেছে একটা। একেবারে নেমে চলে যাবার চেষ্টা।

কণ্ডাক্টর, যেতে দেবেন না ওঁকে।

—কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

মহিলাটি বললে, আমি নামব এখানে, সরুন।

—নেমে যাবেন মানে? এটাচি কেসটা দিয়ে নেমে যান।

ভদ্রমহিলা তবু নামবার উদ্যোগ করছে। কয়েকজন সামনে গিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল। বললে, জিনিস চুরি করে নেমে যেতে পারবেন না।

ভদ্রমহিলা বললে, জানেন, আপনাদের পুলিশ ডেকে অ্যারেস্ট করাতে পারি।

ওপাশ থেকে এক ভদ্রলোক বললে, আঃ আপনারা যেতে দিন না ওকে। কেন রাস্তা আটকাচ্ছেন?

সে কথায় কান দিলে না কেউ। বললে, পুলিশের ভয় দেখাবেন না, তাতে আপনিই বিপদে পড়বেন—

একজন বললে, চলুন ওঁকে ধরে নিয়ে থানায় চলুন। সব হিল্লে হয়ে যাবে।

কথাটা তুলতেই হৈহৈ করে উঠল সবাই। বাস ছেড়ে দিচ্ছিল। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে। সবাই নামল। ভদ্রমহিলা নামল। বাসসুদ্ধ লোকই নামল। কিছু বাইরের লোকও জুটল। সামনেই ভবানীপুর থানা। ভবানীপুর থানাতেই নিয়ে চলুন মশাই। মুখোমুখি ফয়সালা হয়ে যাক।

—তারপর?

ইন্সপেক্টর এতক্ষণ কোনও কথারই সঠিক জবাব পাননি। আবার বললেন, এঁরা সবাই দেখেছেন, এক ভদ্রলোক এটাচি কেস নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের সামনে থেকে উঠেছেন, আর আপনি বলছেন আপনার?

চারিদিকে ভিড়ের মধ্যে তুমুল হৈ চৈ চলছে।

কনস্টেবল কয়েকজন ভিড় সরিয়ে ঘর খালি করার চেষ্টা করলে। কিন্তু কে

বাইরে যাবে? এমন মুখরোচক দৃশ্য দেখতে পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নাকি? তারা রুল উঠিয়ে এগিয়ে এল—হাটো, বাহার যাও সব—হট্ যাও—

—কথার জবাব দিন। চুপ করে আছেন কেন?

ভদ্রমহিলা বললে, আপনি বিশ্বাস করুন, ঐ এটাচি কেস আমার—

—আপনি কোথা থেকে উঠেছিলেন?

—বৌবাজার থেকে।

—যে ভদ্রলোক হাতে এটাচি কেসটা নিয়ে উঠেছিলেন, তিনি কি আপনার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন, এটা?

মহিলাটি বললে, তিনি রাখতে দেবেন কেন? তাঁর জিনিস হলে তিনি তো যাবার সময় এটা নিয়ে যেতেন। এটা তো আমার।

—আপনার বাড়ি কোথায়?

—ভবানীপুর রামময় রোডে।

—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

ভদ্রমহিলা বললেন, বৌবাজার আমার বোনের বাড়ি, আমি সেখান থেকেই আসছি।

—এ এটাচি কেসের মধ্যে কী জিনিস আছে?

ভদ্রমহিলা বললে, আমার শাড়ি একটা আর কিছু টাকা আছে।

—কত টাকা আছে?

ভদ্রমহিলা বললে, তা মনে নেই।

—মনে করার চেষ্টা করুন না। নিজের টাকা রেখে দিয়েছেন আর কত টাকা আছে মনে করতে পারছেন না?

ভদ্রমহিলা বললে, না.

—চাবি। এর চাবি আছে আপনার কাছে?

ভদ্রমহিলা বললে, না।

—সে কী? নিজের এটাচি কেস, আর নিজের কাছে এর চাবি নেই?

ভদ্রমহিলা বললে, আমার বোনের বাড়িতে ভুলে চাবিটা ফেলে এসেছি।

—আপনার বোনের বাড়িতে টেলিফোন আছে?

ভদ্রমহিলা বললে, না।

ইন্সপেক্টর হুঁশিয়ার লোক। বললেন, তাতে ক্ষতি নেই, আমার কাছে মাস্টার কী আছে, তা দিয়ে সব খোলা যাবে।

বলে তিনি কনস্টেবলকে মাস্টার কী'র গোছটা আনতে বললেন। এক মিনিট ধৈর্য পরীক্ষা। কিন্তু সকলের মনে হল, সেই এক মিনিটই যেন কল্পকালে রূপান্তরিত হয়ে গেল সেদিন, সেই ভবানীপুর পুলিশ স্টেশনের ভেতর। আর এটাচি কেসটা

খোলবার সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সমস্ত পাপ, সমস্ত লজ্জা, সমস্ত কলঙ্ক যেন এক চাবির মোচড়ে হাঁ করে উঠল।

আশেপাশের ভিড়ের মানুষ তখন উল্লাসে উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

ভদ্রমহিলা আর থাকতে পারলেন না। যেন ভেঙে পড়ল। বললে, এটাচি কেস আমার নয়, আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম, বিশ্বাস করুন, এ আমার নয়, আমি এর বিন্দু বিসর্গও জানি না।

বলতে বলতে ভদ্রমহিলা সেই অবস্থাতেই চেয়ার থেকে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

—তারপর?

মা-জননীরা, আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি সত্য বই মিথ্যে জানি না। আমি প্রতিদিন লেখার আগে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র তেত্রিশ কোটি দেবতা, মাতা বসুমতীকে সাক্ষী রেখে কলম ধরি। লেখা আমার নেশা, লেখা আমার পেশাও বটে। কিন্তু তা বলে গল্প শোনানোর নাম করে কখনও আপনাদের মিথ্যে কথা বলতে পারিনি। আপনারা আমার শ্রদ্ধার পাত্রী, আপনারা আমার ভক্তির পাত্রী। আপনাদের মর্যাদাহানি আমার কল্পনার বাইরে। আমি আপনাদের আমার অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্মান জানাই।

যারা শুনছিল এতক্ষণ তারা অধৈর্য্য হয়ে উঠল।

বললে, ওসব কথা থাক, তারপর কী হল বলুন? এটাচি কেসের ভেতর কী ছিল?

সে কথাই তো বলছি। যুগ যুগ ধরে সাহিত্য মানুষের কল্যাণ বোধকেই জাগ্রত করেছে, সাহিত্য জাতির মনের মুকুর...

—ওসব কথা থাক, এটাচি কেসের ভেতর কী পাওয়া গেল বলুন শীগগির?

—একটা ছোট একদিনের মরা ছেলে।

সমস্ত লোক তখন স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

—কিন্তু সেদিন যারা সেই থানার মধ্যে ছিল তাদের সকলেরই মনে হয়েছিল ও যেন মরা ছেলে নয়, মানুষের ধর্ম মানুষের কীর্তিকে কেউ যেন খুন করে রেখে গেছে। একটা এটাচির মধ্যে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আত্মার গলা টিপে কেউ যেন ওখানে হত্যা করে ঐ রকম করে তাঁর সৎকার করতে চেয়েছে।

হত্যাকারী কে?

পাঁচকড়ি দে

হায়, পরদিন প্রভাতের সেই ঘটনার সেই লোমহর্ষক ঘটনার, সেই ভয়ঙ্করী স্মৃতির হাত হইতে আমি কি মরিয়াও অব্যাহতি পাইব? তখন বেলা ঠিক দশটা। এমন সময়ে নরেন্দ্রনাথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিলাম তাহার মুখ বিবর্ণ, এবং দৃষ্টি উন্মাদের মত। মুখ চোখের ভাবে যেন একটা কোন ভীষণতার ছায়া লাগিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

নরেন্দ্রনাথ দৃঢ়মুষ্টিতে আমার জামাটা ধরিয়া এমন একটা টান দিল, আর একটু হইলে বা জামাটা অধিক দিনের পুরাতন হইলে তাহাতেই সেটা একেবারে ছিঁড়িয়া যাইত। নরেন্দ্রনাথ ব্যাকুলকণ্ঠে কেবল বলিতে লাগিল, "যোগেশদা, সর্বনাশ হয়েছে যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে—একেবারে খুন, আর উপায় নাই। যোগেশদা, কি হবে—তুমি চল—শীঘ্র ওঠো—এমন খুনে সে—'

আমি বিস্ময় বিহ্বলচিত্তে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। সেই মুহূর্তে একটা অনিবার্য বিমূঢ়তা আসিয়া আমার মস্তিষ্ক এমন পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া বসিল যে, আমি নরেন্দ্রর কথা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। আমি তাহাকে একান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে

জিজ্ঞাসা করিলাম "কি হয়েছে নরেন, আমি তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

দেখিলাম, নরেন্দ্রনাথের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "সর্বনাশ হয়েছে যোগেশগা! লীলা নাই—শশিভূষণ কাল রাত্রে লীলাকে খুন করিয়াছে, পুলিশের লোক শশিভূষণকে গেপ্তার করিয়াছে।" আর শুনিতে পাইলাম না, বজ্রাহতের ন্যায় সেইখানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়িয়া গেলাম। যখন কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইলাম, দেখি, নরেন্দ্রনাথ পাশে বসিয়া আমার চোখে মুখে জলের ছিটা দিতেছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া তাহাকে বলিলাম, "আর কিছু করিতে হইবে না। সহসা এ ভয়ানক কথাটা শুনিয়াই—যাক্ তুমি বলিতেছিলে না শশিভূষণকে পুলিশের লোক গেপ্তার করিয়াছে?"

নরেন্দ্রনাথ কহিল, "তাহাকে অনেকক্ষণ চালান দিয়াছে, চালান দিতে শশিভূষণের উপরে বড় একটা জোর-জবরদস্তি করিতে হয় নাই ; সে একটা আপত্তিও করে নাই—নিজেই ধরা দিয়াছে। হয় ত শশিভূষণের তখনও নেশার ঝোঁক ছিল। যাই হোক, তুমি একবার চল যোগেশদা, এমন সময়ে তোমার একবার যাওয়া খুবই দরকার, যদি কোন একটা উপায় হয়।"

আমি কম্পিত-কণ্ঠে, কম্পিত-হৃদয়ে এবং কম্পিত-কলেবরে ভীতি-বিহ্বলের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায়? লীলাকে দেখিতে? দাঁড়াও—দাঁড়াও—নরেন, আমায় একটু প্রকৃতিস্থ হইতে দাও—আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আমার বুকের ভিতর যেন কি হইতেছে।'

আমার ভাববঙ্গী দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ আমার মনের অবস্থা সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিল। আমার কথায় সম্মত হইল কিন্তু সে একান্ত অধীরভাবে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে দেখিয়া আমি আর বড় বিলম্ব করিলাম না—তখনই বাহির হইলাম।

যথাসময়ে আমরা শশিভূষণের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম, এ কাহিনীর মধ্যে একান্ত উল্লেখযোগ্য হইলেও, তাহা আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। সেজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

এই হত্যা শশিভূষণের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে সেই যে দোষী, সে সম্বন্ধে আর কাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গত রাত্রে উদ্যানমধ্যে আমার সহিত শশিভূষণের যে সকল কথা হইয়াছিল একজন দাসী তাহা শুনিয়াছে, সে নিজের জবানবন্দীতে আমাদের মুখনিঃসৃত প্রত্যেক কথাটিরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছে। প্রাতঃকালে লীলার মৃতদেহ বিছানার পাশে পড়িয়া ছিল এবং তাহার বক্ষে একখানি ছুরিকা আমূল প্রোথিত ছিল ; সে ছুরিকাখানি শশিভূষণের নিজেরই ছুরি। অনেকেই সেই ছুরিখানি তাহার বৈঠকখানা ঘরে অনেকবার

দেখিয়াছে। সে রকম ধরনের প্রকাণ্ড ছুরি সে গ্রামের মধ্যে আর কাহারও ছিল না। শশিভূষণের বিরুদ্ধে আরও একটা বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, গতরাত্রে শয়নকালে তাহাদিগের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে একটা অত্যধিক বাক্-বিতণ্ডা হইয়াছিল এবং শশিভূষণ তাহাকে অত্যধিক প্রহার করিয়াছিল। লীলার কপালে একটা মুষ্ট্যাঘাতের চিহ্নও ছিল। ডাক্তারী মতে এইরূপ স্থিরীকৃত হয় যে, মৃত্যুর দুই-এক ঘণ্টা পূর্বে তাহাকে আঘাত করা হইয়াছিল।

এ সকল প্রতিপাদ্য প্রমাণ সত্ত্বেও সে যে স্ত্রীহন্তা, তাহা শশিভূষণ স্বীকার করিতে সম্মত নহে। সে অবিচলিতভাবে এখনও বলিতেছে, সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তাহাকে ফাঁসিই দাও—মার—কাট, যা ইচ্ছা তাই কর—সেজন্য সে কিছুমাত্র দুঃখিত নহে। শশিভূষণ সর্বসমক্ষে এখনও স্বীকার করিতেছে যে, তাহার পত্নীর প্রতি সে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিত, মদের খেয়ালই তাহার একমাত্র কারণ, নতুবা সে তাহার স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাসিত ; এক্ষণে লীলাকে হারাইয়া তাহার জীবন একান্ত দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। জীবন ধারণে তাহার তিলমাত্র ইচ্ছা নাই! শশিভূষণের এ সকল কথা কতদূর সত্য, তাহা বিবেচনা করিবার শক্তি আমার তখন ছিল না। আরও শুনিলাম, আমার সহিত একবার দেখা করিবার তাহার বড়ই আগ্রহ। যে কেহ তাহার সহিত দেখা করিতে যাইত, তাহাকেই সে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিত, আমি যেন একবার যাইয়া তাহার সহিত দেখা করি। শশিভূষণের সহিত দেখা করিবার আমার ততটা ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু তাহার এইরূপ বারংবার আগ্রহ প্রকাশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও একদিন আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

নিজের হাজত ঘরে আমাকে উপস্থিত দেখিয়া শশিভূষণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল; এবং আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছে বলিয়া—আরও আমার সহিত যে সমুদয় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া, বলিল, "ভাই যোগেশ, তুমি আমাকে ক্ষমা করিলে ; কিন্তু অভাগিনী লীলা কি এমন নরকের কীটকে কখনো ক্ষমা করিবে? আমি আজ আমার পাপের ফল পাইলাম। ধর্মের বিচার অব্যাহত—আজ না হউক, দুদিন পরে নিশ্চয়ই সকলকে স্বকৃত পাপ-পুণ্যের ফলভোগ করিতে হইবে ; কেহই তাহার হাত এড়াইতে পারে না। আমি লীলার প্রতি যে সকল নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি, বোধ করি কোন কঠোর রাক্ষসেও তাহা পারে না। যোগেশ, আজ সকলেই বিশ্বাস করিয়াছে, আমি লীলার হত্যাকারী। তুমিও যে এমন বিশ্বাস কর নাই তাহাও নহে। জগতের সকলেরই মনে আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই ধারণা, এই বিশ্বাস চিরন্তন অটুট এবং অটল থাকিয়া যাক্—বরং তাহাতে আমি সুখী কিন্তু তুমি—যোগেশ, তুমি যেন আর সকলের মত তাহা করিয়ো না, এই কথা বলিবার জন্যই আমি তোমার সহিত দেখা করিতে এত উৎসুক হইয়াছিলাম। আমি ধর্মবিচ্যুত, মনুষ্যত্ব বিবর্জিত, শয়তানের মোহমন্ত্র প্রণোদিত,

জগতের অকল্যাণের পূর্ণ প্রতিমূর্তি—আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে? ভাই যোগেশ-এ জগতে এমন একজন থাক্, সে যেন জানে, আমি একটা মহাপাপী ছিলাম বটে কিন্তু স্ত্রীহন্তা নই।" বলিতে বলিতে শশিভূষণের কণ্ঠ কম্পিত এবং বাকরুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে দুই হাতে মুখ চাপিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

বলিতে কি, তাহার সকরুণ অবস্থা তখন আমার মর্মভেদ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছিল। অনেক করিয়া তাহার পর আমি তাহাকে শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "শশিভূষণ, এ পর্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে, তুমি অকপটে সব আমাকে বল ; কোন কথা গোপন করিতে চেষ্টা করিয়ো না—যদি এ দুঃসময়ে আমি তোমার কোন উপকারে অসিতে পারি।"

শশিভূষণ বলিল, "আমি প্রভাতে উঠিয়া প্রথমে দেখিলাম, লীলা রক্তাক্ত হইয়া আমার বিছানার পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। ধরিয়া তুলিতে গেলাম—দেখিলাম, দেহে প্রাণ নাই। দেখিয়াই আমার বুকে রক্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। বুঝিলাম, লীলা এ পিশাচকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজিলে আর তাহাকে ফিরিয়া পাইব না—পাইবার নহে। বলিতে কি, যোগেশ! প্রথমে আমার বোধ হইল, মদের ঝোঁকে আমিই তাকে রাত্রে হত্যা করিয়াছি। তাহার পর যখন দেখিলাম, আমারই ছুরিখানা লীলার বুকে তখনও আমূল বিদ্ধ রহিয়াছে, তখন আমার সে ভ্রম দূর হইল। আমার এখন বেশ মনে পড়িতেছে, ছুরিখানি আমার বৈঠকখানায় যেখানে থাকিত, সেখানে ছুরিখানি কাল রাত্রে দেখিতে পাই নাই, পরে খুঁজিয়াও কোথাও পাওয়া গেল না। আমি সে কথা তখনই লীলাকেও বলিয়াছিলাম। সেজন্য মনে একটু সন্দেহ হইতেছে ; নতুবা এখনও আমার মনে বিশ্বাস, কাণ্ডজ্ঞানহীন আমিই লীলার হত্যাকারী ; কিন্তু সেই ছুরিখানি—যোগেশ আর একটা কথা আছে, আমার বোধ হয়—ঠিক বলিতে পারি না—যদি—যদি—"

শশিভূষণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া নিজেও যেন একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। সে ভাব তখনই সাম্‌লাইয়া আমি তাহাকে বলিলাম, "কথা কহিতে এমন সঙ্কুচিত হইতেছ কেন? তুমি যা জান বা বোধ কর, আমাকে স্পষ্ট বল।"

শশিভূষণ বলিল, "লীলার বুকে ছুরি বসাতে পারে, একজন ছাড়া তাহার এমন ভয়ানক শত্রু আর কেহ নাই। তাহারই উপরে আমার কিছু সন্দেহ—" আমি অত্যধিক ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে সে? তাহার নাম প্রকাশ কর নাই কেন?"

শশিভূষণ অনুচ্চ স্বরে বলিল, "তুমি তাহাকে জান, আমি মোক্ষদার কথা বলিতেছি। যেদিন আমার বিবাহ হইয়াছে, সেইদিন হইতে মোক্ষদাও ভিন্ন মূর্তি ধরিয়াছে। কি একটা হতাশায় সে যেন একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। অনেকবার

সে আমাকে শাসিত করিয়া বলিয়াছে "ইহার ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে—আমি যে-সে মেয়ে নই—তবে আমার নাম মোক্ষদা। এক বাণে কেমন করিয়া দুটা পাখি মারিতে হয় আমার হইতেই তাহা একদিন তুমি দেখিতে পাইবে।" শশিভূষণ আবার দুই হাতে দুই চক্ষু আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি অতিশয় চকিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলাম, "অসম্ভব! তাহা কি কখনও হয়?"

অনুতাপদগ্ধ রোরুদ্যমান শশিভূষণ বলিল, "তাহা না হইলেও, আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছি, লীলার প্রকৃত হত্যাকারী কে, যাহাতে তুমি সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পার, সেজন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিবে। তাহার পর মুখ হইতে হাত নামাইয়া, তাহার অশ্রুসিক্ত করুণ দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিল, "ভাই যোগেশ, তুমি মনে করিতেছ, আমার নিজের জন্য তোমাকে আমি এমনি অনুরোধ করিতেছি—তাহা ঠিক নয়, আমার ফাঁসি হউক বা না হউক সেজন্য আমি কিছুমাত্র চিন্তিত নহি, একদিন ত সকলকেই মরিতে হইবে—তা দুইদিন আগে আর পরে ; কিন্তু যোগেশ, যখনই মনে হয় যে লীলার হত্যাকারী তাহার এ নৃশংসতার কোন প্রতিফল পাইবে না—"

বলিতে বলিতে শশিভূষণের অশ্রুমগ্ন দৃষ্টি সহসা মেঘকৃষ্ণ রাত্রে তীব্র বিদ্যুৎগ্নির ন্যায় ঝলসিয়া উঠিল এবং এমন দৃঢ়রূপে সে নিজের হাত নিজেই মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিল যে, হাতের কব্জিতে নখরগুলো বসিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল।

যদিও আমি শশিভূষণকে অতিশয় ঘৃণার চোখে দেখিতাম, কিন্তু এখন তাহাকে নিদারুণ অনুতপ্ত এবং মর্মাহত দেখিয়া আমার সে ভাব মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। শোকার্ত শশিভূষণের সেই কাতরতায় আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম "শশিভূষণ, যেমন করিয়া পারি, তোমার নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিব। সেখান হইতে সেদিন বিদায় লইলাম।

একজন পুরাতন পাকা নামজাদা গোয়েন্দা বলিয়া বৃদ্ধ অক্ষয়কুমারের নাম ডাক যশ খুব। আমি এখন তাঁহারই সাহায্য গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বোধ করিলাম। সেইদিনই বৈকালে আমি অক্ষয়বাবুর বাড়িতে গেলাম।

বৃদ্ধ তখন বাহিরের ঘরে তাঁহার কিঞ্চিদধিক পঞ্চমবর্ষীয় পৌত্রটিকে জানুপরি বসাইয়া ঘোটকারোহণ শিক্ষা দিতেছিলেন। আমাকে দ্বারসমীপাগত দেখিয়া অক্ষয়বাবু তখনকার মত সেই শিক্ষা-কার্যটা স্থগিত রাখিলেন এবং আমাকে উপবেশন করিতে বলিয়া, রামাভৃত্যকে শীঘ্র এক ছিলিম তামাকের জন্য হুকুম করিলেন। বলা বাহুল্য, অতি সত্বর হুকুম তামিল হইল।

তাহার পর বৃদ্ধ ধূমপানে মনোনিবেশ করিয়া, একটির পর একটি করিয়া ধীরে ধীরে আমার সকল পরিচয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরে আমি শশিভূষণ সংক্রান্ত সমুদয় ঘটনা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম এবং স্বীকার করিলাম, শশিভূষণকে

নির্দোষ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারিলে আমি তাঁহাকে একহাজার টাকা পুরস্কার দিব।

অক্ষয়বাবু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত আমার কথাগুলি শুনিলেন। শুনিয়া অনেকক্ষণ করতললগ্নশীর্ষ হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। আমাকে কিছুই বলিলেন না, বা কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিলেন না। তাঁহাকে সেইরূপ অত্যন্ত চিন্তিতের ন্যায় নীরবে থাকিতে দেখিয়া শেষে আমি বলিলাম, "কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে বলুন, আমার মনের স্থিরতা নাই-হয়ত ঘটনাটা একটানা বলিয়া যাইতে ভুল করিয়া থাকিব, সেইজন্য বোধহয়, আপনি কিছু গোলযোগে পড়িয়াছেন।"

"না, গোলযোগ কিছু ঘটে নাই।" হুঁকা রাখিয়া, অক্ষয়বাবু বলিলেন, "আমি বেশ ভালরূপেই বুঝিতে পারিয়াছি। সেজন্য কথা হইতেছে না ; তবে কি জানেন, কাজটা বড় সহজ নয় ; সহজ না হইলেও যাহাতে সহজ করিয়া আনিতে পারি, সেজন্য চেষ্টা করিব। তাহার আগে আপনাকে একটি বিষয়ে আমার কাছে স্বীকৃত হইতে হইবে, আর আমার দুইটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর করিবেন।"

আমি বলিলাম, "দুইটি কেন—আপনার যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, জিজ্ঞাসা করুন, আমি এখনই উত্তর দিব। তবে কোন্ বিষয়ে আমাকে স্বীকৃত হইতে হইবে, তাহা পূর্বে না বলিলে, আমি কি করিয়া বুঝিতে পারিব যে আমার দ্বারা তাহা সম্ভবপর কি না। আমার দ্বারা যদি সে কাজ হইতে পারে, এমন আপনি বোধ করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমার অন্যমত নাই জানিবেন।" "সে কথা মন্দ নয়।" বলিয়া অক্ষয়বাবু একটু ইতস্তত করিলেন। তাহার পর বলিলেন আমি যে বিষয়ে আপনাকে স্বীকৃত হইতে বলিতেছি, তাহা এমন বিশেষ কিছু নহে, আপনি মনে করিলেই তাহা পারেন ; আজ কলিকার যে বাজার পড়িয়াছে, তাহাতে সেটা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা নহে। আপনি যে হাজার টাকা পুরস্কার স্বরূপ দিতে চাহিতেছেন, সেইটে এমন একটা লেখাপড়া করিয়া যে কোন একজন ভদ্রলোকের নিকটে আপনাকে গচ্ছিত রাখিতে হইবে যে, পরে যদি আমি কৃতকার্য হইতে পারি, সে টাকা আমিই তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিব। আপনার কোন দাবী-দাওয়া থাকিবে না।" আমি। আমি সম্মত আছি ; ইহাতে আমার অমত কিছুই নাই। এখন আপনার দুইটি প্রশ্ন কি বলুন।

অক্ষয়। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এই—ঠিক কথা বলিবেন, গোপন করিলে কোন কাজই হইবে না—শশিভূষণ যে নির্দোষ, এ কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন? আমি। নিশ্চয়ই। আমি তাহার দুশ্চরিত্রের জন্য তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকি। যদি তাহাকে এই হত্যাপরাধে দোষী বলিয়া আমার মনে তিলমাত্র সন্দেহ থাকিত, তাহা হইলে তাহার মুক্তির জন্য একটি অঙ্গুলি সঞ্চালন করা দূরে থাক্, তখনই আমার হাত কাটিয়া ফেলিয়া দিতাম।

অক্ষয়। বটে! তার পর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—আপনি কি কেবল শশিভূষণ যাহাতে নিরপরাধ বলিয়া সপ্রমাণ হয়, তাহাই চাহেন ; না যাহাতে স্ত্রীর হত্যাকারীও সেই সঙ্গে ধরা পড়ে, তাহাও আমাকে করিতে হইবে?

আমি। ক্ষমা করিবেন, আমি আপনার এ প্রশ্নের ভাবার্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

অক্ষয়। ইহাতে না বুঝিতে পারিবার কিছুই নাই ; একটু ভাবিয়া বলিলেন—কি জানেন প্রকৃত হত্যাকারীকে ধরা বড় সহজ কাজ নহে। এবং আমি মনে করিলেই সে আসিয়া ধরা দিবে না ; বড় শক্ত কাজ—কোন নিরাপরাধ লোকের স্বপক্ষে কয়েকটা প্রমাণ সংগ্রহ করা সে তুলনায় অনেক সহজ।

তাঁহার কথায় আমার একটু হাসি আসিল। আমি বলিলাম, "বুঝিয়াছি, আমি যে হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি তাহা শশিভূষণকে নিরপরাধ সপ্রমাণ করিবারই পারিশ্রমিকের যোগ্য বিবেচনা করেন ; কিন্তু আমার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে উহার বেশি আর উঠিতে পারিব না। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি হত্যাকারীকেই ধরুন বা শশীভূষণকেই উদ্ধার করুন, আপনি ঐ হাজার টাকা পাইবেন।'

অক্ষয়বাবু বলিলেন, "তা বেশ, পরে এই সব লইয়া একটা গোলযোগের সৃষ্টি করিবার অপেক্ষা আগে হইতে একটা ঠিকঠাক বন্দোবস্ত করিয়া রাখা ভাল। যাক্ আপনাকে আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার নাই।"

ইহার চারদিন পরে একদিন অক্ষয়বাবু নিজেই আমার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। সেদিন যেন তাঁহাকে কেমন একটু রুষ্টভাবযুক্ত দেখিলাম। আমি কোন কথা বলিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন, "যা মনে করা যায়, তা ঠিক হয় না-কে জানে মহাশয়, টাকার লোভ দেখাইয়া আপনি এমন একটা ঝঞ্ঝাট কাজ এই বুড়োটারই ঘাড়ে চাপাইবেন।"

বলিতে বলিতে অক্ষয়বাবু উঠিলেন, ক্ষিপ্রহস্তে পথের দিক্‌কার একটি জানলা সশব্দে খুলিয়া ফেলিলেন এবং জানলার সম্মুখভাগে ঝুঁকিয়া কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বংশীধ্বনি করিলেন।

নিদারুণ উৎকণ্ঠায় আমার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল এবং দৃষ্টির সম্মুখে সর্ষপকুসুম নামক বিবিধ-বর্ণ-বিচিত্র ক্ষুদ্র গোলকগুলি নৃত্য করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্ষণপরে দুইটি লোক সে ঘরে প্রবেশ করিল। একজনকে দেখিবামাত্র পুলিশ কর্মচারী বলিয়া চিনিতে পারিলাম ; আর তাহার পাশের লোকটি সেই-ই—গত রাতে যে বালিগঞ্জের পথ হইতে আমার বাড়ি পর্যন্ত আমার অনুসরণে আসিয়াছিল!

সেই লোকটিরই প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া অক্ষয়বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এই লোকটিকে চিনিতে পারেন?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, যখন আমি আপনার বাগান হইতে বাড়ি ফিরিতেছিলাম, তখন এই লোকটি আমার বাড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া আসিয়াছিল ; কিন্তু তাহার পূর্বে ইহাকে আর কখনও দেখি নাই।"

অক্ষয়বাবু বলিলেন, "না দেখিবারই কথা। আমারই আদেশে এই লোক আপনার অনুসরণ করিয়াছিল।" এই বলিয়া তিনি বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নবাগতদ্বয়কে বলিলেন, "তোমাদের ওয়ারেণ্ট বাহির কর, ইহারই নাম যোগেশবাবু—ইনিই লীলার হত্যাকারী।"

কথাটা শুনিয়া বজ্রাহতের ন্যায় আমি সবেগে লাফাইয়া উঠিয়া দশ হাত পশ্চাতে হাটিয়া গেলাম এবং তেমন মধ্যাহ্ন রৌদ্রোজ্জ্বল দিবালোকেও উন্মীলিত চক্ষে চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। এই বিশ্বজগতের সমুদয় শব্দ কোলাহল আমার কর্ণমূলে যুগপৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল। গাঢ়তর—গাঢ়তর—গাঢ়তর অন্ধকারে চারিদিক ব্যাপিয়া ফেলিল। কতক্ষণ পরে জানিনা—প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম, অয়কঙ্কনে আমার হস্তদ্বয় শোভিত এবং সন্নিদ্ধ হইয়াছে। অক্ষয়বাবু বলিতেছেন, "যোগেশবাবু, আপনার জন্য আমি দুঃখিত হইলাম। কি করিব? কর্তব্য আমাদিগের সর্বাগ্রে! আপনি জানিয়া-শুনিয়াও এইমাত্র মোক্ষদার স্কন্ধে নিজের অপরাধটা চাপাইতেছিলেন? তাহাতে আপনাকে বড় ভাল লোক বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহা হউক, যেদিন আপনি আমার সহিত প্রথম দেখা করেন, সেইদিন আপনার মুখে হত্যাবৃত্তান্ত শুনিবার সময়েই আমি কোন সূত্রে আসল ঘটনাটা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সেইজন্যই আপনার দেওয়া পুরস্কারের হাজার টাকা একটি দস্তুরমত লেখাপড়া করিয়া কোন ভদ্রলোকের মধ্যস্থতায় জমা রাখিতে বলি। আপনিও তাহা রাখিয়াছেন। আর আপনিও জানেন, শুধু হাত কখন কাহারও মুখে ওঠে না। সে যাহাই হউক, ইহাতেই আপনার হৃদয়ে একটা মহৎ উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। শশিভূষণ আপনার ঘোরতর শত্রু হইলেও সে যে নিরপরাধ, তাহা আপনি অন্তরে জানিতেন। আপনার অপরাধে যে তাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে এই ভাবিয়া আপনার যথেষ্ট অনুতাপ হইতেই এই হাজার টাকা পুরস্কারের সৃষ্টি। এখন দুই-চারটি প্রমাণ দেখাইয়া দিলে, আপনি যে একাট অবিবেচকের হাতে কেসটা দেন নাই, সে সম্বন্ধে আপনার কোন সন্দেহ থাকিবে না। যেদিন লীলা খুন হয়, সেইদিন রাত দশটার সময় বাগানে আপনার সঙ্গে শশিভূষণের খুব একটা রাগারাগি হয়। এবং তাহাকে খুন করিবেন বলিয়া আপনি উচ্চকণ্ঠে শাসাইয়াছিলেন। অবশ্যই আপনার সেই উচ্চকণ্ঠের শাসনগুলি সেই সময়ে শশিভূষণ ছাড়া আরও দুই-একজনের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। ইহার কিছুক্ষণ পরে শশিভূষণ তাহার ছুরি চুরির কথা জানিতে পারে। শশিভূষণকে না বলিয়া সেই ছুরিখানা আপনি লইয়াছিলেন। আপনার এই 'না-বলিয়া ছুরিগ্রহণ' সম্বন্ধে আমি দুই একটা প্রমাণও

সংগ্রহ করিয়াছি। সেদিন শশিভূষণের তীক্ষ্ণতর কটূক্তিতে আপনার রক্ত নিরতিশয় উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আপনি বাড়িতে ফিরিয়াও নিজেকে কিছুতেই সামলাইতে পারেন নাই ; আপনি শশিভূষণকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পুনরায় তাহার বাড়িতে আসিয়াছিলেন এবং আপনার মাথায় হঠাৎ কি একটা প্ল্যান্ উদ্ভব হওয়ায়, আসিয়াই বৈঠকখানা ঘর হইতে ছুরিখানা 'না-বলিয়া-হস্তগত-করা' নামক পাপে লিপ্ত হইয়া আসেন। তখন একজন পরিচারিকা আপনাকে দেখিয়াছিল। আপনি ভদ্রলোক, সে ছোটলোক—সুতরাং তখন সে আপনার উপরে এরূপ একটা গর্হিত সন্দেহ করিতে পারে নাই। এদিকে যখন এইরূপ দুই-একটি ক্ষুদ্র ঘটনা আরম্ভ ও সমাপ্ত হইয়া গেল, তখনও শশিভূষণ সেই বৈঠকখানার ছাদে বসিয়া মদ খাইতেছিল। উদ্যানে আপনাদের সেই বাক্‌বিতণ্ডার পরে আপনি যখন চলিয়া গেলেন—কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে শশিভূষণের একটা বড় অস্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত হয় এবং সেই অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করিবার জন্য সে আবার বৈঠখানার ছাদে উঠিয়া মদ্যপান আরম্ভ করিয়া দেয়। মদেই লোকটার মাথা খাইয়া দিয়াছিল। যতটা পারিল, বসিয়া খাইল। তাহার পর বাকিটা বোতলের মুখে ছিপি আঁটিয়া যখন বৈঠকখানা ঘরের আলমারিতে বাখিতে যায়—তখন দেখে আলমারি খোলা রহিয়াছে এবং ছুরিখানা সেখানে নাই। দেখিয়া প্রথমে একটু চিন্তিত হইল। তাহার পর দু-একবার এদিক-ওদিক খুঁজিয়া না পাইয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল এবং লীলাকে ছুরির সহসা অদৃশ্য হওয়ার কথা বলিল। ঐ সময়ে তাহার শয়ন-গৃহের পার্শ্বস্থ গলিপথে মোক্ষদা কোন লোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। মোক্ষদাকে আমি সে লোকের নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলে তাহাকে সে চেনে না, পূর্বে কখনও দেখে নাই। তখন আমি একটা কৌশল করিয়া আপনাকে তাহার সম্মুখে নিয়া যাই ; আপনি তাহার মুখে তখন যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা ভান মাত্র, আমিই তাহাকে এইরূপ একটা অভিনয় দেখাইতে শিখাইয়া দিয়াছিলাম। যাহা হউক, মোক্ষদা আপনাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারে। তখন রহস্যটা অনেক পরিষ্কার হইয়া আসিল। তাহা হইলেও কেবল মোক্ষদার কথায়, আমি বিশ্বাস করি নাই—সেটা ডিটেকটিভদিগের স্বধর্মও নহে। আর যাহা হউক, সেই প্রাচীরের পার্শ্ববর্তী পদচিহ্নগুলি মিলাইয়া দেখিবার একটা সুযোগ সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করিয়া লই। সেইজন্য আপনাকে আমার বাগানবাড়িতে লইয়া যাই। বাগানবাড়িতে গিয়া হল ঘরে যাইতে সবেমাত্র-বিলাতীমাটি-দেওয়া সোপানে নগ্নপদে অতি সন্তর্পণে উঠিতে হয়। তাহাতে সেই সদ্যমার্জিত বিলাতীমাটিতে আপনার পায়ের যে দাগ পড়ে, আমি সেইগুলির সহিত ছাপে তোলা সেই গলিপথের দাগগুলি মিলাইয়া বুঝিতে পারি—সকলই এক পায়ের চিহ্ন এবং সেই পা মহাশয়েরই।'" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নিজের হস্তবিমর্ষণ করিতে করিতে অতি উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন,

"মোক্ষদা বেটি ভারি চালাক, ভারি বুদ্ধিমতী—সাবাস মেয়ে যা হোক—যতদূর ফিচেল হতে হয়। কি জানেন ; যোগেশবাবু, তাহা হইলেও আমি মোক্ষদার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি নাই। আপনাদের সহিত সাক্ষাৎকালে সে যদি আমার কথা আপনাকে বলিয়া দিয়া থাকে যে, আমি আপনাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি ; অথবা আপনি কৌশলে তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিয়া লইয়া আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া থাকেন, এই আশঙ্কা করিয়া আমি এই লোককে তখন আপনার বাড়ি পর্যন্ত আপনার অনুসরণ করিয়া দেখিতে বলিয়াছিলাম। আপনি বাড়িতে যান, কি আর কোথাও যান—কি করেন, আপনার মুখের ভাব কি রকম, এই সব লক্ষ্য করিতে বলিয়া দিয়াছিলাম। যখন আপনি বাড়িতে প্রবেশ করিলেন, এই লোক তাহার পর আপনার বাড়ির সম্মুখে দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিলেন, অপেক্ষা করিয়া যখন আর আপনাকে বাহিরে আসিতে দেখিল না—তখন নিশ্চিন্ত মনে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল। তাহার পর আপনার নামে আজ ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া আমার কর্তব্য সম্পূর্ণ করিলাম। বলিতে কি, অনেক খুনের কেস্ আমার হাতে আসিয়াছে, তাহার মধ্যে একটা ছাড়া এমন অদ্ভুত কোনটাই নয়। যাহা হউক, এখন বুঝিলেন, শশিভূষণ নিরপরাধ এবং হত্যাকারী কে?

আর কি বলিবার আছে? হে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান! এ দুর্ভাগার হৃদয়ের কথা তুমি সব জান, প্রভু যাহাকে আমি প্রাণের অধিক ভালবাসিতাম, তাহাকে একজন নৃশংসের হাতে এইরূপ উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইতে দেখিয়া আমার হৃদয়ে কি বিশেষ দহন আরম্ভ হইয়াছিল, তুমি সব জান প্রভু! সেদিন যদি আমার সেই ভুল নাই হইত, যদি আমি ঠিক শশিভূষণকে হত্যা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, সুখে মরিতে পারিতাম। লীলাকে একজন নররাক্ষসের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া মনে করিতে পারিতাম, আমার মৃত্যুতে একটা কাজ হইল। মানুষ যাহা মনে করে, তাহার কিছু হয় না। সেই সর্বশক্তিমানের অঙ্গুলি হেলনে সমগ্র বিশ্ব সমভাবে শাসিত হইতেছে, সেখানে মানুষ আর মানুষের কি বিচার করিবে? তাঁহার এমনই রচনা কৌশল—পাপী নিজের হাতেই স্বকৃত পাপের দণ্ডবিধান করিয়া থাকে। দুগ্ধপোষ্য অপরিস্ফুটবাক্ শিশু ব্যাঘ্র-কবলিত হইলে যেমন সে প্রথমে নিজের বিপদ বুঝিতে পারে না, বরং সেই যতক্ষণ ব্যাঘ্র কর্তৃক কোনরূপে পীড়িত না হয়, ততক্ষণ তাহার উল্লম্ফন, ভীষণোজ্জ্বল চক্ষু এবং দীর্ঘ লাঙ্গুলান্দোলনে বরং সেই শিশুর বিরলদন্ত মুখে, নধর অধরপুট দিয়া কল্লোলিত শুভ্রহাস্যস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে! হায়! স্বপ্নাবিষ্ট আমারও তেমনি এই দুঃখ-দারিদ্র্য ভীষণ শোক-তাপপূর্ণ, বিপদ সঙ্কুল কঠিন সংসারের বক্ষ শায়িত হইয়া কোন্ মোহে অবিশ্রাম হাস্য-তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে থাকে! তাহার পর যখন কোন

অপ্রতিহত দুর্দান্ত আঘাতে স্বপ্ন ভাঙিয়া যায় এবং মোহ ছুটিয়া যায়, তখন নিরবলম্বন এবং আশা ভরসা শূন্য হইয়া, হৃদয় শতধা বিদীর্ণ করিয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠি।

যোগেশের এই মর্মস্পর্শী আত্মকাহিনী যখন শেষ হইল—তখন চকিতে চাহিয়া দেখি বহির্জগত প্রভাতে কোমল আলোক পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে! আমি তাহার কাহিনীতে এমনি মগ্ন এবং তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, এ সব কিছুই জানিতে পারি নাই। আমি তাড়াতাড়ি আর একটি চুরুট ধরাইয়া উঠিয়া পড়িলাম। এমন সময়ে একজন প্রহরী সশব্দে কারা দ্বার উন্মোচন করিয়া ফাঁসির আসামী হতভাগ্য যোগেশচন্দ্রের শেষ আহার্য হস্তে আমাদের সম্মুখীন হইল। তাঁহার একঘণ্টা পরে সকলই ফুরাইল—যোগেশচন্দ্রের নাম এ জগতে জীবিত মনুষ্যের তালিকা হইতে চিরকালের জন্য মুছিয়া গেল। হতভাগ্য ফাঁসি-কাষ্ঠে আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। পাঠক! আমি আজ বত্রিশ বৎসর এই জেলখানায় কাজ করিতেছি ; কিন্তু এমন শোচনীয় ব্যাপার আমার আমলে কখনও ঘটে নাই। সেইদিন হইতে যেন নিজের ও নিজের কারাধ্যক্ষ পদটার উপরে আমার একটি বিজাতীয় ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল। আশা করি, পতিত-পাবন ঈশ্বর, ভ্রান্ত পতিত যোগেশচন্দ্রের পরলোকগত আত্মার শান্তি বিধান করিবেন।—জনৈক কারাধ্যক্ষ।

খানিকটা তামার তার

হেমেন্দ্রকুমার রায়

মানিক চেঁচিয়ে পড়ছিল খবরের কাগজ। শ্রোতা হচ্ছে জয়ন্ত। সে চোখ বুজে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে। তার মুখে বিরক্তির লক্ষণ। কোন খবরে নূতনত্ব নেই। খুনীরা খুন করছে সেই পুরাতন উপায়ে। চোরেরাও চুরি করবার নূতন পথ অবিষ্কার করতে পারছে না। সাধু এবং অসাধু সব মানুষই হচ্ছে একই বাঁধা পথের পথিক।

মানিক একটা নূতন খবর পড়ছে ঃ

'অদ্ভুত দৈব দুর্ঘটনা!'

গত সপ্তাহে শালিখার একটা বাড়িতে অজিতকুমার বসু নামক জনৈক যুবক বজ্রাঘাতে মারা পড়িয়াছিল, এই সংবাদ আমরা যথাসময়ে পত্রস্থ করিয়াছি। গতপরশু রাত্রে আবার সেই বাড়িতেই অজিতকুমারের দ্বিতীয় ভ্রাতা অসীমকুমারের মৃত্যু হইয়াছে ঐ বজ্রাঘাতের ফলেই। ইংরেজি প্রবাদে বলে, দুর্ভাগ্য কখনো একাকী আসে না। কিন্তু উপর-উপরি দুইবার একই পরিবারে একই দুর্ভাগ্যের এমন আশ্চর্য আবির্ভাবের কাহিনী আমরা আর কোনদিনই শ্রবণ করি নাই।

জয়ন্ত চোখ মেলে সোজা হয়ে উঠে বসে বললে, 'থামো মানিক। আপাতত আর কোন খবর পড়ে শোনাতে হবে না।'

মানিক হেসে বললে, 'বুঝেছি।'

'কী বুঝেছ?'

'এই খবরটার ভিতরে তুমি চিন্তার খোরাক পেয়েছ?'

'তা পেয়েছি বৈকি। আমার পাপী মন এরকম অসম্ভব দৈব দুর্ঘটনাকে সহজে স্বীকার করতে রাজি নয়। ভগবানের হাতের আড়ালে আমি দেখছি মানুষের হাত।'

মানিক জবাব না দিয়ে কাগজখানা সামনের টেবিলের উপর রেখে দিলে।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর বললে, 'টেলিফোনের রিসিভারটা এগিয়ে দাও তো।'

'কাকে ফোন করবে?'

'আমাদের বন্ধু গিরীন্দ্র চৌধুরীকে।'

'ইনস্পেক্টর গিরীন্দ্র চৌধুরী?'

'হ্যাঁ। তার কার্যক্ষেত্র তো ঐ অঞ্চলেই ; হয়ত সে আমাদের অন্ধকার মনকে কিঞ্চিৎ আলোকিত করতে পারবে।'

যথাসময়ে ফোনের মধ্যে জাগ্রত হল গিরীন্দ্র চৌধুরীর কণ্ঠস্বর।

'গিরীন্দ্র, আমি জয়ন্ত।'

'ব্যাপার কী? হঠাৎ আমাকে মনে পড়ল কেন?'

'একই বাড়িতে বজ্রাঘাতে দুই ব্যক্তির মৃত্যু। ঘটনা কি তোমারই এলাকায় ঘটেছে?'

'ও হো হো, বুঝেছি। মনসা পেয়েছে ধুনোর গন্ধ! তা, ঠিক আন্দাজ করেছ ভাই। ঘটনাস্থলে আমাকেও হাজির হতে হয়েছে বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত।'

'মানে?'

'মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মারছে সন্দেহ। কিন্তু সে সন্দেহ প্রকাশ বা পোষণ করবার উপায় নেই।'

'কেন?'

'লোক দুটো সত্য-সত্যই বজ্র বা বিদ্যুতের আক্রমণে মারা পড়েছে।'

'তবে আবার সন্দেহ কিসের?'

'না, ঠিক সন্দেহও নয়। তবে মাঝে মাঝে পাচ্ছি যেন বিপরীত ইঙ্গিত। একবার বেড়াতে বেড়াতে আমার এখানে আসবে নাকি?'

'নারাজ নই।'

॥ ২ ॥

জয়ন্ত ও মানিককে দেখে গিরীন্দ্র বললে, 'প্রথমেই তোমরা কি এক-এক পেয়ালা কফি পান করতে চাও? জান তো, আমি চায়ের ভক্ত নই।'

জয়ন্ত বললে, 'কফি বা চা কিছুই চাই না। আমরা আজ গল্প করতে এসেছি।'

'তাহলে একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করি?'

'হ্যাঁ, গৌরচন্দ্রিকা বাদ দিয়ে।'

'শোন। আজ এক বৎসর হল, অমরনাথ বসু মারা গিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন বড় জমিদার, যথেষ্ট স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক। অজিতকুমার, অসীমকুমার আর অমলকুমার হচ্ছে তার তিন ছেলে। ছোট অমল নাবালক, সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র। অমরবাবুর একটি মাত্র মেয়ে সুষমা, তার বিবাহ হয়েছে, স্বামীর নাম সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। সুষমার শ্বশুরবাড়ি বিদেশে। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর ভাইদের অনুরোধে স্বামীর সঙ্গে বাপের বাড়িতেই বাস করে। এই হচ্ছে গত আর বর্তমান পাত্রপাত্রীদের পরিচয়।

'প্রথমে অজিত যখন বজ্রাঘাতে মারা পড়ে, ঘটনাটা আমার মনে স্থায়ী রেখাপাত করেনি। ডাক্তার বললে, মৃত্যুর কারণ বিদ্যুতের আঘাত। কিন্তু গেল পরশু অসীমও ঐ ভাবে মারা পড়তে আমরা রীতিমত চমকে গিয়েছি। এবারেও ডাক্তারের মুখে মৃত্যুর কারণ শুনলুম বটে, কিন্তু দুই সপ্তাহের মধ্যে একই পরিবারের উপর বজ্রের এমন পক্ষপাতিত্ব বিস্ময়কর। অবশ্য দুই ঘটনার রাত্রেই মেঘাচ্ছন্ন সজল আকাশ থেকে বজ্রের হুঙ্কার আমরা সকলেই শুনেছি।'

'তবে তুমি সন্দিগ্ধ হয়েছ কেন?'

'দু-দিনই ঘটনাস্থলে গিয়ে দুটো মৃতদেহ ছাড়া বজ্রাঘাতের আর কোন চিহ্নই দেখতে পাইনি।'

'এ ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করেছ?'

'করেছি। দু-দিনই লাস পাওয়া গিয়েছে জানালার তলদেশে মেঝের উপরে। এও লক্ষ্য করেছি মৃত্যুর রাত্রে অজিত আর অসীম যে বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়েছিল, খাটের শয্যার উপরে সে প্রমাণের অভাব নেই। কিন্তু দুর্যোগময় গভীর রাত্রে তারা শয্যা ত্যাগ করে জানালার ধারে এসেছিল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাইনি।'

'তাহলে তোমরা কোন মামলা খাড়া করতে পারনি?'

'উহুঁ! মামলা দাঁড়াবে কিসের উপরে? প্রমাণ কই? সন্দেহ তো প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে না!'

'আমাকে একবার ঘটনাস্থলে নিয়ে যেতে পার?'

'অনায়াসে। সেখানে গিয়ে পৌঁছাতে পাঁচ-ছয় মিনিটের বেশি লাগবে না। কিন্তু সেখানে গিয়ে তুমি কী দেখবে?'

'যা দেখবার তাই।'

গিরীন্দ্র হেসে উঠে বললে, 'কিন্তু আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি সেখানে গিয়ে আমরা

যা দেখেছি, তার চেয়ে বেশি কিছুই তুমি দেখতে পাবে না। এটা মামলাই নয়, আশ্চর্যভাবে দৈব দুর্ঘটনায় দুটো লোক মরেছে এইমাত্র।'

'আশা করি তোমার কথাই সত্য হবে। এখন চল।'

অমরবাবুর বাড়িখানি মাঝারি। তার পূর্বদিকে ট্রামলাইনের পাতা রাস্তা, পশ্চিম দিকে খিড়কির পুকুর ও বাগান এবং দক্ষিণ দিকে প্রতিবেশীদের বাড়ির সারি।

গিরীন্দ্রের সঙ্গে জয়ন্ত ও মানিক রাস্তার দিকের দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

গিরীন্দ্র সব দেখাতে দেখাতে বললে, 'বারান্দার কোণে এই যে তিনখানা ঘর দেখছ, এর প্রথমখানা হচ্ছে অজিতের ঘর। দ্বিতীয়খানা অসীমের ঘর তৃতীয়খানা অমলের। প্রথম ঘরের এই জানালার তলায় অজিতের, আর দ্বিতীয় ঘরের ঐ জানালার তলায় পাওয়া গেছে অসীমের মৃতদেহ। এ দুটো ঘর এখন খালি পড়ে আছে।'

জয়ন্ত দু'খানা ঘরে ঢুকে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল।

প্রত্যেক জানালা, এমনকি দেওয়ালের লোহার গরাদ পর্যন্ত ভাল করে পরীক্ষা করলে। উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া গেল না।

তারপর তারা তৃতীয় ঘরের একটা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বাহির থেকেই দেখা গেল, ঘরের ভিতরে চেয়ারের উপরে বসে রয়েছে দুটি লোক। একজনের বয়স হবে আঠারো উনিশ আর এক জনের চল্লিশের কাছাকাছি।

জয়ন্তের দিকে ফিরে গিরীন্দ্র চুপিচুপি বললে, 'অমল আর তার ভগ্নিপতি সুরেনবাবু।' তারপর ঘরের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বললে, 'কী হয়েছে সুরেনবাবু, অমলের মুখের ভাব অমনধারা কেন?'

অমলের মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে সুরেন বললে, 'বাড়িতে আবার পুলিশ দেখে অমল ভয় পেয়েছে। তাই আমি একে বোঝাবার চেষ্টা করছি।'

'বেশ করেছেন। আমরা বাঘ নই, তেড়ে গিয়ে অমলকে কামড়ে দেব না। আজ একেবারে শেষ তদন্ত করতে এসেছি, আর আসব না।'

সুরেন বললে, 'আর তদন্ত! এ হচ্ছে ভগবানের মার, পুলিশ তদন্তের ধার ধারে না!'

সেদিক থেকে ফিরে আসতে আসতে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'অমল কি এখনো এই ঘরে থাকে?'

'হ্যাঁ।'

'একলা?'

'হ্যাঁ।'

'সুরেনবাবুর ঘর কোথায়?'

'বাড়ির পশ্চিম দিকে।'

বারান্দার রেলিঙের উপরে হাত রেখে ট্রামের রাস্তার দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে যে কী ভাবছে, তার মুখ দেখে কিছুই বোঝবার জো নেই।

মানিক বললে, 'কী হে, ধ্যান সাগরে তলিয়ে গেলে নাকি?'

'আমি তলাবার চেষ্টা করছি না মানিক, আমি ভাসবার চেষ্টা করছি।'

গিরীন্দ্র ঠাট্টার সুরে বললে, 'কী আবিষ্কার করলে শুনি?'

'শুনবে? এই বাড়িতে চোর আসতে পারে খুব সহজেই।'

'তাই নাকি?'

'নিচের ঐ গ্যাস-পোস্টার দিকে তাকিয়ে দেখ। ওর উপরে উঠলেই এই বারান্দার নাগাল পাওয়া যায়।'

'উঃ, অভাবিত আবিষ্কার!'

'আর একটা আবিষ্কার করেছি। রাস্তার ওধারকার ঐ বাড়িখানার গায়ে ভাড়া-পত্র টাঙানো রয়েছে। ও-বাড়িখানা ভাড়া দেওয়া হবে।'

'তাতে তোমারই বা কী, আমারই বা কী?'

'মনে করছি বাড়িখানা আমিই ভাড়া নেব। জায়গাটি আমার বেশ লাগছে। কিছুদিন এখানে বাস করব।'

'মানে?'

'মানে কিছুই নেই। এ হচ্ছে আমার খেয়াল। আর খেয়াল হচ্ছে অর্থহীন। অতঃপর আমরা প্রস্থান করতে পারি।'

জয়ন্ত ঠাট্টা করেনি, আজ ক'দিন হল সত্যসত্যই শালিখার সেই বাড়িখানায় উঠে এসেছে। মানিকের কৌতূহলের সীমা নেই। সে বিলক্ষণ জানে, জয়ন্তর খেয়াল হয় না অকারণে। ঐ দুই মৃত্যুর ভিতর থেকে সে কোন সূত্র আবিষ্কার করেছে নিশ্চয়ই। নইলে ঘটনাস্থলের সামনা-সামনি থাকবার জন্যে তার এতখানি আগ্রহ কেন?

জয়ন্তের মনের ভিতর প্রবেশ করবার জন্যে গিরীন্দ্রও কম ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। সে রোজই আসে আর একই প্রশ্ন করে, 'কেন তুমি এ বাড়িখানা নিলে? এখানে থাকলে তোমার কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে?'

জয়ন্ত বোবা। শুধু মুখ টিপে হাসে আর নস্য নেয়।

হপ্তা-দুই কেটে গেল। দুপুরবেলায় জয়ন্ত বাইরে বেরিয়েছিল। একটা ছোট ব্যাগ হাতে করে ফিরে এল সন্ধ্যার সময়ে।

মানিক বললে, 'ব্যাগটি নতুন দেখছি। ভিতরে কি আছে?'

ব্যাগটা সযত্নে আলমারির ভিতর পুরে রহস্যময় হাসি হেসে জয়ন্ত বললে, 'যথাসময়েই বুঝতে পারবে।'

মানিক রাগ করে বললে, 'এত রাগ কেন?'

'প্রথম পরিচ্ছেদেই পরিশিষ্টের কথা বলে দিলে উপন্যাস পড়তে কারুর ভাল লাগে না। গোয়েন্দা-কাহিনীর আর্ট প্রকাশ পায় লুকোচুরির ভিতর দিয়ে।'

রাত এগারোটা বেজে গেল। এই সময়েই নৈশ আহার শেষ করে জয়ন্ত শয্যায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু আজ সে খেয়ে দেয়ে রাস্তার ধারের জানালার সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে বসে পড়ল।

মানিক শুধোলে, 'ঘুমোতে যাবে না?'

'না।'

'কেন হে?'

'আমি দেখতে চাই আজ গভীর রাত্রে চাঁদের মুখে কালি ঢেলে গোটা আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে যায় কি না। তারপর হয়ত জাগবে হু-হু ঝোড়ো বাতাস, হয়ত ঝরবে ঝরো-ঝরো বাদলধারা, হয়ত বাজবে ডিমি ডিমি বজ্র ডমরু।'

'হঠাৎ উদ্ভট কবিত্বের কারণ কী?'

'কবি হতে চায় না কে বল?'

'আকাশে তো দেখি প্রতিপদের চাঁদের প্রতাপ। কেমন করে আজ ঝড়বৃষ্টি নামবে?'

'গণৎকার জানিয়ে দিলে।'

'সে আবার কে?'

'আবহবিদ্যা নিয়ে যাদের কারবার। জান তো আবহবিদ্যা জাহির করবার জন্যে সরকারি অফিস আছে? আজ আমি সেখানে গিয়েছিলাম। খবর পেলুম, আজ শেষ রাতের দিকে রীতিমত ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।'

'তুমি ক্রমেই অন্যায় রকমের দুর্বোধ্য হয়ে উঠছ। আর তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করব না। আমি এখন ঘুমোতে চাই।'

'তথাস্তু।'

অনেক রাতে কিসের শব্দে হঠাৎ মানিকের ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের ভিতর হু-হু করে ঢুকছে জোর হাওয়া। ঘরের দরজাটা খোলা। জানালার সামনে চেয়ারের উপর জয়ন্ত নেই। তার বিছানাও শূন্য।

বজ্রের হুঙ্কারে চমকে মানিক বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, চাঁদের আলোর বদলে সেখানে দেখা যাচ্ছে কেবল অন্ধকারকে। বৃষ্টি নামার শব্দও শোনা গেল।

তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করতে গিয়ে মানিকের চোখে পড়ল আর এক দৃশ্য। অমরবাবুর বাড়ির সামনে গ্যাস-পোস্টের উপরে একটা মূর্তি। পরমুহূর্তেই মূর্তিটা ঝাঁপ খেল মাটির উপরে। গ্যাসের আলোতে চিনতে বিলম্ব হল না। জয়ন্ত।

মানিক হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছে, জয়ন্ত আবার এসে দাঁড়ালো ঘরের ভিতরে। তার হাসি-হাসি মুখ।

'এসব কী, জয়ন্ত, তুমি চোরের মত অমরবাবুর ঘরে গিয়েছিলে?'

'গিয়েছিলাম।'

তোমার পায়ে রবারের জুতো, হাতে রবারের দস্তানা!'

হ্যাঁ, এ হচ্ছে vulcanised রবার।'

'আশ্চর্য!'

'এর চেয়ে বেশি আশ্চর্য যদি হতে চাও তাহলে ছুটে যাও টেলিফোনের কাছে।'

'তারপর?'

'গিরীন্দ্রকে ফোন কর। বল, এখনি সদলবলে ছুটে আসতে।'

'সেকি, এই রাতে? এই ঝড়-জলে?'

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। বোকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করো না। গিরীন্দ্রকে বল, এখনি সদলবলে অমরবাবুর বাড়িতে না গেলে এ মামলার কিনারা হবে না। ততক্ষণে আমি একটু বিশ্রাম করে নি।'

অল্পক্ষণ পরেই একদল পাহাওয়ালা নিয়ে গিরীন্দ্র এসে হাজির হলেন হন্তদন্তের মত।

সে কোন প্রশ্ন করবার আগেই জয়ন্ত বললে, 'এখন কোন কথা নয়। এখনই আমাদের যেতে হবে অমরবাবুর বাড়ির ভিতরে।'

দারোয়ানরা দরজা খুলে দিয়ে এই সময়ে পুলিশ দেখে অবাক হয়ে গেল। জয়ন্ত সকলকে নিয়ে উঠে গেল একেবারে উপরে। রাস্তার ধারের বারান্দায় গিয়ে সে টর্চের আলো ফেললে। সেখানে পড়ে আছে একটা নিশ্চেষ্ট মূর্তি।

গিরীন্দ্র সভয়ে বললে, 'বাবা! আবার বজ্রাঘাতে মৃত্যু নাকি?'

জয়ন্ত বললে, 'আরো এগিয়ে গিয়ে দেখ।'

গিরীন্দ্র কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে ভাল করে দেখে মহা বিস্ময়ে বলে উঠল, 'একি, সুরেনবাবু! এঁর হাত পা মুখ বাঁধলে কে?

জয়ন্ত বললে, 'আমি।'

'কেন?'

'সুরেন হচ্ছে খুনী।'

'খুনী! সুরেনবাবু আবার কাকে খুন করেছেন?'

'অজিত আর অসীমকে।'

এমন সময় বারান্দার তৃতীয় ঘরের একটা জানলা খুলে গেল। ভিতর থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল অমলের ভীত মুখ।

জয়ন্ত বললে, 'সুরেন আজ আবার বধ করতে চেয়েছিল ঐ বেচারা অমলকে।

গিরীন্দ্র বললে, 'কিন্তু অজিত আর অসীমের মৃত্যু হয়েছে বজ্রাঘাতে। বজ্র তো সুরেনবাবুর হাতে-ধরা নয়!'

'অজিত আর অসীম বজ্রাঘাতে মারা পড়ে নি। তাদের মৃত্যু হয়েছে মানুষের হাতে বন্দী বিদ্যুৎ-প্রবাহের দ্বারা।

'প্রমাণ?'

'ঐ জানালার দিকে তাকিয়ে দেখ।'

জানলার ছয়টা গরাদের গায়ে জড়ানো রয়েছে খানিকটা তামার তার।

গিরীন্দ্র মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বিদ্যুৎ-প্রবাহ সবচেয়ে বেশি জোরে চলে রুপোর ভিতর দিয়ে। তারপর তামার স্থান। তারপর সোনা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি।'

'বুঝলুম। কিন্তু এই তামার তারের ভিতর দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হবে কেমন করে?'

'সামনেই ট্রামের লাইন। মাথার উপর যে মোটা তারের সাহায্যে বৈদ্যুতিক ট্রাম চলে, জানলার এই তামার তারের অন্য প্রান্ত এখনো ঝুলছে তার সঙ্গে লগ্ন হয়ে। মাঝখান থেকে তার কেটে দিয়েছি আমি নইলে এতক্ষণে আমাকেও কেউ জীবিত অবস্থায় দেখতে পেতো না।'

'কী ভয়ানক, কী ভয়ানক! কিন্তু—'

'এখনো তোমার মনে "কিন্তু" আছে? তাহলে আর একটু পরিস্কার করে বলছি শোন?'

।। ৪ ।।

জয়ন্ত বলতে লাগল ঃ

'সুরেন হচ্ছে একটি প্রথম শ্রেণীর অতি-চালাক শয়তান। মাথা খাটিয়ে নরহত্যার বেশ একটি নূতন উপায় আবিস্কার করেছিল। কাজ করত এমন এক রাতে, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্র যেদিন তাকে সাহায্য করবে। কী করে সে মনের মত রাত্রি নির্বাচন করত, এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে। আমি মনে করি, আমার মতন সেও কোন সরকারি আবহ-বিদ্যাবিদের কাছে আনাগোনা করত।'

'এরূপ অবস্থায় মানুষের পক্ষে কী করা স্বাভাবিক, এ নিয়ে সে মনে মনে আলোচনা করেছিল। এই বর্ষাকালেও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ আমরা, শয়নগৃহের জানলার পাশেই শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করি। রাত্রে যদি হঠাৎ বৃষ্টি আসে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। তারপর বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে নিদ্রাজড়িত চক্ষে তাড়াতাড়ি সর্বাগ্রে খোলা জানালাগুলো দুমদাম শব্দে বন্ধ করে দি।'

'আমাদের এই অভ্যাসের উপর নির্ভর করে সুরেন ফাঁদ পাতত, চমৎকার ফাঁদ। খানিকটা তামার তার সে এমনভাবে জানলার গরাদগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে রাখত যে জানলা বন্ধ করতে গেলেই সেই তার স্পর্শ করা ছাড়া উপায় নেই। তামার তারের অপর প্রান্ত সে নিক্ষেপ করত বৈদ্যুতিক শক্তিতে জীবন্ত ট্রামের তারের উপরে। জলে জানালার তার আরও জীবন্ত হয়ে উঠত, তখন তাকে ছুঁলেই মৃত্যু অনিবার্য।'

'তারপর যথাসময়ে সুরেন আবার এসে নিজের অপকীর্তির গুপ্ত চিহ্নগুলো বিলুপ্ত করে দিত। আমার বিশ্বাস বিপজ্জনক মৃত্যুকে নিয়ে এমনভাবে খেলা করার সময়ে আমার মত সুরেনও ব্যবহার করত vulcanised রবারের জুতো ও দস্তানা। ফলে বৈদ্যুতিক শক্তি তাকে আক্রমণ করতে পারত না।'

'সুরেন এটাও হয়ত অনুমান করেছিল যে, একই বাড়িতে একই ভাবে উপর-উপরি তিনজন লোকের মৃত্যু হলে পুলিশের সন্দেহের সীমা থাকবে না। কিন্তু এটাও তার অজানা ছিল না যে, আসল রহস্য আবিস্কার করতে না পারলে যে কোন সন্দেহই পঙ্গু হয়ে থাকবে, কারণ সন্দেহ ও প্রমাণ এক কথা নয়। কিন্তু সুরেন অতি-চালাক কিনা, তার চক্রান্ত বুঝবার মতন লোকও যে পৃথিবীতে থাকতে পারে, এটা সে ধারণায় আনতে পারে নি। এ হচ্ছে অতি-চালাকির দুর্বলতা।'

'একই বাড়িতে উপরি-উপরি দুই ব্যক্তির বজ্রাঘাতে মৃত্যু, অথচ ঘরে বজ্রাঘাতের অন্য কোন চিহ্ন নেই এবং মৃত ব্যক্তিকে পাওয়া যায় ঠিক জানালার ধারেই। এইসব অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখেই আমি পেয়েছিলুম এর মধ্যে হত্যাকারীর হাতের সন্ধান। তারপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে জীবন্ত তারের দিকে তাকিয়ে থাকতেই আমার মনে ফুটে উঠল সন্দেহের ভীষণ ইঙ্গিত।'

'তারপর হত্যার উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে বিলম্ব হল না। অমরবাবুর তিন পুত্রের অবর্তমানে সম্পত্তির মালিক হবেন তাঁর কন্যা এবং সুরেন হচ্ছে সেই কন্যার স্বামী।'

'ঘটনাস্থলের উপর পাহারা দেবার জন্যেই আমি সামনের বাড়িখানা ভাড়া নিয়েছিলুম। আবহ-বিদ্যাবিদ বললেন, আজ গভীর রাত্রে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। আমিও অতিজাগ্রত হয়ে উঠলুম, বারান্দার উপরে চোরের মতন সুরেনের আবির্ভাব। আমিও চুপি চুপি গ্যাসপোস্টের সাহায্যে বারান্দায় উঠে অন্ধকারে লুকিয়ে রইলুম। তারপর সুরেনের মৃত্যু-ফাঁদ পাতা যেই শেষ হল, আমিও অমনি বাঘের মতন তার ঘাড়ের উপরে লাফিয়ে পড়লুম—আমি চেয়েছিলুম তাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলতে। সে টুঁ-শব্দটি করবার আগেই আমি তাকে বন্দী করে ফেললুম এবং তখনই কেটে দিলুম বৈদ্যুতিক শক্তিতে জীবন্ত মৃত্যু-ফাঁদের তার।'

'গিরীন্দ্র, বোধহয় তোমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই? কিন্তু আমার আরও একটি ছোট বক্তব্য আছে। বন্ধু, পুলিশে চাকরি নিয়ে যন্ত্রে পরিণত হয়ো না। কল্পনা-শক্তির চর্চা করতে শেখো। কল্পনা-শক্তি কেবল কবিদের একচেটে নয়, তাকে দরকার প্রতি মানুষের প্রতি পদে, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে।

অন্ধকারে গোলাপ বাগানে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সাড়ে সাতটার সময় মাস্টারমশাই আসবেন, ঠিক সাতটা বেজে কুড়ি মিনিটে আলো নিভে গেল। এখন লণ্ঠন জ্বালতে হবে। তিনতলার ঘরে ঠিক জানালার ধারেই সুজয়ের পড়ার টেবিল। সে সেখানেই বসে রইলো চুপ করে। জানালার বাইরে গোটা কলকাতাটাই অন্ধকার।

দোতালায় মায়ের গলা শোনা যাচ্ছে। মা শিবুকে বললো হ্যারিকেন জ্বালাতে। শিবু বললে, দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি না। রোজই এই রকম হয়। আলো নিভে গেলে তখন আর দেশলাই কিংবা টর্চ খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুজয়দের বাড়িতে একটা চার ব্যাটারির টর্চ আছে। খুব জোর আলো হয়। সেই টর্চটা কোথায়?

সুজয় চোখ বুজে ভাববার চেষ্টা করলো। চোখ বুজলে সে অনেক কিছু দেখতে পায়।

কিন্তু চোখ বুজে সুজয় একটা অন্য দৃশ্য দেখলো। ঠিক যেন সিনেমার ছবির মতন...

...অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে টর্চ হাতে হেঁটে আসছে একজন লোক...লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে না, টর্চের আলোয় মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে শুধু লোকটির পায়ে সাদা কেড্‌স জুতো, তার প্যান্টের রং হলদে...লোকটি হাঁটছে খুব তাড়াতাড়ি, টর্চের আলো পড়ছে এদিক ওদিক...

—মাঠ তো নয়, ওটা একটি বাগান। টর্চের আলোয় দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো নানারকম ফুল গাছ, লোকটি এক একটি গাছের ওপরে আলো ফেলে দেখছে, তারপর আলোটা একটি গোলাপ গাছের ওপর থেমে গেল। তিনটে বেশ বড় গোলাপ ফুটে আছে সেই গাছে...

এবার লোকটি হাঁটু গেড়ে বসলো সেই গাছটির কাছে। এখনো লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে না, গায়ে একটা ডোরাকাটা হাওয়াই শার্ট...হাঁটু গেড়ে বসে লোকটি প্যান্টের পকেটে ডান হাতটা ঢোকালো তারপর কী যেন একটা জিনিস বার করে আনলো...

সুজয়ের বুকটা ধক্ করে উঠলো...লোকটার হাতে ওটা কী? টর্চটা মাটিতে রাখলো, তারপর দু'হাত দিয়ে সেই জিনিসটা আলোর সামনে আনতেই দেখা গেল সেটা একটা গোটানো ছুরি, সেটার ফলাটা টেনে খুলে ফেলতেই ঝক্‌ঝক্ করে উঠলো আলোয়..দূরে একটা কুকুর ডাকছে...ডাকতে ডাকতে কুকুরটা যেন এগিয়ে আসছে কাছে...

—এই যে হারিকেন এনেছি।

সুজয় চমকে উঠতেই ঘোর কেটে গেল তার। শিবু হারিকেন নিয়ে এসেছে। সুজয়ের একটু রাগ হলো। ইস্ নষ্ট হয়ে গেল ছবিটা।

একতলায় একটা কুকুর ডাকছে। এতো চেনা ডাক। সুজয়ের নিজের কুকুর ডুংগা হঠাৎ ডেকে উঠছে। ডুংগা জাতে অ্যালসেসিয়ান, খুব শান্ত কুকুর, তবু লোকে দেখলে ভয় পায়। ডুংগা সহজে ডাকে না। এখন হঠাৎ ডাকছে কেন?

—আর একটু পরে আলোটা আনতে পারলে না?

শিবু বললো, ওমা, তুমি অন্ধকারে বসে থাকবে, মা বললেন, শিগ্‌গির হারিকেনটা দিয়ে আয়। খোকাবাবু অন্ধকারে ভয় পাবে।

সুজয় বললো, হুঁ, আমি অন্ধকারে ভয় পাবো, এই ডুংগা ডাকছে কেন রে?

—নিশ্চয়ই কোনো ছাতাওয়ালা বাবু এসেছে।

তা ঠিক। ডুংগা একদম ছাতা পছন্দ করে না। কারুর হাতে ছাতা দেখলেই বিরক্তি প্রকাশ করে।

–যা তো নিচে গিয়ে দেখে আয়!

শিবু চলে যেতেই সুজয় ভুরু কুঁচকে বসে রইলো। হঠাৎ চোখ বুজে সে ঐ দৃশ্যটা দেখলে কেন? কোনো সিনেমায় কি শিগ্‌গিরই এ রকম কোনো দৃশ্য দেখেছে? না

তো! কোনো গল্পের বইতে পড়েছে? তাও না! অন্ধকারের মধ্যে বাগানে একটা লোক, একটা গোলাপ গাছের সামনে ছুরি হাতে নিয়ে বসা—লোকটার মুখ দেখা যায় নি...লোকটা কি ছুরি দিয়ে গোলাপ গাছটা কেটে ফেলবে? কেন?

সুজয় আবার চোখ বুজলো। যদি বাকি অংশটা দেখা যায়। কিন্তু এবার কিছুই দেখা গেল না। এমনি চোখ বুজলে যে-রকম হয় সেই রকম।

হারিকেনের আলোটা খুব কমিয়ে টেবিলের তলায় নামিয়ে রেখে আবার চোখ বুজে দেখার চেষ্টা করলো সুজয়। এবারও দেখা গেল না কিছুই।

দরজার কাছে আওয়াজ হতেই সুজয় চোখ খুলে তাকালো। মাস্টারমশাই এসেছেন। হাতে একটা ছাতা।

—কী সুজয়, হারিকেনটা নামিয়ে রেখেছো কেন?

সুজয় উঠে দাঁড়িয়ে হারিকেনটা তুলে বললো, আসুন তপনদা, আপনি আজ আবার ছাতা নিয়ে এসেছেন?

সুজয় পড়ে ক্লাস নাইনে। তার মাস্টারমশাই সবেমাত্র এম. এ. পাশ করেছেন। প্যান্ট-শার্ট পরেন আর খুব লবঙ্গ খেতে ভালোবাসেন। সব সময় মুখে লবঙ্গ।

মাস্টারমশাই বললেন, বাঃ, বৃষ্টি হলেও ছাতা আনতে পারবো না? তোমার কুকুর একেবারে ঘেউ ঘেউ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমায় চেনে, এতদিন ধরে দেখছে...

এই ডুংগা যে সুজয়ের কতবড় বন্ধু তা তো মাস্টারমশাই জানেন না। ডুংগার মনে কোনো কষ্ট হলে সুজয় সহ্য করতে পারে না।

—বৃষ্টি হচ্ছে বুঝি?

—আমাদের পাড়ায় তো তুমুল বৃষ্টি। তোমাদের এখানেও টিপি টিপি করে সুরু হয়েছে।

সুজয় জানলা দিয়ে বাইরে হাত বাড়িয়ে দেখলে, সত্যিই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

অমনি সুজয়ের মনে পড়লো, অন্ধকার বাগানে যে লোকটা সাদা কেড্‌স পরে হাঁটছিল, তার জুতোয় কোনো কাদা ছিল না।

চেয়ার টেনে মাস্টারমশাই বললেন, যে অঙ্কগুলো দিয়েছিলাম, করেছো?

সুজয় খাতা বার করলো। কিন্তু পড়াশুনোয় আজ তার মন বসছে না। যদিও সামনেই পরীক্ষা।

এক সময়ে মাস্টারমশাই বললেন, এ কি, সুজয়, মন দিচ্ছো না কেন? কতবার বলছি লিখতে, তুমি পেন্সিল হাতে বসে আছো!

সুজয় লজ্জা পেয়ে বললে, ও! এই যে লিখছি! কী যেন বলছিলেন তপনদা?

মাস্টারমশাই বললেন, তোমার দোষ কী ; এই হারিকেনের আলোতে কী পড়া যায়। পাখা বন্ধ, যা গরম, পরশু তো রবিবার, সেদিন আমি দুপুরে আসবো...

এক ঘন্টার মধ্যেই মাস্টারমশাই চলে গেলেন। ঠিক এর পরেই সুজয়ের খাবারের ডাক পড়ে।

খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে রোজ সুজয় খানিকক্ষণ ডুংগাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

শহরের এ দিকটা এখনও অন্ধকার। বৃষ্টি এখনও টিপি টিপি পড়ছে। ডুংগা জলে ভিজতে চায় না। গায়ে একটু জল লাগলেই দু' কান লট্ পট্ করে গা ঝাড়া দেয় খুব জোরে। সুতরাং আজ আর ছাদে ঘোরা যাবে না।

সুতরাং ডুংগাকে নিয়ে সুজয় চিলেকোঠায় বসে রইলো। ডুংগা একবার করে বাইরে মুখ বাড়ায়, আর নাকে বৃষ্টি লাগলেই ফিরে আসে।

সুজয়ের আবার মনে পড়লো সেই দৃশ্যটা।

সুজয় মাঝে মাঝেই চোখ বুজে এরকম সব জিনিস দেখতে পায়। কখন যে দেখবে তা ঠিক নেই। এক একদিন কিছুই দেখে না।

দৃশ্যগুলো নানা রকম হয়। পাহাড়ের পাশের সরু রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে তিনজন ছেলে...জঙ্গলের মধ্যে একটা গাছ ভেঙে পড়লো মড় মড়িয়ে...। একটা ফুলের পাপড়ি দুলছে আস্তে আস্তে আর একটা মৌমাছি বোঁ বোঁ করে ঘুরছে তার পাশে...। সোনারপুরে ওর ছোটমামার বাড়ির গোয়ালঘরে একটা শেয়াল ঢুকে বসে আছে, দুটো গরু ডাকছে হাম্বা হাম্বা....।

চোখ বুজে সুজয় যে দৃশ্যগুলি দেখে, তা সে কিন্তু আগে সত্যি সত্যি দেখে নি কখনো। চোখ বুজলে দৃশ্যগুলি কোথা থেকে এসে যায় কে জানে। একবার সে দেখেছিল, সম্রাট, আওরঙ্গজেবের সভায় দাঁড়িয়ে কথা বললেন শিবাজী। একেবারে সিনেমার মতন স্পষ্ট।

এসব কথা অন্য কারুকে বললে তারা বিশ্বাস করে না। ইস্কুলের বন্ধুদের দু' একবার বলতে গেছে, তারা অমনি বলছে, যা, যা, খুব গাঁজা দিচ্ছিস।

অনেকগুলো ঘটনা মিলেও যায়। সোনারপুর থেকে ছোটমামা এসে সুজয়ের মাকে বলেছিলেন। জানো মেজদি, পরশুদিন কী কাণ্ড। কোথা থেকে একটা শেয়াল এসে আমাদের গোয়াল ঘরটায় ঢুকে পড়ে....।

সুজয় উত্তেজিত ভাবে বসেছিল, জানি, আমি জানি, দুটো গরু ভয় পেয়ে খুব ডাকছিল...।

ছোটমামা ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন, তুই জানিস, মানে? পরশু রাত্তিরের ব্যাপার, এর মধ্যে তো কেউ আসে নি সোনারপুর থেকে।

সুজয় তবু বলেছিল, হ্যাঁ, আমি জানি, তোমরা সবাই মিলে তাড়া করলে....শেয়ালটা দৌড়ে পালাবার সময় একজন কে যেন লাঠি ছুঁড়ে মারলো, কিন্তু-ওর গায়ে লাগে নি...।

ছোটমামা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, মেজদি তোমার ছেলেটা কিন্তু খুব গল্প বলতে পারে। আমি যেই শেয়ালের কথা বলছি...।

বিশ্বাস করে না, কেউ বিশ্বাস করে না। গল্প নয় সুজয় যে ঐ দৃশ্যটা সত্যিই দেখেছিল পরশুদিন, তা কারুকে বিশ্বাস করানো যাবে না।

তা হলে, অন্ধকার বাগানে টর্চ হাতে লোকটি যে একটা গোলাপ ফুলের গাছের সামনে বসলো, সে দৃশ্যটাও সত্যি?

ওরকম গোলাপ বাগান কোথায় আছে? কলকাতায় কি থাকতে পারে? তা পারে নিশ্চয়ই, কিন্তু আজ কলকাতায় বৃষ্টি পড়বে, ওখানে বৃষ্টি নেই...। তা হলে কি দূরে কোন জায়গায়? সোনারপুরে ছোটমামার বাড়িতে কি বাগান আছে? দু'মাস আগে সুজয় যখন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিল, তখন দেখেছিল, ছোটমামাদের বাড়ির সামনে বেগুন গাছের ক্ষেত। এত তাড়াতাড়ি কি সেখানকার বেগুন গাছ তুলে গোলাপ ফুলের গাছ হতে পারে? নাঃ।

নিচে নেমে এসে সুজয় মাকে জিজ্ঞেস করলো, মা, আমাদের চেনাশুনো কারুর বাড়িতে ফুলবাগান আছে? এ্যাত্ত বড় বড় গোলাপ ফুল ফোটে?

মা অবাক হয়ে বললেন, ফুলবাগান? কাদের ফুলবাগান আছে? হঠাৎ এই কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?

সুজয় বললেন, না, এমনি....।

তিনতলার ঘরে সুজয় একলা শোয়। ঘুমোবার আগে সুজয় চোখ বুজে অনেক চেষ্টা করলো সেই দৃশ্যটা আর একবার দেখবার। কিন্তু একবার স্বপ্ন ভেঙে গেলে আর যেমন জোড়া লাগে না, সেইরকম সেই দৃশ্যটাও আর ফিরে এলো না।

সকালবেলা মা সুজয়কে ডাকতে এসে দেখলেন, সুজয়ের ঘুমন্ত মুখে কি রকম যেন একটা অস্বস্তির ভাব। ভুরু দুটো কোঁচকানো, যেন ঘুমিয়ে সে কিছু চিন্তা করছে।

একটু কিছু অন্য রকম দেখলেই মায়েরা প্রথমেই ভাবেন, ছেলের জ্বর হয়েছে কি না।

মা সুজয়ের কপালে হাত রাখলেন। না, জ্বর নেই তো।

—এই সুজয়, ওঠ্।

দু'বার ডাকতেই সুজয় চোখ মেললো।

—হ্যাঁ রে, তুই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কী ভাবছিলি?

—কই, কিছু না তো?

ঘুমের মধ্যে ভুরু কুঁচকেছিলি কেন? কোন বাজে স্বপ্ন দেখছিস বুঝি?

সুজয়ের কিছু মনে নেই। অনেক স্বপ্ন পরদিন সকালে উঠে আর মনে পড়ে না। কিন্তু সুজয় জেগে জেগে চোখ বুজে যে দৃশ্যগুলো দেখে, সেগুলো তার ঠিক মনে থাকে।

সুজয়ের স্কুল সাড়ে দশটায়। বাবা অফিস্ যাবার সময় সুজয়কে স্কুলে নামিয়ে

দিয়ে যান বলে সুজয়কে বাবার সঙ্গে সঙ্গে সাড়ে ন'টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হয়। সেইজন্য সকালের জলখাবার খেয়ে নেওয়ার পর একঘণ্টা পড়তে না পড়তেই তাকে যেতে হয় স্নান করতে।

পুরনো আমলের বাড়ি তো, তাই সুজয়ের ঘরটা বিরাট। এই স্নানের ঘরটা সুজয়ের খুব ভালো লাগে। দরজাটা বন্ধ করলে তখন একা একা, নিরিবিলি লাগে। এখানে অনেক কিছু চিন্তা করা যায়।

অবশ্য বাথরুমে বেশীক্ষণ কাটাবার উপায় নেই সকালে। বাবার অফিসের দেরি হয়ে যাবে। তিনি তাড়া দেবেন।

শাওয়ারটা খুলে দিয়ে সুজয় তার তলায় দাঁড়ালো। শাওয়ারের জল খুব তোড়ে পড়বার সময় আপনা থেকেই চোখ বুজে আসে। চোখ বুজতেই সুজয় আর একটা দৃশ্য দেখতে পেল।

...একটা খুব বড় বাড়ি, দোতালায় টানা বারান্দা। সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে একজন বুড়ো মতন লোক খুব রাগারাগি করলেন। দূরে দুতিনজন লোক কাঁচুমাচু ভাবে দাঁড়িয়ে...বুড়ো লোকটির বুকের লোম পাকা, শুধু একটা ধুতি পরা, বেশ বড় গোঁফ, হেঁড়ে গলায় তিনি চিৎকার করে বললেন, আমার চাবি কোথায়? আমার চাবির গোছা কোথায় গেল? মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে...।

সুজয় চোখ খুলে ফেললো। আর কিছু দেখা গেল না। ঐ বুড়োলোকটি কে? ঐ বাড়িটা কোথায়? সে কিছুই জানে না। তবু সে কেন দেখলো ঐ দৃশ্যটা? কোথায় কার চাবির গোছা হারিয়ে গেছে, তা নিয়ে সুজয়ের মাথা ঘামাবার কি দরকার?

কিন্তু ভুলতে চাইলেও সুজয় ভুলতে পারে না। খেতে বসেও সুজয়ের কানে কানে বাজে সেই বুড়ো লোকটির চিৎকার, আমার চাবির গোছা কোথায় গেল? আমার মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে...।

স্কুল ছুটি হয়ে গেল এক পিরিয়ড পরেই। ডিবেট কমপিটিশানে ক্লাশ টেনের একটি ছেলে ফার্স্ট হয়েছে। বাড়ি চলে এসে সুজয় শুয়ে রইল নিজের ঘরে। এরকম দুপুর বেলা সুজয় কোন দিন শুয়ে থাকে না, বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে যায় কিংবা গল্প করে। বৃষ্টি বাদলা হলেও ঘরে বসে গল্পের বই পড়ে।

কিন্তু সুজয়ের শরীর ভালো লাগছে না। মাথাটা একটু যে ব্যথা ব্যথা করছে। সুজয় শুয়ে রইলো চোখ বুজে। এখন আর যে অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু আজ সকালে দেখা দৃশ্যটা মনে পড়ছে বারবার। কে ওই বুড়ো লোকটা? সুজয় কোন দিন ঐ রকম লোককে দেখে নি, খুব জোর দিয়ে বলতে পারে।

একটু পরেই তার বন্ধু অভিজিৎ এসে হাজির। অভিজিৎ অবশ্য অন্য স্কুলে পড়ে, আশ্চর্য তাদের স্কুলও আজ ছুটি। ওদের স্কুলের একজন টিচার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন।

অভিজিৎ উত্তেজিত ভাবে বললে—এই, দমদম যাবি?

সুজয় বললো, দমদম হঠাৎ? দমদম যাবো কেন?

—দমদমে আমার মামার বাড়ী। আজ ওখানে থাকবো কাল চলে আসবো।

—কাল ইস্কুলে যাবো না?—ধুৎ কাল তো রবিবার।

—রবিবার দুপুরে আমার মাস্টার মশাই আসবেন বলেছেন যে।

—কাল সকাল দশটা এগারোটার মধ্যে ফিরে আসবো। বাবা অফিসের কাজে বহরমপুর যাচ্ছেন। আজ সন্ধ্যাবেলা অফিসের গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন, আমাদের দমদমে নামিয়ে দিয়ে যাবেন। সকালে আমরা ফিরে আসবো বাসে করে। ঐ বাসে করে ফিরে আসার ব্যাপারটা শুনেই সুজয় বেশি উৎসাহ বোধ করছে। অনেকক্ষণ বাসে চাপতে সুজয়ের খুব ভালো লাগে। কত রকম মানুষ দেখা যায়।

মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে আগে।

অভিজিৎকে বসিয়ে রেখে সুজয় গেল মায়ের ঘরে। মা এই সময় উপন্যাস পড়েন। মায়ের পাশে বসে সুজয় খুব নরম ভাবে বললো, মা একটা কথা বলবো?

মা বললেন, পয়সা চাই বুঝি? পরশুদিন তোকে একটা টাকা দিয়েছিলুম না?

—না, মা, পয়সা না। অভিজিৎ এসেছে, ও বলছিল....।

একটু পরেই মা রাজি হয়ে গেলেন। ওরা বেরিয়ে পড়লো বিকেল পাঁচটার মধ্যে। অভিজিৎদের মামার বাড়ি নাগেরবাজার ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে। পৌঁছতে বেজে গেল ছ'টা। তখন সন্ধ্যে নেমেছে।

সুজয়ের বাবা গাড়ি থেকে নামলেন না, গেটের কাছে ওদের ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন গাড়ি ঘুরিয়ে।

মস্ত বড় লোহার গেট, সামনে খানিকটা লন, সামনের দিকে শুরকি বিছানো রাস্তা। গেটটা খুলতেই ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হলো, অমনি দোতলা থেকে কে যেন গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলো, কে?

অভিজিৎ বললো, আমি। —আমি কে?

—আমি অভিজিৎ....খোকন। দাদু, আমি খোকন, বালিগঞ্জ থেকে এসেছি।

—ও খোকন? আয়। কার সঙ্গে এলি? কারুকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, শুধু কথা শোনা যাচ্ছে।

দু'জনে চলে এলো বৈঠকখানায়। খুব বড় বাড়ি, কিন্তু কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা। একজন বয়স্কা মহিলা একতলায় একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, আরে, খোকাবাবু যে। এসো এসো। সঙ্গে এটি কে?

অভিজিৎ বললো, আমার বন্ধু সুজয়। বড় মাসীমা, কেমন আছো তুমি?

অভিজিৎ সেই মাসিমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই সুজয়ও প্রণাম করলো।

যদিও এটা অভিজিতের মামার বাড়ি, কিন্তু মামারা এখানে কেউ নেই। এক মামা

বিলেতে, আর এক মামা দিল্লীতে। এখানে থাকেন অভিজিতের দাদু আর দিদিমা। আর এই মহিলাটি দূর সম্পর্কের মাসী।

—অভিজিৎকে সেই মাসী তাঁর ঘরে নিয়ে বসাতে চাইছিলেন, অভিজিৎ বললো, দাঁড়াও বড় মাসী, আগে দাদুকে প্রণাম করে আসি। মাসীমা বললেন, দেখিস, সাবধান। কর্তার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে আছে।

সুজয়কে নিয়ে অভিজিৎ সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো ওপরে। লম্বা টানা বারান্দায় একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। সেই বারান্দার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন বুড়ো লোক। তাঁকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল সুজয়। তার বুকের মধ্যে ছম্ ছম্ শব্দ হচ্ছে। জীবনে এমন অবাক সে কখনো হয় না।

এই তো সেই লম্বা বড় বারান্দা। আর এই বুড়ো লোকটিকেই তো সে কাল দেখতে পেয়েছিল বাথরুমে চোখ বুজে। ইনিই তো চাবি হারিয়ে গেছে বলে চ্যাঁচাচ্ছিলেন। অভিজিৎ বললো, কী হলো দাঁড়ালি কেন? উনি আমার দাদু।

সুজয় আর অভিজিৎ গিয়ে প্রণাম করলো তাঁকে। অভিজিৎ বললো, দাদু, এ আমার বন্ধু সুজয়।

দাদু বললেন, তোর মা কেমন আছে? সে এলো না কেন? আজ আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে রে! আমার চাবির গোছা হারিয়ে গেছে, সিন্দুকের চাবি, ট্রাঙ্কের চাবি, ব্যাঙ্কের লকারের চাবি, সব একসঙ্গে ছিল।

সুজয়ের বুকের মধ্যে টিপ টিপ করছে এখনো। সে জানতো, ঠিক মিলে যাবে, চাবির কথা মিলে যাবেই। অভিজিতের দাদুর বুকের সব চুল পাকা।

অভিজিৎ বললো, কখন হারালো দাদু?

এই তো, সকালবেলা। কী কাণ্ড দ্যাখ্ না। নিশ্চয়ই কেউ বদ মতলবে লুকিয়ে রেখেছে। আমি বাড়ি ছেড়ে দু'দিন কোথাও যাই নি, চাবি কি করে হারাবে?

পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন অভিজিতের দিদিমা। তিনি বললেন, খোকন এসেছিস! দ্যাখ না কী কাণ্ড! চাবি হারিয়ে ফেলে তোর দাদুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

দাদু বললো, হবে না? কেউ যদি ঐ চাবি নিয়ে সিন্দুক খোলে? সারাদিন ধরে আমি পাহারা দিচ্ছি, ঘর থেকে একেবারে বেরুই না। কিন্তু এরকম ভাবে ক'দিন যাবে?

অভিজিৎ জিজ্ঞেস করলো, নতুন চাবি করানো যায় না?

দাদু বললেন, কতকাল আগেকার চাবি, ও কি এখন পাওয়া যায়? ব্যাঙ্কে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি, কিন্তু সিন্দুকের মধ্যে অনেক দামী জিনিসপত্র রয়েছে....।

দিদিমা বললেন, ওরা ছেলেমানুষ, ওরা আর কী করে তার। আয় তোরা ঘরে আয়। এই ছেলেটি কে? তোমার নাম কী?

সুজয় কথা বলতে গেল, কিন্তু তার গলা দিয়ে যেন আওয়াজই রেরুচ্ছে না। অতিকষ্টে সে নিজের নামটা বলল।

দিদিমা ডাকলেন, রজত, রজত!

কুড়ি-বাইশ বছর বয়সের একটি ফিটফাট চেহারার ছেলে এলো সেই ডাক শুনে।

দিদিমা বললেন, রজত, এদের জন্য মিষ্টি এনে দাও। ঠাকুরকে বলো মাংস রাঁধতে। ওরা আজ রাত্রে এখানে খাবে।

ছেলেটি চলে গেলে অভিজিৎ জিজ্ঞেস করলো, দিদিমা, ও কে? ওকে তো আগে দেখি নি?

দিদিমা বললেন, সেই যে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ওকে এনেছি। ও সম্পর্কে আমার এক কাকার ছেলে। লেখাপড়া বেশী শেখেনি, ও সবে একটা হোটেলে কাজ করছিল। তাই ওকে নিয়ে এসেছি। আমাদের বাড়িতে থাকবে।

মিষ্টি আর জলটল খাবার পর সুজয়কে নিয়ে অভিজিৎ গেল ছাদে। মস্ত বড় ছাদ। বাড়ির চারপাশটা ফাঁকা। আকাশে একটু একটু জ্যোৎস্না। নারকেল গাছের পাতায় হাওয়ার সর সর শব্দ হচ্ছে।—কী রে তুই কোনো কথা বলছিস না কেন?

—কী বলবো?

—একেবারে গুম মেরে আছিস যে? তোর ভালো লাগছে না?

—হ্যাঁ।

সুজয় তখনও ভাবছে, সে যে আজ এখানে আসবে, তার তো কোন ঠিক ছিল না আগে থেকে। তবু সে এই বাড়িতে তার বন্ধুর দাদুর চাবি হারানোর দৃশ্যটা দেখলো কেন আগে থেকে? দেখেই বা কী লাভ হলো?

অভিজিৎ বললো, এই বাড়ির পেছন দিকটায় একটা বেশ বড় বাগান আছে। দেখতে যাবি?

সুজয় চমকে উঠে বললো, বাগান?

—হ্যাঁ। খুব চমৎকার বাগান। দাদুর খুব ফুলগাছের সখ। যাবি?

—এক্ষুনি।

অভিজিৎ একটা টর্চ চেয়ে নিল দিদিমার কাছ থেকে। সুজয়ের আর ধৈর্য থাকছে না, সে এক্ষুনি ছুটে গিয়ে বাগানটা দেখতে চায়।

ঠিক সেই বাগানটাই কিনা তা বুঝতে পারলে না সুজয়। তারই অন্ধকারের মধ্যে সুজয় শুধু টর্চের আলোয় কয়েকটা গাছ দেখেছিল। সেটা যে-কোন বাগান হতে পারে। তাছাড়া, সেই বাগানে ছুরি হাতে একটা লোকের সঙ্গে অভিজিৎ-এর দাদুর সিন্দুকের চাবি হারাবার সম্পর্ক কি?

অভিজিৎ-এর হাত থেকে টর্চটা নিয়ে সুজয় প্রত্যেকটা ফুল গাছের ওপর আলো

ফেলতে লাগলো। বেশিক্ষণ খুঁজতে হলো না। সুজয় দেখতে পেল, একটা গোলাপ গাছে ফুটে আছে তিনটে গোলাপ ফুল।

সাদা গোলাপ। কোন সন্দেহ নেই, কাল এই গোলাপ গাছটাকেই দেখেছিল সুজয়।

অভিজিৎ-এর হাতে টর্চটা দিয়ে সে বললো, তুই একটু এগো, আমি জুতোর ফিতেটা বেঁধে নিচ্ছি।

অভিজিৎ বললো, সামনেই একটা সুন্দর বেঞ্চ আছে, চল, এখানে বসে বেঁধে নিবি।

—তুই বেঞ্চে গিয়ে বোস, আমি আসছি।

অভিজিৎ এক পা এগোতেই সুজয় বসে পড়লো গোলাপ গাছটার পাশে।

গোলাপ গাছ ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই সেটা সব শুদ্ধ উঠে এলো মাটি থেকে।

সুজয় কখনো গাছের একটা পাতা পর্যন্ত ছেঁড়ে না। গাছকে কষ্ট দিতে তারও কষ্ট হয়। কিন্তু এই গোলাপ গাছটার শেকড় কাটা।

গাছটা তুলে ফেলে তার শেকড়ের কাছটার গর্তে হাত ঢোকালো সুজয়। সে যা ভেবেছিল তাই। সেখানে রয়েছে সুজয়ের দাদুর চাবির গোছা।

সঙ্গে সঙ্গে পেছনে একটা পায়ের শব্দ পেয়েই সুজয় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালে। সে দেখতে পেল একটা সাদা কেড্‌স জুতো। তারপর খাকি প্যান্ট। এই সেই রজত।

রজত সুজয়কে মারবার জন্য একটা হাত তুলেছিল, তার আগেই সুজয় চেঁচিয়ে উঠলো, অভিজিৎ, অভিজিৎ! আমি চাবি খুঁজে পেয়েছি। রজত থমকে দাঁড়ালো। তারপরেই পেছন ফিরে লাগালো দৌড়। এরপর রজতকে আর দেখতেই পাওয়া যায় নি।

অভিজিৎ কাছে এসে বললো, চাবি? দেখি, দেখি! সত্যিই তো! তুই কী করে পেলি?

সুজয় বললো, এমনি, আমার পায়ে হোঁচট লাগলো। আমি দেখলাম, একটা চাবির গোছা—।

তারপর সুজয় মন দিয়ে সেই গোলাপ গাছটাকে আবার পুঁতে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। সত্যি কথা তো বলে লাভ নেই, কেউ বিশ্বাস করবে না।

চিতা রহস্য

ইমদাদুল হক্ মিলন

আমাদের তিনজনেরই ঘুম ভাঙে খুব সকাল সকাল। তখন ছ'টার বেশি হবে না। এ বাড়ির লোকজনের ঘুম অবশ্য আরো আগে ভাঙে। নানী তো সেই ভোর রাতেই উঠে বসে থাকে। ঝি-চাকররা কাজ শুরু করে দেয় রাত থাকতে। ঘুম ভাঙতেই আমি শুনতে পাই ঢেঁকি ঘরে ধান ভানার শব্দ। শব্দটা বড় ভাল লাগে।

আমাকে এত সকালে উঠতে দেখে নানী তো অবাক। হেসে বলল, দাদু যে আজ খুব সকাল সকাল উঠেছো।

আমি বলতে চাই, নানী, আমরা আজ বিলের বাড়ি যাবো। কথাটা প্রায় ঠোঁটে এসে গিয়েছিল। কায়দা করে চেপে যাই। নানীকে বললে আর রক্ষে নেই। যাওয়াই বন্ধ। জন্তুটা যদি আমাকে কামড়ে বসে!

একথাটা ভেবে আমারও একটু ভয় হয়। কাল তো হুজুগে বললাম। সত্যি যদি ওটা বাঘ হয়! আমি আর বারেক তো খুব ছোট। ডালুদাই যা একটা বড় মানুষ। আমাদের কাউকে যদি জন্তুটা আক্রমণ করে বসে! ইস্, একটা রিভলবার কিংবা বন্দুক যদি থাকতো।

কিন্তু এখন আর কথা ফেরানো যায় না। ডালুদা তাহলে আমাকে খুব ভীতু ভাববে। যা হয় হবে। যাবোই! ভয় পেলে কি আর গোয়েন্দা হওয়া যায়!...

নাস্তা-টাস্তা খেয়ে বেরুতে আটটা বেজে যায়। গ্রামদেশে আটটা বাজলে অনেক বেলা মনে হয়। চারদিক খোলা বলে রোদের তেজও বেশি। মনে হয় দশটা-এগারোটা বেজে গেছে।

নানী বলল, তোরা যাচ্ছিস কোথায়?

আমি কিছু বলার আগেই ডালুদা চালাকি করে বলল, বাজারের দিকটা ঘুরে আসি। খোকন তো কখনো পদ্মা নদী দেখেনি। মাওয়ার বাজারে গেলেই তো নদী দেখা যাবে।

নানী বলল, সাবধানে যাস। তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস।

আমরা সবাই একত্রে মাথা নাড়ি, আচ্ছা।

পথে বেরুতেই ডালুদা কোমরের কাছ থেকে গরু জবাই করার একটা ছুরি বের করলো। দেখে তো আমি থ। এত বড় ছুরি কোমরে গুঁজে আনলে কেমন করে?

শুনে ডালুদা হাসে। অনেক কায়দা করে আনতে হয়েছে। নানী দেখলে বুঝে যেতো আমরা বদ মতলবে যাচ্ছি কোথাও।

কিন্তু তুমি ছুরিটা পেলে কোথায়?

নানীর আলমারিতে ছিল। কাল রাতেই সরিয়ে রেখেছিলাম।

তারপর একটু হেসে বলে, খালি হাতে ওরকম জঙ্গল বাড়িতে কি যাওয়া যায়।

এতক্ষণে আমি বেশ একটা সাহস পাই। যাক। জিমি আছে, ডালুদার হাতে ছুরি আছে, ভয় কি!

বারেক আর জিমি হাঁটছিল আমাদের পিছু পিছু। রোদ খুব চড়া বলে সবাই একটু আধটু ঘামছিলাম। আমি পকেট থেকে ছোট্ট রুমাল বের করে মুখ-টুখ মুছে নিই। সেই ফাঁকে অন্য পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিই আমার পেন্সিল টর্চ আর ছোট্ট ছুরিটা ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ ঠিকঠাকই আছে সব। আমি খুশিতে একটা শ্বাস ফেলি।

ধানী বিলের মাঝ দিয়ে সরু আলপথ সোজা চলে গেছে বাড়িটার দিকে। পথটা এত সরু যে পাশাপাশি দু'জন হাঁটা যায় না। প্রথম ডালুদা, তারপর আমি। আমার পিছে জিমি তারপর বারেক।

বিলে অনেক লোকজন কাজ করছিল। সবাই চাষী। আমাদের দেখে ক্ষেতের কাজ ফেলে অবাক হয়ে তাকায়। তাকাবে না কেন? আমাদের সাজগোজ দেখেই বুঝা যায় আমরা শহুরে। ডালুদা ফুলপ্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট পরা। আমি আর বারেক হাফ প্যান্ট আমার গায়ে শার্ট নেই। হাফহাতা নাইলনের গেঞ্জির মধ্যে মুহম্মদ আলীর মুখ। তার ওপর সঙ্গে একটা সাহেবী কুত্তা।

লোকজনকে ওভাবে তাকাতে দেখে জিমি একটু বিরক্ত হয়। একটা লোক ছিল

খুব কাছাকাছি। জিমি তার উদ্দেশ্যে পেল্লায় এক ঘেউ দিয়ে বসে। লোকটা পড়িমরি করে দৌড়। তাই দেখে আমরা তিনজন হেসে বাঁচিনে।

বিলের বাড়ির কাছাকাছি আসতে দেখি দূর থেকে যে গাছটা আমরা দেখতে পেয়েছিলাম সেটা একটা দেবদারু গাছ। বিরাট উঁচু। বিশেষ ঝাপড়ানো নয়। পাতাগুলো গাঢ় সবুজ বলে দূর থেকে কালো দেখায়।

আমরা যে সরু রাস্তাটা দিয়ে আসছিলাম সেটা আসলে বিলের বাড়ির রাস্তাই। কাছাকাছি এসে বুঝতে পারি রাস্তাটা বেঁকেচুরে বিলের বাড়ির ভেতর ঢুকে গেছে।

আমরা তিনজন আস্তে-ধীরে বাড়ির ভেতরে ঢুকি। ঢোকার আগে আমি ফেলুদার মতো সাবধানী চোখে চারদিকটা দেখে নিই। বিরাট বড় বাড়ি। দেবদারু গাছটা ঠিক মাঝামাঝি। একপাশে ঘন বাঁশঝাড়। তারপর ভাঙা দরদালান। আর চারদিকে ছোটবড় অসংখ্য ঝোপঝাড়। একটা ঝোপে সাদা সাদা কি ফুল, আমি চিনি না, ফুটে আছে। দেখে বারেক কতোগুলি ছিঁড়ে নিয়ে প্যান্টের পকেটে ভরে।

ডালুদা হাঁটছিল সবার আগে। হাতের লম্বা ছুরিটা দিয়ে ঝোপঝাড়ে মৃদু শব্দ করছিল। সেই শব্দে একটা ঝোপ থেকে দুটো টুনটুনি পাখি ফুড়ুৎ করে উড়ে পালায়। দেখে আমি বলি, তুমি অমন করছো কেন ডালুদা?

ডালুদা বলল, সাপটাপ থাকলে শব্দে পালিয়ে যাবে।

এসময় সাপ থাকবে নাকি?

বলিস কি! এসময়ই তো সাপ বাইরে থাকে। ঝোপঝাড়ের আড়ালে ঠাণ্ডায় শুয়ে থাকে।

শুনে আমার একটু ভয় করে। পকেট থেকে পেনসিল টর্চটা বার করে হাতে নিই। ঝোপঝাড়ের ভেতরকার অন্ধকারে ফোকাস ফেলে দেখে নিই।

ডালুদা বলল, চল প্রথমে একটু রেস্ট নিই। তারপর সব ঘুরে ঘুরে দেখবো।

আমিও খুব ক্লান্তি বোধ করছিলাম। বললাম, চলো।

দেবদারু গাছটার নিচে বেশ অনেকটা জায়গা খোলা মতন। ঝোপজঙ্গল নেই। ঘাস। মাথার ওপর দেবদারু গাছ থাকায় তলায় সুন্দর ছায়া। একটু বাতাসও আছে।

আমরা গাছতলায় গিয়ে বসি।

গাছতলা থেকে পুরো বাড়িটা স্পষ্ট দেখা যায়। কোথায় কি আছে মুহূর্তে স্পষ্ট হয়। ভাঙা দরদালান আর ঝোপঝাড় চারদিকেই। কিন্তু আমার চোখ দুটো ঘুরে-ফিরে কেবল বাঁশঝাড়টার ওদিকেই চলে যায়। ঘন বাঁশঝাড়ের আড়ালেও আছে দরদালানের চিহ্ন। ওদিকটা বড় অন্ধকার। অন্ধকারেই তো সব রহস্য লুকানো থাকে।

আমি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বাঁশঝাড়টা দেখি। ওপাশের ভাঙা দরদালান দেখি।

হঠাৎ বারেক চেঁচিয়ে ওঠে, সাপ সাপ।

মুহূর্তে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠি আমি আর ডালুদা। জিমি ছিল ঝোপের আড়ালে। দৌড়ে আসে। কিন্তু জিমির দিকে আমাদের চোখ নেই। আমাদের চোখ বারেকের দিকে। বারেক বসে ছিল আমাদের থেকে একটু দূরে। ওর ঠিক পায়ের কাছে ফণা তুলে আছে বিরাট একটা সাপ। স্থির হয়ে আছে। কালো সুতোর মতো জিভটা লকলকিয়ে বেরিয়ে আসছে বারবার। হুবহু সিনেমায় দেখা দৃশ্যের মতন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়েই থাকি। কি করবো বুঝতে পারি না। হাত-পা একটু একটু কাঁপছে আমার। এখন কি হবে? বারেককে যদি কামড়ায় সাপটা!

ডালুদা আমাকে বলল, তুই সরে যা খোকন। বারেককে বলল, তুই নড়বিনে বারেক। তারপর সে অদ্ভুত একটা কাজ করলো। চোখের পলকে ছুটে গিয়ে সাপটার পেট বরাবর কোপ বসিয়ে দিলো। দু'ভাগ। দু'ভাগ হলে কি হবে! সাপটা তখনো ফুঁসছে। ডালুদার পায়ে হকি সু ছিল। তাই দিয়ে আচ্ছাসে ফণাটা মাড়িয়ে দিলো। শেষ। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। বারেকও হেসে বলে, আমি কিন্তু ডরাই নাই মামা।

শুনে ডালুদা হাসে। খেয়েছিল তোকে আজ। জিমি তখন মহা উল্লাসে কাটা সাপটার চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছিলো। দেখে আমি জিমিকে ডাকি। কাম অন জিমি।

জিমি আমার পায়ের কাছে দৌড়ে আসে।

ছুরিটায় রক্ত লেগেছিল। ঘাসে মুছতে-মুছতে ডালুদা বলল, কোন দিকটা আগে দেখবি?

আমি বললাম, চলো বাঁশঝাড়টার ওদিকে যাই।

চল।

আমরা হাঁটতে শুরু করি। আমার বুকের ভেতর এখন অদ্ভুত একটা অনুভূতি। সাপটা দেখার পর থেকে এ রকম হচ্ছে। সাপটা মারা পড়াতে এখন অকারণেই মনে হচ্ছে সেই জন্তুটাও আমরা মারতে পারবো। খুব একটা সাহস পাচ্ছি।

বাঁশঝাড়টার কাছাকাছি যেতে কিছু ছড়ানো-ছিটানো পালক পড়ে আছে দেখতে পাই। সারাটা বাঁশঝাড় জুড়েই পালক। হাওয়ায় হালকা তুলোর মতো উড়ছে। এক জায়গায় একটা কবুতরের কঙ্কাল। নীল পালক দেখে বোঝা যায় জালালী।

ডালুদা বলল, দেখছিস শেয়াল পায়রা ধরে খেয়েছে।

আমি কথা বলি না। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। নানাবাড়ির গোলাঘরেও ঠিক এই রকম জালালীর কঙ্কাল দেখেছি গতকাল। দুটো ব্যাপারের মধ্যে অদ্ভুত মিল।

বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে আমরা হাঁটতে শুরু করি। ছোটবড় অসংখ্য বাঁশের কঞ্চিতে দুর্ভেদ্য হয়ে আছে জায়গাটা। মাথা নিচু করে গা বাঁচিয়ে চলতে হয়। গায়ে খোঁচা লাগে। তবুও ও চলার ভেতর ভীষণ এক উত্তেজনা। গায়ের খোঁচা গ্রাহ্য করি না।

হঠাৎ মাথার কাছে ডানা ঝাপটানোর শব্দে আমরা তিনজনেই থেমে পড়ি।

ওপরে তাকিয়ে দেখি অসংখ্য বাদুড় ঝুলে আছে। বাদুড়রা দিনের বেলা চোখে দেখে না। তবুও ডানা ঝাপটাচ্ছে। শব্দ-টব্দ পেয়ে আঁচ করেছে রাজ্যে শত্রু ঢুকেছে। কথাটা ভেবে আমার হাসি পায়।

বাঁশঝাড় পেরিয়ে ভাঙা দরদালানটার কাছে এসে দেখি আরো দু'-তিনটে পাখির কঙ্কাল। ঘুঘু আর জালালীর। এবার খুব একটা অবাক লাগে না। আমি যেন জানতামই একটা দৃশ্য এখানটায় থাকবে। তবুও খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখি। চিন্তা হয়, এটা কি সত্যি-সত্যি শেয়ালের কাজ? তারপর ভাঙা দালানটা দেখি। এক কাঁড়ি ভাঙা-চুরো ইট ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। বাতাসে সোঁদা গন্ধ। গন্ধটা যে পুরনো চুন-সুরকির বুঝতে আমার কষ্ট হয় না। শহুরে ছেলেরা এসব বোঝে।

ইঁটের পাঁজার ভেতর সরু একটা খোঁদল। অনেকটা গভীর। ভেতরে চোখ চলে না। নিরেট অন্ধকার। অন্ধকার দেখলেই আমার মনে হয় কোনও রহস্য আছে। আমি খোঁদলটার কাছাকাছি গিয়ে টর্চ মারতে যাবো, তখন জিমি হঠাৎ করে পেল্লায় একটা ঘেউ দিয়ে ওঠে। এত জোরে যে আমি চমকে যাই। এবং চমক কাটতে-না-কাটতেই দেখি কি একটা জন্তু খোঁদলটা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে মুহূর্তে ওপাশের জঙ্গলের দিকে মিলিয়ে গেলো। জিমিও ঘেউ দিতে-দিতে ছুটলো তার পিছু পিছু। জন্তুটা আমি মাত্র এক পলক দেখি। তাতেই বুঝি ওটার গায়ে হলুদ ডোরা কাটা।

ডালুদা আর বারেকও দেখেছে দৃশ্যটা। সবাই থ। আমরা যা খুঁজছিলাম তা যে এত কাছে কে জানতো।

মিনিট দুয়েক পর ওপাশের জঙ্গলে জিমির ঘেউ-ঘেউ শোনা যায়। এটা জিমির কান্নার শব্দ। বুঝতে আমার কষ্ট হয় না। বারেক চেঁচিয়ে বলে, মামা, জিমিরে বুঁঝি মাইরা ফালাইলো।

আমি কোনও কথা বলি না। হঠাৎ ওপাশের জঙ্গলটার দিকে ছুটতে শুরু করি। আমার পিছু পিছু ডালুদা, বারেক।

ঝোপটার কাছে আসতেই দেখি জিমি ফিরে আসছে। শিশুর মতন টালমাটাল পা জিমির । গলার কাছে রক্তের দাগ। আমি ছুটে গিয়ে জিমিকে জড়িয়ে ধরি।

জিমিকেও গলার কাছে কামড়েছে জন্তুটা। কামড়ে একেবারে ছিঁড়ে ফেলেছে। ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত ঝরছে ক্ষত থেকে। হায় আল্লা, জিমিও যদি ঐ রাখাল ছেলেটার মতো মারা যায়।

ভাবতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এখন জিমিকে কেমন করে বাঁচাবো আমি? রাগে দুঃখে কান্না পেতে থাকে আমার। নিজেকে নিজে গালাগাল করি, কি দরকার ছিল তোমার ফেলুদা হতে!

তিনজনে জিমিকে নিয়ে বহু কষ্টে বাড়ি ফিরতে হয়। ফিরতে-ফিরতে দুপুর গড়িয়ে যায়।

দুই

রাতের বেলা আমাদের কারোই ভাল ঘুম হয়নি। শুয়েছিও বেশ অনেকটা রাত করে। জিমির বড় কাহিল অবস্থা। ক্ষত জায়গায় ডালুদা কি কি সব গাছপালার রস লাগিয়ে দিয়েছে। তবুও জিমি খুব ঝিমিয়ে পড়েছে। কাল থেকে কিছু খায়নি। বাড়ি ফিরে উঠোনের একটা ছায়াময় জায়গায় নিঝুম হয়ে পড়ে থেকেছে। মাঝেমধ্যে যন্ত্রণায় কুঁই কুঁই শব্দ করেছে। বিকেলে চুপি-চুপি নানাবাড়ির বুড়ো চাকরকে বাজারে পাঠিয়ে বারোটা কোডোপাইরিন ট্যাবলেট আনিয়েছি। সন্ধ্যের মুখে গরম জলে গুলে চারটে খাইয়ে দিয়েছি। এতসব কাণ্ড ঘটেছে, কিন্তু নানীকে জানতে দিইনি কিচ্ছু। বারেককে খুব সাবধান করে দিয়েছি যেন নানীকে কিচ্ছু না বলে দেয়।

কিন্তু জিমির অবস্থা নানীর চোখে পড়েছে। আমরা ফিরতেই জিজ্ঞেস করেছিল, কিরে, কুকুরটার হয়েছে কি?

ডালুদা বানিয়ে বলল ঃ বাজারের নেড়ি কুত্তাগুলো সব একসাথে জিমিকে আক্রমণ করেছিল। জিমি পেরে ওঠেনি।

শুনে আমি হাঁফ ছাড়ি। যাক, ডালুদা আমাকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু জিমির জন্যে আমার চিন্তটা কমে না। জিমির যদি কিছু হয়ে যায়! তাহলে ঢাকা ফিরে আমি কি বলবো।

কাল বিকেলে আমরা আজকের প্রোগ্রামটা ঠিক করে রেখেছিলাম। সন্ধ্যের পর গোলাঘরে ঢুকে ছোট্ট পেন্সিল টর্চ জ্বালিয়ে ডালুদা আর আমি তিনটে পায়রা ধরেছি। পায়রাগুলো রাতেরবেলা চোখে দেখে না। ধরা খুব সোজা। আমি নিচে থেকে টর্চ মারি আর ডালুদা অবলীলায় একটা গোলার ওপর চড়ে টপাটপ ধরে ফেলে। সারারাত পলোতে আটকে রেখেছিলাম পায়রা তিনটে।

সকালবেলা উঠে প্রথমে আমরা জিমিকে ট্যাবলেট গুলে খাওয়াই তারপর কাঁচি দিয়ে পায়রা তিনটের পাখার সব পালক কেটে দিই যাতে বাছাধনদের উড়াল দেবার শক্তি না থাকে। তারপর আটটার দিকে বারেককে জিমির তদারকিতে রেখে আমি আর ডালুদা পায়রা তিনটে হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

নানী জিজ্ঞেস করে, তোরা কোথায় যাচ্ছিস?

ডালুদা এবারও একটা গুল ছাড়লো। পূব পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে পিকনিক করবো।

নানী হাসে, পায়রা দিয়ে কি হবে?

পায়য়ার মাংস নাকি খুব ভাল।

কি যে বলিস তোরা!

তারপর একটু থেমে বলে, যেখানেই যাস সাবধানে চলাফেরা করিস। খোকনকে দেখে-শুনে রাখিস। জন্তুটা যে কখন আবার কি ঘটাবে।

ডালুদা বলল, জন্তুটার মজা কি জানো, কখনো বেশি লোকজনের সামনে আসে না, বেশি বয়সের লোকজনের সামনে আসে না। শুধু বাচ্চা ছেলেদের একা পেলে—

তবুও সাবধানের মার নেই।

আমরা আর কোনও কথা না হলে বেরিয়ে পড়ি।

আমার কাঁধে আজ একটা কাপড়ের ব্যাগ। তাতে আমার গোয়েন্দাগিরির সব জিনিসপত্র। ডালুদা গরু জবাই করার ছুরিটাও সঙ্গে নিয়েছে। আজ আমরা রেডি হয়েই বেরিয়েছি, জন্তুটার দেখা যখন পেয়েছি ওকে না মারা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। আজ একটা কিছু ঘটাবোই।

কাল বাড়ি ফিরেই আমি আর ডালুদা প্ল্যানটা করে ফেলি। জন্তুটার পায়রা জাতীয় পাখির প্রতি খুব লোভ। পায়রা দিয়েই ঘায়েল করতে হবে ব্যাটাকে। তাছাড়া ওর আস্তানাটাও তো খুঁজে পেয়েছি আমরা। ভাঙা দরদালানের খোঁদলের ভেতর থাকে।

বিলের বাড়ি এসে আজ আর কালকের মতন ভয় করে না। আজ ডালুদা আর আমি দু'জনেই মরিয়া হয়ে গেছি। ব্যাটা জিমিকে কামড়িয়েছে, জান যাক আর থাক, ওকে আমরা ছাড়ছি না!

বিলের বাড়ি ঢুকেই, ডালুদা হাতে ছুরিটা নিয়েছে। বলল সামনে পেলে আজ এটা দিয়ে জবাই করবো।

আমি কথা বলি না। আমরা দু'জনেই জানি জন্তুটা খুব ছোট সাইজের। ছুরিটুরি দেখলে ভয়ে পালাবে। কিন্তু আমাদের আসল প্ল্যানটা অন্য রকম।

পা টিপে-টিপে, চারদিকে সাবধানী চোখ রেখে আমরা বাঁশঝাড় পেরিয়ে ভাঙা দরদালানটার সামনে আসি। ডালুদা চালাকি করে দু'-তিনটে আধলা ইট ছুঁড়ে মারে গর্তটার দিকে। জন্তুটা থাকলে নিশ্চয় ছুটে পালাবে। কিন্তু তার কোনও সাড়া-শব্দ পাই না। তখন সাহস পাই। আমার ভেতর যে ভয়টা ছিল সেটা কেটে যায়।

আমি ঝোলা খুলে জিনিসপত্রগুলো সব বের করি। ডালুদা মুহূর্তে তিনটে পায়রার পায়ে লম্বা সুতলি বেঁধে গর্তটার কাছে ছেড়ে দেয়। সুতলির মাথাগুলো একটা হেলানো বাঁশের সঙ্গে বাঁধে। পায়রাগুলোর ডানার পালক কাটা। উড়তে পারে না বেচারারা। ছেড়ে দিলে পর খোঁদলটার মুখের সামনে জবুথবু বসে থাকে। দেখে আমার একটু মায়া হয়।

আমার কাজও ততক্ষণে শেষ। নাইলন কর্ড দিয়ে একটা ফাঁস তৈরি করেছি। ডালুদা বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে সরু বাঁশের সাত-আটটা ডগা কেটে কায়দা করে খোঁদলটার চারপাশে পুঁতে দেয়। আমি ফাঁসটা খুব সাবধানে খোঁদলটার মুখে বসাই।

পোঁতা বাঁশ ডগাগুলোর সঙ্গে চারপাশ থেকে ফাঁসটা এমন করে জড়ানো যে এর ভেতর দিয়ে যদি ছোট্ট একটা বেড়াল-ছানাও গলে যায় তাহলেও ফাঁসে না আটকে উপায় নেই।

কাজটা শেষ করে আমার খুব ভাল লাগে। জালালীগুলো একেবারে খোঁদলটার মুখে। জন্তুটা যদি জালালী দেখেই লাফিয়ে পড়ে তাহলে আর রক্ষে নেই। বাঁশের খোঁটাগুলো শক্ত করে পোঁতা। খুব বড় জন্তু হলেও সহজে নিজেকে ছাড়াতে পারবে না।

ডালুদা আর আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটা দেখি। দেখে আমার নিজের খুব ভাল লাগে। এই প্রথম ফেলুদার মতো একটা কাজ করলাম।

ডালুদা বলল, খোকন, সত্যি সত্যি তোর বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়।

আমি কথা বলি না। মৃদু হাসি।

বাড়ি ফিরতেই বারেক আমাকে দেখে কেঁদে ফেললো। মামা, জিমি মইরা গেছে।

বলিস কি? আমি পাগলের মতো ছুটে বাড়ির ভেতর ঢুকি। ডালুদাও। উঠোনের সেই ছায়াময় জায়গাটায় দেখি বাড়ির সব ঝি-চাকর জটলা করে দাঁড়িয়ে। নানীও আছে। আমাকে দেখে নানী দুঃখ করে বলল, আহা, কুকুরটা তোর মরেই গেলো খোকন। পোষা জীব নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতে নেই।

এসব কথার কিছুই আমার কানে ঢোকে না। ঝি-চাকরদের জটলা ঠেলে আমি জিমির কাছে আসি। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে জিমি। হাত-পা সব টান-টান শক্ত। মুখের কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে খানিকটা লালা। আমি জিমির মাথাটা কোলে জড়িয়ে ধরি। তারপর হু হু করে কেঁদে ফেলি। নানী আর ডালুদা মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে। আমাকে জিমির কাছ থেকে সরিয়ে আনে। তখনো আমি কাঁদছি।

বিকেলের দিকে নানাবাড়ির আমবাগানে বিরাট একটা গর্ত খুঁড়ে জিমিকে কবর দি আমরা। যখন কবর দেওয়া শেষ হয়েছে তখন প্রায় সন্ধ্যা। আমবাগানের গাছপালায় অন্ধকার জমে উঠেছে। আমরা সবাই বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে আছি কবরের পাশে। ডালুদা আর নানাবাড়ির বুড়ো চাকর দু'জনেই করেছে সব। আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব দেখেছি মাত্র। আমার কেবল কান্না পাচ্ছিলো বারবার।

বারেক একটা বেলিফুলের চারা এনে পুঁতে দিয়েছে জিমির কবরের ওপর। এখন একঘটি জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। বেলির চারাটা বেঁচে যাবে। একদিন বেলির ঝাড় হবে এখানটায়। থোকা-থোকা ফুলে ভরে যাবে জিমির কবর। জিমি কি এসব দেখতে পাবে?

কথাটা ভেবে আমার আবার কান্না পায়। যতবার নানাবাড়ি বেড়াতে আসবো ততবারই এই বেলিঝোপটার দিকে তাকিয়ে জিমির কথা মনে পড়বে। কিন্তু জীবনে আর কখনো জিমির সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

তিন

আমার আর ডালুদার একসঙ্গে চোখে পড়ে দৃশ্যটা। বড়সড় একটা বেড়াল সাইজের জন্তু ফাঁসে ঝুলছে। জিভটা দূর থেকেও চোখে পড়ে। আমার হাতের এক বিঘত হবে, বেরিয়ে আছে। দেখেই ডালুদা হুররে বলে চেঁচিয়ে ওঠে। আমাকে প্রায় মাথায় ওপর তুলে ধেই-ধেই করে খানিকটা নাচে। সাবাস খোকন মিয়া, সাবাস!

বারেকও খুশিতে বাঁচে না। সে প্রথম বুঝতে পারে না কাণ্ডটা ঘটেছে। পরে জন্তুটা দেখতে পেয়ে সে-ই প্রথম ছুটে যায়। এই ব্যাটাই জিমিরে মারছিল।

কাছাকাছি এসে আমরা সবাই অবাক। জন্তুটা আসলে বাঘ। এক্কেবারে ছোট্ট বাঘ। একটা বড়সড় বেড়ালের মতো। নাইলন কর্ডের ফাঁসটায় দারুণ ফাঁসা ফেঁসেছে। বাঁশের খোঁটাগুলোর একটা উঠে গেছে। তবুও ব্যাটা মারা পড়েছে!

বাঘটার কাছাকাছি গিয়ে আমার ভারি একটা খুশি লাগে। জীবনে এই প্রথম সত্যিকার ফেলুদার মতো একটা কাজ করে ফেললাম। নিজেকে নিজে একটা ধন্যবাদ না দিয়ে পারিনে আমি। থ্যাংক ইউ মিস্টার খোকন।

ফাঁসটা গলায় আটকে-থাকা অবস্থাই জন্তুটাকে ডালুদা নামায়। আমি তখন হাঁটু গেড়ে বাঘটার সামনে বসি। চিতাবাঘ হবে। গাটা হাত দিয়ে দেখি শক্ত হয়ে গেছে। বুঝতে পারি কাল বিকেলের দিকে মরেছে। আমার হঠাৎ করে তখন পায়রা তিনটের কথা মনে পড়ে। বাঘটা পায়রাগুলো কি খেতে পেরেছিল?

না। তিনটে পায়রাই বেঁচে আছে। খোঁদলের কাছেই আছে। বাঘ মারা পড়েছে দেখে পায়রার দিকে চোখ যায়নি আমাদের। তাহলে ব্যাপারটা হলো কি!

আমি মনে মনে ডিটেকটিভ কায়দায় ব্যাপারটা সাজাই। বাঘটা বাইরে কোথাও ছিল। ফিরে এসে দেখে ঘরের কাছে প্রিয় খাবার। চারদিক না তাকিয়েই পায়রা ধরার জন্যে দিয়েছে লাফ। সঙ্গে সঙ্গে নাইলন কর্ডের ফাঁস আটকে গেছে গলায়। আঃ তখন একটা দৃশ্য হয়েছে বটে! যদি চোখে দেখা যেতো! নাইলন কর্ডের এক প্রান্ত ধরে বাঘটাকে হিঁচড়ে টানতে শুরু করে বারেক। সে-ই এখন আমাদের আগে। আমি আর ডালুদা পেছনে। কিন্তু আমার মাথার ভেতর ছোট্ট একটা প্রশ্ন আঁকপাঁকু করে, জন্তুটা যখন বাঘই তখন কোনও মানুষকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খায়নি কেন? নাকি দু'জনের কথা জানি না, আমার চোখে রাখাল ছেলেটিকে মারতে দেখেছি। তার গলার কাছে শুধু ছোট্ট তিনটে দাঁতের দাগ পাওয়া গিয়েছিল। ব্যাপারটা আসলে কি? তাছাড়া বাঘই যখন, ছোট হোক আর বড় হোক, কাছে যাকে পাবে তাকেই তো আক্রমণ করার কথা। কিন্তু এ যে শুধু বেছে বেছে বাচ্চা ছেলেদের আক্রমণ করতো। তাছাড়া বাঘের নখের আঁচড় খুব তীক্ষ্ণ হয়, এর তো নখ তেমন নয়। আমি সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি।

আমার মাথায় তালগোল পাকিয়ে যায়।

গ্রামের কাছাকাছি আসতেই হৈ-চৈ পড়ে গেলো। জন্তুটা মারা পড়েছে। গ্রামের লোকজন ভেঙে পড়লো দেখতে। নানাবাড়ির বিশাল উঠোনের মধ্যিখানে বাঘটা ফেলে রাখা হয়েছে। চারপাশের গ্রাম থেকে লোকজন আসছে দেখতে। আর আমার মতো ছোট্ট ছেলে এটা মেরেছে শুনে বাঘ ফেলে অবাক হয়ে সবাই আমাকেই দেখে। সাবাস দেয়। আমার কিচ্ছু ভাল লাগে না। কেবল জিমির কথা মনে হয়। জিমি থাকলে এখন ঘেউ-ঘেউ করে সারা বাড়ি মাথায় তুলতো।

ডালুদার মুখে সব শুনে নানী ভয়ে চোখ বড় করে ফেলে। করেছিস কি তোরা? যদি তোদের কাউকে কামড়াতো?

ডালুদা হাসতে-হাসতে বলে, আমাদের কামড়ানো অতো সোজা নয়।

আমি তখন চুপি-চুপি আমবাগানে জিমির কবরের কাছে যাই। বেলির চারাটা তাজাই আছে। বেঁচে যাবে।

আমি এক পলক বেলির চারাটা দেখে জিমির কবরের পাশে বসি। কবরের ওপর হাত রাখতেই মনে হয় জিমির গায়ে হাত রেখেছি। অজান্তে চোখে জল চলে আসে। সামলে নিয়ে বলি, জিমি, তোকে যে মেরেছে, আমি তাকে মেরেছি। তুই আমাকে মাফ করিস জিমি।

জিমির কবরের ওপর হাত রেখে আমি ঝর-ঝর করে কাঁদতে থাকি।

সোনার বিগ্রহ

মঞ্জিল সেন

সঙ্কর্ষণের ইণ্টারকাম টেলিফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার কানে তুলে ও বলল, ইয়েস।

ইনস্যুরেন্স কোম্পানি থেকে মিঃ তরফদার এসেছেন, মহিলা রিসেপশানিস্ট-কাম-টেলিফোন অপারেটরের সুরেলা কণ্ঠ ভেসে এল, অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছিল।

হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিন।

স্যুইং ডোর ঠেলে যিনি ঘরে ঢুকলেন তাঁর গায়ের রঙ বেশ কালো, পরনে ছাই রঙের ফুল শার্ট, আর ওই রঙেরই প্যাণ্ট। পায়ে বাদামী রঙের বুট জুতো। চীনে দোকান থেকে কেনা, এক নজরে দেখে সঙ্কর্ষণ মনে মনে ভাবল।

বসুন। ও আপ্যায়নের গলায় বলল।

চেয়ারে বসতে বসতে ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলোলেন মিঃ তরফদার, বোধহয় যার সাহায্য নিতে এসেছেন তার অবস্থা আর পরিবেশ যাচাই করে নিলেন।

সঙ্কর্ষণ ডানহিল সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?

প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে তরফদার ধন্যবাদ দিলেন, তারপর ওটা ধরিয়ে বললেন, একটা চুরির কেসে আমাদের কোম্পানি আপনার সাহায্য চায়।

ও,—সঙ্কর্ষণ ভুরু কোঁচকালো, তারপর বলল, ইনসিওরড করা কোনও দামী জিনিস?

ভদ্রলোক মাথা দোলালেন।

কিন্তু পুলিশের সাহায্য নিচ্ছেন না কেন?

পুলিশকে জানানো হয়েছে, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাও ইনভেসটিগেট করে থাকি। আমাদের মনে হচ্ছে চুরিটা ভেতরের...মানে জানাশোনা কারও কাজ। তাই পুলিশের পাশাপাশি বাইরের কাউকে দিয়ে আমরা বেসরকারী তদন্ত করতে চাই। তাছাড়া-ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন, পুলিশের ওপর আজকাল মানুষের আর আস্থা নেই।

হুম! সঙ্কর্ষণ স্বগতোক্তি করল, কি চুরি গেছে, আর কত টাকারই বা ইনসিওরড করা ছিল?

একটা রাধাগোবিন্দর যুগল মূর্তি, প্রায় বিঘতখানেক লম্বা, নিটোল সোনার। গোবিন্দর দু'চোখে আবার হীরে বসানো। পাঁচ লাখ টাকার ইনসিওরড করা ছিল।

সঙ্কর্ষণ শিস দিয়ে উঠল, পাঁচ লাখ টাকার প্রিমিয়াম তো কম নয়?—ও বলল, কত দিন আগে ইনসিওর করা হয়েছিল?

সেখানেই তো সমস্যা, মাত্র এক বছর...কোয়ার্টারলি প্রিমিয়াম তিনটে দিয়েছেন, চতুর্থটা আসছে মাসে দেবার কথা, তার আগেই ব্যাপারটা ঘটল।

সঙ্কর্ষণ আবার ভুরু কোঁচকালো, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, গোড়া থেকে বলুন।

আমাদের ক্লায়েন্ট হচ্ছেন অরিন্দম শীল। আহিরিটোলার শীলদের নাম শুনে থাকবেন। খুব বনেদী বংশ। ইংরেজ আমলে এঁদের পূর্বপুরুষরা শুধু খেতাবই পাননি, অনেক সুযোগ-সুবিধেও পেয়েছিলেন। লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা ছিল। কলকাতার অন্যতম ধনী এবং অভিজাত পরিবার বলে খ্যাতি আছে। স্বাধীনতার পর থেকেই অবস্থা পড়তে থাকে। গত তিরিশ বছরে অনেক ওলোটপালোট হয়ে গেছে। রেস আর ফাটকাবাজিতে জলের মতো টাকা বেরিয়ে গেছে। তবে বনেদী চাল-চলন এখনও যায়নি। দু'চারটে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার অরিন্দম শীল, একটার ডিরেক্টর বোর্ডেও আছেন। পড়তি অবস্থা হলেও এখনও যা আছে তাই আমাদের অনেকেরই নেই। মস্ত জমি নিয়ে যে বাড়ি তার দামই এখন কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে। পুরনো আমলের বাড়ি হলেও খাঁটি মাল-মশলায় তৈরি, এখনও মজবুত আছে।

যা হোক, ওই রাধাগোবিন্দ মূর্তি বানিয়েছিলেন অরিন্দম শীলের পিতামহ, জয়কৃষ্ণ শীল। তিনি ইংরেজদের কাছ থেকে খেতাব পেয়েছিলেন। তিনিই শীলবংশের প্রথম উদ্যমী পুরুষ, ব্যবসায় পত্তন তিনিই করেছিলেন। খুব সমারোহ করে ওই যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জয়কৃষ্ণ শীল। অনেক খোঁজখবর করে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থান জয়রামবাটী থেকে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারকে এনে তিনি জায়গা-জমি দিয়ে বসতি করিয়েছিলেন। পুরুষানুক্রমে তাঁরাই এই বিগ্রহের পূজা করেন। এখন যিনি পূজারী তাঁর নাম জনার্দন ভট্চায, বয়স ষাটের কাছাকাছি। গত তিরিশ বছর ধরে তিনি পূজা আরতি করছেন।

গত পনের তারিখে সন্ধ্যেবেলা আরতির সময় অরিন্দম শীল, তাঁর স্ত্রী আর দুই পুত্রবধূ ঠাকুরঘরে ছিলেন। জনার্দন ভট্চায যথারীতি আরতি করছিলেন। অরিন্দম শীলের হঠাৎ কেমন যেন খটকা লাগল। তিনি ঠাকুরমশায়কে বিগ্রহ ভাল করে দেখতে বললেন। তাঁর সন্দেহই ঠিক। ওটা আসল বিগ্রহ নয়, ঠিক অমন দেখতে সস্তা ধাতুর এক যুগল মূর্তি, সোনার জলে এমনভাবে পালিশ করা যে খুব অভিজ্ঞ চোখ ছাড়া ধরা কঠিন। গোবিন্দর চোখে নকল ঝকমকে সাদা পাথর...

সঙ্কর্ষণ বাধা দিয়ে বলল, এটাও হতে পারে যে, পনের তারিখে ধরা পড়লেও এই অদল-বদল ব্যাপারটা কয়েকদিন আগে ঘটেছে, কেউ খেয়াল করেননি।

তা হতে পারে, তরফদার স্বীকার করলেন।

পুরোহিত যখন পুজো বা আরতি করেন তখন বাড়ির লোক...মানে কেউ না কেউ কি সেখানে থাকেন?

তাই তো শুনেছি।

পনের তারিখে আরতির সময় অরিন্দম শীল, তাঁর স্ত্রী আর দুই পুত্রবধূ ঘরে ছিলেন বললেন, রোজই কি তাঁরা থাকেন?

না, সেদিন রাসপূর্ণিমার উৎসব ছিল।

তবে অন্যদিন কে থাকেন পুজো বা আরতির সময়?

সাধারণত অরিন্দম শীলের স্ত্রীই থাকেন, পুত্রবধূরা কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন। তবে তিনি কিছুদিন ধরে অসুস্থ, বাতের ব্যথায় ভুগছেন, বেশি হাঁটা-চলা করতে পারেন না, তাই রোজ থাকতে পারেন না। পুত্রবধূদের কেউ একজন থেকে পূজার যোগান দেন। অরিন্দম শীলও মাঝে মাঝে পূজার সময় থাকেন। শুনেছি সন্ধ্যেবেলা আরতির সময় খুব জরুরি দরকার না থাকলে তিনি ঠাকুরঘর থেকে নড়েন না।

ঠাকুরমশায়ের পুজো বা আরতির সময় কেউ কি ওঁকে একা রেখে দু'-পাঁচ মিনিটের জন্য বাইরে যান? ধরুন কিছু আনতে?

তা ঠিক বলতে পারব না, তরফদার বললেন, আমার মনে হয় আপনি তদন্তের ভার নিলে সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন। পুলিশ ঠাকুরমশাইকেই সন্দেহ করছে,

তাঁর বাড়িতেও সার্চ হয়েছে। তিনি এখন জামিনে আছেন। অরিন্দম শীল অবিশ্যি বলেছেন, ঠাকুরমশাই দীর্ঘকাল পূজা-আর্চা করছেন, ধার্মিক এবং সৎ। তাঁকে তিনি সন্দেহ করেন না। কিন্তু মানুষ অবস্থার বিপাকে কখন কি করে বসে তা কেউ বলতে পারে না।

অবস্থার বিপাকে বলছেন কেন? সঙ্কর্ষণ আবার ভুরু কোঁচকালো।

ঠাকুরমশায়ের একমাত্র ছেলে একটা সওদাগরি আপিসে কাজ করত। আজ এক বছর হলো সেখানে লক-আউট চলেছে। ঠাকুরমশাই ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। দুটি নাতনিও আছে। খুব টানাটানিতে পড়েছেন। শীলবাড়িতে পূজা করে যা পান তাতে তো আর গোটা সংসারের সারা বছর চলে না।

আই সী, সঙ্কর্ষণ বলল।

ভাল কথা, তরফদার বললেন, আপনি যদি আসল মূর্তি উদ্ধার করতে পারেন তবে কোম্পানি থেকে আপনাকে দশ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। এই নিন কোম্পানির লিখিত চুক্তি।

পোর্টফোলিও থেকে টাইপ করা একটা কাগজ বার করে তিনি সঙ্কর্ষণের হাতে দিলেন।

কাগজটায় চোখ বুলিয়ে সঙ্কর্ষণ বলল, কিন্তু এ ব্যাপারে শীলবাড়ির পূর্ণ সহযোগিতা আমার চাই, অরিন্দম শীল আমার তদন্তে বাধা দেবেন না তো?

না, তাঁকে বলা হয়েছে তাঁর ক্লেম অ্যাডমিট করার আগে আমরা ভাল করে তদন্ত করে দেখব। পাঁচ লাখ টাকা চাট্টিখানি কথা নয়। ভদ্রলোক সব রকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ঠিক আছে, কেসটা আমি গ্রহণ করলাম, সঙ্কর্ষণ বলল।

দুই

আহিরিটোলার শীলদের বাড়ি সত্যিই দেখবার মতো। আগেকার দিনের ধনী পুরুষদের চকমিলান প্রকাণ্ড দালানবাড়ি। নাট-মন্দির, আস্তাবল সবই আছে, তবে সেই জৌলুস নেই। আস্তাবল ফাঁকা। অরিন্দম শীলের আমলেই সব বিক্রি হয়ে গেছে। বিরাট বিরাট খিলান, মার্বেল পাথরের মেঝে, চওড়া দেওয়ালের গাঁথুনি। অনেক ঘর। কিন্তু এই প্রকাণ্ড বাড়িই এখন মস্ত বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সঙ্কর্ষণ সকালের দিকেই গিয়েছিল। অরিন্দম শীল ততক্ষণে স্নান সেরে ফেলেছেন। গৌরবর্ণ চেহারা, বয়স ষাট পেরিয়েছে। পরনে পট্টবস্ত্র, গায়ে সাদা শাল। তিনি ঠাকুরঘরে যাবার উদ্যোগ করছিলেন। ঠাকুরমশাই এসে গেছেন। সঙ্কর্ষণের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন জনার্দন ভট্চাযই পূজা করছেন।

সেদিন হঠাৎ কেন আপনার সন্দেহ হলো বিগ্রহ বদল হয়েছে? সঙ্কর্ষণ জিগ্যেস করল।

ওটা জন্ম থেকে দেখে আসছি, তাই সেদিন কেমন যেন খটকা লেগেছিল, অরিন্দম শীল জবাব দিলেন।

কিন্তু ওটা যে সেদিনই বদল হয়েছে এমন নাও হতে পারে, সঙ্কর্ষণ বলল, কয়েক দিন আগেও ব্যাপারটা ঘটতে পারে।

তা হতে পারে, অরিন্দম শীল কেশবিরল মাথায় হাত বুলোলেন।

সে কথাই তো আমি জানতে চাইছি, সঙ্কর্ষণ বলল, ওই দিনই আপনার খটকা লাগল? আগে চোখে পড়েনি কেন?

অরিন্দম শীল এক মুহূর্ত সঙ্কর্ষণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, হয়ত খেয়াল করিনি। তবে সেদিন রাসপূর্ণিমা ছিল, সন্ধ্যেবেলা আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল বিগ্রহ, তাই চোখে পড়েছিল বোধহয়। তাছাড়া আগেই যে ওটা বদল হয়েছিল সেটা তো আপনার অনুমান, ওই দিন সকালেও তো ঘটতে পারে।

তা ঠিক, সঙ্কর্ষণ বলল। ওই দিন সকালবেলা পুজোর সময় ঠাকুরঘরে কে ছিলেন?

আমার ছোট পুত্রবধূ, আমাকে সেদিন সকালেই বেরোতে হয়েছিল।

আপনার ছোট পুত্রবধূর সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই। হ্যাঁ, শুধু ওঁর সঙ্গে নয়, আপনার বাড়ির সবার সঙ্গেই আমি কথা বলব। দয়া করে একটু ব্যবস্থা করে দিন।

ঠিক আছে, অরিন্দম শীল আশ্বাস দিলেন।

তাঁর ছোট পুত্রবধূর নাম ঈপ্সিতা। অরিন্দম শীলরা বনেদী পরিবার, এবং সেই সূত্রে রক্ষণশীল বলে পরিচিতি আছে। কিন্তু ঈপ্সিতা তাঁর ব্যতিক্রম। চুল ছোট করে কাটা, ভুরু প্লাক করা, বেশভূষায় আধুনিকতার ছাপ। মুখে প্রসাধনের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

বসবার ঘরে কথা হচ্ছিল।

সঙ্কর্ষণ বলল, পনের তারিখে সন্ধ্যেবেলা আপনাদের বিগ্রহ বদলের ব্যাপারটা ধরা পড়ল, সেদিন সকালবেলা আপনি পুজোর ঘরে ছিলেন। ঠাকুরমশায়ের পুজোর যোগান দিচ্ছিলেন, কেমন?

হ্যাঁ ঈপ্সিতা মৃদু ঘাড় দোলালো।

আপনি কি সব সময় ঘরে ছিলেন...মানে একবারও ঘরের বাইরে যাননি?

মিনিট পঁচেকের জন্য একবার আমার শোবার ঘরে গিয়েছিলাম, ঈপ্সিতা জবাব দিল, চন্দন ঘষতে ঘষতে মনে পড়েছিল আলমারিটা খুলেছিলাম, বন্ধ করা হয়নি।

ও,—সঙ্কর্ষণ বলল, এর আগে কোনওদিন এমন ঘটনা ঘটেনি। আলমারি না হোক, অন্য কোনও কারণে ঠাকুরঘর ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন।

তা হতে পারে, আমরা তো আর আগে কখনও ঠাকুরমশাইকে সন্দেহ করিনি।

এখন করেন?

করব না। ঈপ্সিতার কণ্ঠে বিস্ময়, উনি ছাড়া আর কে সরাতে পারে ওটা?

উনি অনেক বছর ধরে পুজো করছেন, আগে অবিশ্বাসের কাজ তো করেননি।

মানুষের স্বভাব বদলাতে কতক্ষণ! ঈপ্সিতা বলল, লোভ মুনি-ঋষিদেরও মতিভ্রম ঘটায়।

হুঁ! আপনার বড় জাকে একবার পাঠিয়ে দিন।

অরিন্দম শীলের বড় পুত্রবধূ কিন্তু রক্ষণশীল ঘরের বধূ হবার উপযুক্ত। হাতির দাঁতের মতো গায়ের রঙ, পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ, ঘন কালো চুল কোমর ছাড়িয়েছে, মাথায় ঘোমটা। কপালে সুন্দর একটা সিঁদুরের টিপ আর দু'পায়ে আলতা। নামও সাবেকী আমলের, মৃণালিনী। তিনি একা ঘরে এলেন না, একজন দাসীকে সঙ্গে নিয়ে এলেন।

সঙ্কর্ষণের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন পূজোর আয়োজনের সময় তিনিও দু'-একবার দরকারে বাইরে গেছেন। বিগ্রহ বদলের ব্যাপারটা পনের তারিখের আগেও ঘটতে পারে বলে তিনি স্বীকার করলেন। ঠাকুরমশাই সম্বন্ধে তিনি বললেন তাঁকে ধার্মিক এবং সৎ বলেই এতদিন তাঁর ধারণা ছিল।

অরিন্দম শীলের স্ত্রীর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। বয়সকালে তিনি যে পরমাসুন্দরী ছিলেন তা এক নজরেই বোঝা যায়। সঙ্কর্ষণ যেদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলল, সেদিন তিনি বাতের ব্যথায় কাবু হয়ে পড়েছিলেন। তিনি কিন্তু পনের তারিখের আগে বিগ্রহ বদল হবার সম্ভাবনা মানতে পারলেন না। অর্থাৎ ঘুরেফিরে সন্দেহটা ঠাকুরমশায়ের ঘাড়েই এর্সে পড়ছে।

বড় ছেলে আনন্দ, অরিন্দম শীল যে কোম্পানির ডিরেক্টর সেখানে অ্যাকাউন্টস অফিসার, আর ছোট ছেলে সুনন্দ এক বেসরকারী সংস্থার ইঞ্জিনীয়ার। তারা কেউ পারতপক্ষে পূজার ঘরে পা দেয় না, ধর্মে তেমন মতি নেই।

সবশেষে জনার্দন ভট্চার্যের সঙ্গে দেখা করল সঙ্কর্ষণ। উজ্জ্বল গায়ের রঙ, মাথার চুল প্রায় সাদা, চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার কালো ছাপ পড়েছে।

তিনি ওর পরিচয় আর উদ্দেশ্য জানতে পেরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, বললেন, আমাকে বাঁচান বাবু, আমি নির্দোষ, বিগ্রহ পালটাপালটির ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আজ তিরিশ বছর ধরে ও বাড়িতে আমি পুজো করছি, আমার পিতামহকে এখানে এনে বসিয়েছিলেন কর্তাবাবুর পিতামহ, জায়গা-জমি দিয়েছিলেন, আমি এমন নিমকহারামের কাজ করিনি।

আপনি শান্ত হয়ে আমার কথার জবাব দিন, সঙ্কর্ষণ বলল, আপনি নিরপরাধ হলে নিশ্চয়ই তা প্রমাণ করা যাবে।

ভট্‌চাযমশাই চোখ মুছে আত্মসংযমের চেষ্টা করলেন। সঙ্কর্ষণ তাঁকে সহজ হবার জন্য কয়েক মুহূর্ত সময় দিল, তারপর বলল, ঠাকুরঘর কি পূজো আরতি ছাড়া অন্য সময় বন্ধ থাকে?

হ্যাঁ, ভট্‌চাযমশাই জবাব দিলেন, বাইরে থেকে তালা দেওয়া থাকে।

চাবি কার কাছে থাকে?

গিন্নিমার কাছে।

উনিই কি রোজ দরজা খুলে দেন?

সুস্থ থাকলে উনিই দেন।

আর সুস্থ না থাকলে?

কর্তাবাবু, নয়তো বড় বউমা। খুব ধর্মে মতি বড় বউমার।

তবে উনি পুজো বা আরতির সময় রোজ ঠাকুরঘরে থাকেন না কেন?

ওঁর ঘাড়েই তো সব সংসার এখন। গিন্নিমা প্রায়ই বাতের ব্যামোয় শয্যাশায়ী থাকেন, তাই বড় বউমাকেই সংসারের সব দেখাশোনা করতে হয়।

আর ছোট বউমা?

তিনি একটু নিজের খেয়ালে চলেন। ভট্‌চাযমশাই সামান্য ইতস্তত করে বললেন, এই পরিবারে যেন বেমানান। আসলে উনি ছোটদাদাবাবুর আপিসেই কাজ করতেন, সেখানেই ভাব আর বিয়ে। কর্তাবাবু আর গিন্নিমার একটুও মত ছিল না বিয়েতে, কিন্তু ছোটদাদাবাবু তাঁদের কথা শোনেননি। ছোট বউমাকে তেমন সুনজরে দেখেন না কর্তাবাবু আর গিন্নিমা, তাই বোধহয় সংসারের কোনও ব্যাপারে ছোট বউমার আগ্রহ একটু কম।

কিন্তু আপনার পুজো বা আরতির সময় দরকার হলে উনি তো থাকেন, আপনাকে যোগাড়যন্ত্র করে দেন।

তা কেন দেবেন না, হিঁদুর মেয়ে, দেব-দেবীর প্রতি অশ্রদ্ধা থাকতে পারে কখন। তবে উনি খুব ঠেকায় না পড়লে আসেন না। কর্তাবাবুই বেশিরভাগ সকাল-সন্ধ্যায় হাজির থাকেন। তিনি আবার বড় খুঁতখুঁতে। পুজো-আরতিতে এতটুকু ত্রুটি বরদাস্ত করেন না। অবিশ্যি গিন্নিমা সুস্থ থাকলে তিনিই থাকেন।

বুঝেছি, সঙ্কর্ষণ বলল, ওঁদের কেউ না থাকতে পারলে বড় বউমাই পুজোর কাজকর্ম করেন, কেমন?

হ্যাঁ।

বড় ছেলে মানে আনন্দবাবু আপনার কর্তাবাবু যে কোম্পানির ডিরেক্টর সেখানেই কাজ করেন। তাঁর আবার কিছু বদখেয়ালও আছে শুনেছি।

মানে...বড়ঘরের ছেলে, একটু-আধটু খেয়াল তো থাকবেই। তবে নেশা-ভাঙ করেন না।

আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, বাজারে ওঁর ধার-দেনা কম নয়, সঙ্কর্ষণ যেন চিন্তা করতে করতে বলল, এদিকে আবার কোম্পানির অ্যাকাউন্টস অফিসার, টাকা-পয়সা নিয়ে কারবার...

কি বলছেন আপনি! ভট্‌চাযমশাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

না, আমি সব সম্ভাবনাই ভেবে দেখছি, সঙ্কর্ষণ বলল, শুনলাম আপনার ছেলেও নাকি এক বছর ধরে বাড়ি বসে আছে?

হ্যাঁ, ভট্‌চাযমশায়ের মুখে আবার ফুটে উঠল দুশ্চিন্তার ছাপ।

শীলবাড়ি থেকে যা পান তাতে কি সারা মাস চলে? সঙ্কর্ষণ জিগ্যেস করল।

তাই কি চলে! ভট্‌চাযমশাই ম্লান হাসি হাসলেন, আগে বরাদ্দ ছিল মাসে এক মণ চাল, এখন তা দাঁড়িয়েছে দশ কিলোয়। মাসোহারা অবিশ্যি দেড়শো টাকা থেকে বেড়ে আড়াইশো টাকা হয়েছে। কিন্তু দশ বছর আগেও দেড়শো টাকার যা মূল্য ছিল, আজ পাঁচশো টাকার মূল্যও তার চাইতে কম।

তা একশোবার, সঙ্কর্ষণ সায় দিয়ে বলল, তবে চলে কি করে আপনার?

বাঁধা কয়েক ঘর যজমান আছে, ভট্‌চাযমশাই মলিন মুখে বললেন, একটু-আধটু জ্যোতিষশাস্ত্রও জানি, তা থেকেও কিছু আসে। মাঝে মাঝে উপোস দিই, অভ্যেস হয়ে গেছে, এইভাবেই চলে। ছেলের চাকরিটা থাকলে চিন্তা ছিল না।

ছেলেকে নিজের পেশায় ঢোকালেন না কেন? সঙ্কর্ষণ জিগ্যেস করল, একদম বসে না থেকে কিছু অন্তত ঘরে আনতে পারতো।

আজকালকার ছেলে, ইস্কুল-কলেজে পড়েছে, নামাবলী গায়ে দিতে রাজি হয়নি, মানে বেধেছিল। এখন বুঝছে। নতুন চাকরির আশাও নেই। স্ট্রাইক আর লক-আউটে একটার পর একটা কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আর সেই সঙ্গে এক একটা পরিবারকে ঠেলে দিচ্ছে ধ্বংসের মুখে।

শুনেছি আপনার স্ত্রী কঠিন অসুখে ভুগছেন, তাঁর ঠিকমতো চিকিৎসার জন্য নাকি অনেক টাকার দরকার?

ভট্‌চাযমশাই কোনও জবাব দিলেন না, বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

ছোট ছেলে সুনন্দর সঙ্গেও কথা বলল সঙ্কর্ষণ। সে কিন্তু সঙ্কর্ষণকে বেশি পাত্তা দিতে চাইল না। সে একজন ইঞ্জিনীয়ার, নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন।

আপনি তো ন্যাশনাল মাল্টিপারপাস ইণ্ডাসট্রিজ কোম্পানিতে কাজ করেন? সঙ্কর্ষণ বলল।

হ্যাঁ, ওখানকার ইঞ্জিনীয়ার, সুনন্দ জবাব দিল।

পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা চেক নিয়ে কি যেন গোলমাল হয়েছে, আপনার নামও তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।

মিথ্যে কথা, সুনন্দ বলে উঠল, আমাকে মিথ্যে করে ওই ব্যাপারে জড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে। তারপরই গলা নীচু করে প্রায় অনুনয়ের সুরে সে বলল, বাবার কানে এ কথা তুলবেন না, প্লিজ, উনি খুব শকড্ হবেন।

পথে এসো বাছা, সঙ্কর্ষণ মনে মনে বলল।

তিন

কয়েকদিন কেটে গেছে। সঙ্কর্ষণ ইতিমধ্যে নানান জায়গায় খোঁজখবর করেছে।

মিঃ তরফদার সেদিন ওর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, কাজ কতদূর এগিয়েছে জানতে চাইলেন।

ব্যাপারটা কি জানেন, সঙ্কর্ষণ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, বিগ্রহ বদল কার কীর্তি সেটা অনুমান করা খুব কঠিন নয়, কিন্তু প্রমাণ করাটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেন? তরফদার জিগ্যেস করলেন।

যে এই কাজ করেছে সে বাইরের কেউ নয়, ঠাকুরমশাইকেও আমি ঘরের লোক বলেই ধরছি। দোতলার তালাবন্ধ ঘর থেকে বাইরের কেউ এসে বিগ্রহ বদল করে যাবে, যাবার সময় আবার দরজায় তালাটাও লাগাতে ভুলবে না, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে আমার বিশ্বাস এত তাড়াতাড়ি ওই সোনার বিগ্রহ বিক্রি করার চেষ্টা চোর করবে না, সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। অমন একটি মূল্যবান বিগ্রহ যে কোনও বনেদী বা বিখ্যাত পরিবারের সম্পত্তি কিংবা কোনও দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহশালা থেকে সরানো হয়েছে, এই প্রশ্নটাই প্রথমে জাগবে ক্রেতার মনে। কাগজেও এই ঘটনা নিয়ে লেখালেখি হয়েছে। মোটামুটি সবাই, মানে সোনা-রূপার কারবারীরা ব্যাপারটা জেনে গেছেন। সুতরাং চোরকে সাবধানী হতে হবে। কিছুদিন গেলে, ঘটনা যখন মানুষের মন থেকে মুছে যাবে, তখনই সে তৎপর হবে—অবিশ্যি এটা আমার ধারণা। তাই আমার মনে হয় বিগ্রহ এখনও বাড়িতেই আছে, বাইরে পাচার হয়নি। কিন্তু অত বড় বাড়িতে ওটা খুঁজে বার করা অসাধ্য ব্যাপার।

তা বটে, তরফদার স্বীকার করলেন, তবে কি উপায়?

উপায় একটা করতেই হবে, সঙ্কর্ষণ বলল, আমি একটা মতলব ঠাওরেছি। আগামীকাল সন্ধ্যেবেলা আপনি সবাইকে বসবার ঘরে হাজির থাকতে বলবেন। ঠাকুরমশাইকেও থাকতে হবে। অরিন্দম শীলকে বলবেন জরুরি দরকার, সবার উপস্থিত থাকার প্রয়োজন। আপনার কথা উনি ঠেলতে পারবেন না, আপনার

নোটের ওপরেই নির্ভর করছে ওঁর পাঁচ লাখ টাকা। ও, একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করব ভেবেছিলাম। অরিন্দম শীল এত বড় বাড়ি রেখেছেন কেন? ওটার মেনটেনেন্স খরচা, ট্যাক্স, এসব কম নয়। ভাড়া দিলেও তো অনেক টাকা পেতে পারেন। এমনিতেই ওঁর অবস্থা এখন পড়তি অথচ দেখছি বড়মানুষি ঠাটটি বজায় রেখেছেন। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, বাজারে ধার-দেনা কম নয়। উনি এই বাড়ির একটা অংশ কিংবা জমি বিক্রি করলেও অনেক টাকা পেতে পারেন। আজকাল মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং তৈরির জন্য প্রোমোটাররা তো মুখিয়েই আছেন।

ও বাব্বা! তরফদার ঠোঁট উল্টোলেন, সে বুঝি জানেন না। ভদ্রলোকের অবস্থা পড়ে গেছে, চারদিকে ধার-দেনা, কিন্তু বংশমর্যাদা সম্বন্ধে টনটনে জ্ঞান। বড়লোকি চাল-চলন ছাড়তে তিনি রাজি নন। কথায় কথায় বলেই ফেলেন তাঁর শরীরে নীল রক্ত বইছে। এ বাড়ি হলো তাঁর বংশের ঐতিহ্য, কলকাতার একটি ঐতিহাসিক বাড়ি, বেঁচে থাকতে তিনি এ বাড়িতে বাইরের কাউকে অধিকার দেবেন না। তবে, তরফদার টিপ্পনী কাটলেন, ওই বুড়ো যতদিন বেঁচে আছেন ততদিনই, ছেলেরা ওসব ঐতিহ্য-টৈতিহ্য বোঝে না। বাপ চোখ বুজলেই বাড়ি বেচে দেবে, এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

সে যাকগে, সঙ্কর্ষণ বলল, তবে ওই কথাই রইল, আগামীকাল সন্ধ্যেবেলা শীলবাড়িতে আমাদের আবার দেখা হচ্ছে।

তরফদার কথা রেখেছিলেন। অরিন্দম শীলকে বুঝিয়েছিলেন মিটিংটা জরুরি এবং সবাইকে থাকতে হবে।

বসবার ঘরটা প্রকাণ্ড। দেওয়ালে নামী শিল্পীদের আঁকা অয়েল-পেইন্টিং, অযত্নে বিবর্ণ হয়ে গেছে। মেঝেতে খুব দামী কার্পেট বিছানো, অসংখ্য ফুটো চোখে পড়ে। মেহগিনি কাঠের সাবেকি আমলের সব চেয়ার, রঙ বার্নিশ উঠে গেলেও কৌলিনত্ব হারায়নি।

সঙ্কর্ষণ শুরু করল, এ বাড়ির ঠাকুরঘর থেকে আসল রাধাগোবিন্দ মূর্তি খোয়া যাবার ব্যাপারে মিঃ তরফদার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। মূর্তিটি প্রাচীন, এবং নিরেট সোনার। গোবিন্দর দু'চোখে আবার হীরে বসানো। অরিন্দমবাবু ওটা পাঁচ লাখ টাকায় বীমা করেছিলেন। মূর্তি খোয়া গেছে টের পেয়ে তিনি থানায় অভিযোগ করেন, সেই সঙ্গে বীমা কোম্পানির কাছেও পাঁচ লাখ টাকা দাবি করেছেন। বীমা কোম্পানি মিঃ শীলের এই ক্লেম মেনে নেবার আগে নিয়ম অনুযায়ী একটা তদন্ত করতে চেয়েছিল, এবং সেই সূত্রেই কোম্পানি থেকে এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের ভার আমাকে দেওয়া হয়েছে।

সঙ্কর্ষণ একটু থামল। উপস্থিত সবার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর আবার শুরু করল, এই ঘটনায় আমার মনে কয়েকটা প্রশ্ন জেগেছে, সেগুলো আপনাদের সামনে আমি রাখছি।

পনের তারিখ সন্ধ্যেবেলা মিঃ শীল আবিষ্কার করেছিলেন যে, ওটা আসল বিগ্রহ নয়, নকল। সকালবেলা তাঁর মনে সন্দেহ হয়নি, কারণ সেদিন সকালবেলা তিনি ঠাকুরঘরে যাননি। তবে তিনি স্বীকার করেছেন বিগ্রহ আগেও বদল হতে পারে।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা মনে আসে তা হলো এই কাজ বাইরের কারও দ্বারা হয়নি। ঠাকুরঘরে যাদের অবাধ স্বাধীনতা তাদের পক্ষেই বিগ্রহ বদল করা সম্ভব। প্রথমে জনার্দন ভট্চাযের কথায় আসা যাক। তিনি বিগ্রহের পূজারী, অনেক বছর ধরে পুজো আর আরতি করছেন। পুজোর বা আরতির সময় বাড়ির কেউ না কেউ ঘরে থাকেন, তবে অল্প সময়ের জন্য তাঁরা যে বাইরে যান না এমন নয়। ভট্চাযমশাই গায়ে চাদর জড়িয়ে আসেন, ঘরে যখন কেউ নেই তখন মূর্তি বদল করে আসল বিগ্রহ চাদরের আড়ালে লুকোতে অসুবিধে নেই। আরও একটা কথা, বাইরের কেউ ওঁকে টাকা দিয়ে হাত করে বিগ্রহ হাতিয়েছেন এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

না, না, আমি অমন কাজ করিনি। জনার্দন ভট্চায প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

ডান হাত তুলে তাঁকে নিরস্ত করে সঙ্কর্ষণ বলতে লাগল, জনার্দন ভট্চাযের সুযোগ এবং সুবিধে দুই-ই ছিল। প্রশ্ন হতে পারে, গত তিরিশ বছর ধরে তিনি পুজো-আর্চা করছেন, তাঁর বাপ-ঠাকুর্দাও এই বাড়ির পূজারী ছিলেন, এমন অবিশ্বাসের কাজ তিনি কেন করবেন। পরিবেশে মানুষ বদলায়। ভট্চাযমশায়ের ছেলের এক বছর ধরে চাকরি নেই। ঘরে পুত্রবধূ আর দুটি নাতনি, স্ত্রীর কঠিন অসুখ। চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার দরকার। শীলবাড়ি থেকে যা তিনি মাসোহারা পান তা সামান্যই, তা দিয়ে সংসার চলে না। সুতরাং অভাবে পড়ে সোনার বিগ্রহ সরাবার চিন্তা তাঁর মাথায় আসা মোটেই আশ্চর্য নয়।

কিন্তু তাঁর অনুকূলেও দু'-একটা যুক্তি আছে যা উপেক্ষা করা যায় না। যেমন, এই ঘটনায় পুলিশ প্রথমে তাঁকেই সন্দেহ করবে, তাঁর সুযোগ-সুবিধে আছে এবং তাঁর বর্তমান অবস্থার কথা কারও অজানা নয়। এটা জেনেও কেন ভট্চাযমশাই এমন কাঁচা কাজ করবেন! ওই মূর্তি বিক্রি করাও তাঁর পক্ষে খুব সহজ হবে না, বরং তাঁকেই সবাই সন্দেহ করবে এটা জেনেই অন্য কারও পক্ষে মূর্তি বদল করা খুব চতুরের মতো কাজ হবে। আসল অপরাধীকে কেউ সন্দেহ করবে না।

দ্বিতীয়, ঠাকুরঘরে পুজো বা আরতির সময় ছাড়া ভট্‌চাযমশাই ঢোকেন না, দরজায় তালা থাকে। কিন্তু বাড়ির আর কেউ যে কোনও সময় ও ঘরে ঢুকতে পারেন, এমনকি তালার একটা ডুপ্লিকেট চাবি যে কেউ করিয়ে নিতে পারেন, এটাও ঠাকুরমশায়ের পক্ষে একটা যুক্তি। তাঁর সুযোগ বাড়ির অন্যদের তুলনায় সীমিত।

সঙ্কর্ষণ আবার থামল। জনার্দন ভট্‌চার্যের মুখে ফুটল কৃতজ্ঞতার চিহ্ন।

এবার অরিন্দম শীলের বড় ছেলে আনন্দবাবুর কথায় আসা যাক। তাঁর বাবা যে কোম্পানির ডিরেক্টর সেখানকার তিনি অ্যাকাউন্টস অফিসার। অর্থাৎ টাকা-পয়সা লেনদেন বা হিসেবপত্রের ভার তাঁর ওপর। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি ওই কোম্পানির অবস্থা ভাল নয়, কর্মচারীরা ঠিকমতো মাইনে পাচ্ছে না। আনন্দবাবুর আবার ঘোড়ার রোগ আছে। ধার-দেনাও কম নয়। সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ওই সোনার বিগ্রহ সরিয়ে ওখানে একটা মেকী মূর্তি বসাবার মতলব তাঁর মাথায় যদি আসে তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

মিথ্যে কথা, গর্জন করে উঠল আনন্দ, ইটজ এ লাই।

সঙ্কর্ষণ আবার ডান হাত তুলে তাকে নিরস্ত করে বলল, আনন্দবাবুর স্ত্রীকে কখনও-সখনও ঠাকুরঘরের দরজা খুলতে হয়, বিশেষ করে শাশুড়ি অসুস্থ থাকলে কিংবা শ্বশুরমশাই ব্যস্ত থাকলে তিনি চাবি দিয়ে তালা খোলেন। স্বামীকে বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য পতিব্রতা স্ত্রীরা করতে পারেন না এমন কাজ নেই। শুনেছি তাঁর ধর্মে খুব মতি, কিন্তু স্বামীর মঙ্গল তাঁর কাছে জগৎসংসারে সব থেকে বড়।

সঙ্কর্ষণ লক্ষ্য করল ঘোমটার আড়ালে আনন্দবাবুর স্ত্রীর দু'চোখ থেকে যেন আগুন ঝরছে।

এবার ছোট ছেলে সুনন্দবাবুর কথায় আসি। তিনি একটা বেসরকারী কোম্পানির ইঞ্জিনীয়ার। ইচ্ছেই হোক কি অনিচ্ছেই হোক একটা বড় অঙ্কের টাকার গোলমালে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁকে হয়তো মোটা টাকা খেসারত দিতে হতে পারে। ব্যাপারটা অবিশ্যি মিটেও যেতে পারে। কিন্তু তা যদি না হয় তবে অত টাকা কোথা থেকে তিনি যোগাড় করবেন! তাঁর স্ত্রীরও ঠাকুরঘরে অবাধ যাতায়াত। বড় জাকে সাহায্য করার নাম করে তিনিও ঠাকুরঘরের দরজা খুলতে পারেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে তিনি একজন প্র্যাকটিক্যাল ওম্যান, স্বামীকে সাহায্য করার জন্য ওই বিগ্রহ সরাতে অনুশোচনা হবে এমন সেন্টিমেন্টাল তিনি নন।

ইডিয়ট, তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠে উচ্চারিত কথাটা যেন চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল।

সঙ্কর্ষণ সেটা গায়ে না মেখে বলে চলল, আমি আগেই বলেছি, বিগ্রহ পনের তারিখের আগে, ধরা যাক বারো-তের কিংবা চোদ্দ তারিখে বদল হয়েছে। কেন

তা বলছি। আসল বিগ্রহের একটা রেপ্লিকা বা অবিকল প্রতিমূর্তি দরকার ছিল অপরাধীর। যেহেতু আসল মূর্তি কারিগরকে দেওয়া সম্ভব নয়, নিশ্চয়ই ওটার একটা ছবি কিংবা ফোটো থেকে নকল মূর্তিটা বানানো হয়েছে। বাড়ির কারও সাহায্য ছাড়া এটা সম্ভব নয়। নকল মূর্তির ওপর সোনার জল পালিশ করা হয়েছে, আর গোবিন্দর দু'চোখে বসানো হয়েছে দুটো ঝুটো পাথর, হঠাৎ হীরে বলে ভুল হয়। এ দুটো কাজই বোধহয় কোনও জহুরীকে দিয়ে করানো হয়েছে, সোনার জলের পালিশটা তো নিশ্চয়ই।

মূর্তি বদল করা হয়েছে হয়তো চোদ্দ কিংবা তের তারিখে। আনন্দবাবুর স্ত্রী স্বীকার করেছেন পুজোর সময় তিনিও দরকারে দু'-একবার বাইরে যেতেন কিংবা গেছেন। কিন্তু আমি যদি বলি পুজো বা আরতির সময় মোটেই বিগ্রহ বদল হয়নি, হয়েছে অন্য কোনও সময়, যখন কেউ ও ঘরে যায় না। ঘুরে ফিরে সেই একই প্রশ্ন আসছে, ঠাকুরঘরে যেতে বাধা নেই, এমন কেউ ওটা সরিয়েছেন। দু'-একদিন তিনি অপেক্ষা করেছেন। আর কারও চোখে এই পালটাপালটি ধরা পড়ে কিনা এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। আসলে বিগ্রহ যে নকল, তা চট করে ধরা পড়ুক এটা তিনি চাননি।

সঙ্কর্ষণ চুপ করল, ঘরের মধ্যে অখণ্ড নিস্তব্ধতা।

অবিশ্যি আমার এই অনুমান ভুলও হতে পারে, সঙ্কর্ষণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলল, অর্থাৎ বিগ্রহ বদল আগে না হয়ে পনের তারিখেও হতে পারে এবং তা সকালে পুজোর সময়। সেক্ষেত্রে ভট্চাযমশাই সন্দেহমুক্ত নন। আবার দুপুরের দিকে সবাই যখন একটু গড়িয়ে নিচ্ছেন, তখনও হতে পারে। অবিশ্যি বিগ্রহ কবে বা কখন বদল হয়েছে সেটা এখানে গৌণ ব্যাপার, তা কারও পক্ষ সমর্থন কিংবা বিপক্ষে কাজ করছে না। তা যদি হতো তবে সঠিক দিন-ক্ষণ মস্ত একটা ফাক্টর হয়ে দাঁড়াতো। একমাত্র পুজো বা আরতির সময় ছাড়া অন্য কোনও সময় বিগ্রহ বদল হয়ে থাকলে ভট্চাযমশাই নির্দোষ।

সবার মুখের ওপর আবার চোখ বুলিয়ে সঙ্কর্ষণ বলল, আশা করি বুঝতে পারছেন আপনারা কেউ সন্দেহের বাইরে নন। আরও একটা কথা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সোনার বিগ্রহ এখনও বাড়িতেই আছে, ওটাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সমস্ত বাড়িতে তল্লাশি চালালে ওটা পাওয়া যাবে।

একজনের দু'চোখের পাতা যে ঘন ঘন নড়ে উঠল সেটা সঙ্কর্ষণের দৃষ্টি এড়ালো না, শেষের কথাটা তাঁকে উদ্দেশ করেই ওর বলা। মনে মনে ও হাসল, ওর অনুমান মিথ্যে নয়।

আপনারা এবার যে যার ঘরে যান, আমি বাড়ির কর্তার সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই।

আস্তে আস্তে সবাই বেরিয়ে গেল। সবার চোখে-মুখেই বিদ্বেষের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। শুধু ভট্‌চাযমশাই ব্যতিক্রম, তাঁর মুখ ভাবলেশহীন।

ঘরে এখন অরিন্দম শীল, মিঃ তরফদার আর সঙ্কর্ষণ।

ব্যাপারটা এখন বুঝতে পারছেন মিঃ শীল! সঙ্কর্ষণ বলল, বিগ্রহ বদল বাইরের কারও দ্বারা হয়নি। আমি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চাইছিলাম কেউ সন্দেহমুক্ত নন। এমনকি আপনার স্ত্রীও নন।

কি বলছেন আপনি! অরিন্দম শীল রাগত কণ্ঠে বললেন।

অনুসন্ধানে নেমে আমাকে অনেক খোঁজখবর করতে হয়েছে মিঃ শীল, সঙ্কর্ষণ বলল, অনেক জায়গায় যেতে হয়েছে, অনেকের সঙ্গে কথাও বলেছি। আপনার স্ত্রীর ছোট ভাই একজন শিল্পী, নানারকম ধাতুর মূর্তি গড়েন, বাজারে তাঁর যথেষ্ট চাহিদা, ঠিক কিনা?

মিঃ শীল কোনও জবাব দিলেন না।

চার

মিঃ তরফদার যখন আমার কাছে এই বিগ্রহের ব্যাপারে তদন্তের প্রস্তাব নিয়ে আসেন তখন তাঁর মুখে মোটামুটি ঘটনা শুনে প্রথমে একটাই প্রশ্ন আমার মনে জেগেছিল,—সঙ্কর্ষণ অরিন্দম শীলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, যে বিগ্রহ এই বাড়িতে তিন পুরুষ ধরে আছে, কখনও চুরির চেষ্টা হয়নি, হঠাৎ সেটা বীমা দরকার পড়ল কেন? পাঁচ লাখ টাকা বীমার প্রিমিয়াম কম নয়, বছরে অনেক টাকা। তাছাড়া আপনার আর্থিক অবস্থাও আগের মতো নেই। তারপর ঠিক এক বছরের মাথায় বিগ্রহ খোয়া গেল আর আপনি টাকাটা দাবি করে বসলেন, এটা কি কাকতালীয় ঘটনা! আপনাকেই আমার প্রথম সন্দেহ হয়েছিল।

আমাকে! অরিন্দম শীল যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

ভেবে দেখুন, সঙ্কর্ষণ মৃদু হেসে বলল, ঠাকুরঘরে আপনার অবাধ গতি, বিগ্রহ অদলবদল করা আপনার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

এসব আপনি কি বলছেন! অরিন্দম শীলের গলা চড়ল।

আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি আপনি যে সব কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত তাদের কোনওটারই অবস্থা ভাল নয়। এদিকে আপনার খরচের বহর কম নয়। আগে আপনাদের রেসের ঘোড়া ছিল, এখন সে সব পাট চুকলেও মাঠের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ঘোচেনি।

আপনি সীমা লঙ্ঘন করছেন, মিঃ সমাদ্দার, অরিন্দম শীলের মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল।

সে কথায় কর্ণপাত না করে সঙ্কর্ষণ বলে চলল, আমার মনে হলো যেন পাঁচ

লাখ টাকা আদায়ের মতলবেই বিগ্রহ বীমা করা হয়েছে। কষ্ট করে তিনটে কোয়ার্টারের প্রিমিয়াম দিয়ে ওটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বীমা কোম্পানির কাছ থেকে টাকাও আদায় করা হবে, আবার সোনার বিগ্রহ ঘরেই থাকবে এই ছিল পরিকল্পনা।

শাট আপ, অরিন্দম শীল গর্জন করে উঠলেন।

চিৎকার করে লাভ হবে না মিঃ শীল, সঙ্কর্ষণ শান্ত কণ্ঠে বলল, আপনাকে সবার সামনে অপদস্থ করতে চাইনি বলেই আপনার সঙ্গে একান্তে কথা বলছি। আমার মনে ওই সন্দেহ জেগেছিল বলে আমি গোটা উত্তর আর মধ্য কলকাতার সমস্ত সোনার দোকান চষে বেড়িয়েছি। আমি একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি সোনার জলে পালিশ করতে চাই, এ ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা আছে কিনা, হালে এমন কাজ তারা করেছে কিনা, কত খরচ পড়বে, এই ছিল আমার প্রশ্ন। একটা দোকানে জানতে পারি এ মাসের গোড়ার দিকে একটা রাধাগোবিন্দর মূর্তি তারা সোনার জলে পালিশ করেছে। যিনি কাজটা দিয়েছিলেন তাঁর চেহারার বর্ণনাও তাদের কাছ থেকে পেয়েছি। আপনার ডান চিবুকের কাছে কাটা দাগটা পর্যন্ত তারা বলতে ভোলেনি। এর পরেও কি আপনি অস্বীকার করবেন, মিঃ শীল? বলেন তো সেই কারিগরকে এখানে নিয়ে আসব।

অরিন্দম শীলের মুখ ব্লটিং পেপারের মতো সাদা, মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

আপনাদের বনেদী বংশ, সঙ্কর্ষণ বলল, এ কথা জানাজানি হলে খবরের কাগজগুলো লুফে নেবে, টি-টি পড়ে যাবে, পুলিশও আপনাকে ছেড়ে কথা কইবে না। তার চেয়ে বরং আমি একটা প্রস্তাব দিই, আমার মনে হয় সব দিক রক্ষা করার সেটাই একমাত্র পথ।

অরিন্দম শীল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। তাঁর চোখ-মুখের অবস্থা দেখে মায়াই হলো সঙ্কর্ষণের।

আপনি বীমা কোম্পানীর কাছে করা ক্লেমটা উইথড্র করে নিন, ওদের জানিয়ে দিন বিগ্রহ পাওয়া গেছে। মিঃ তরফদারকেও আমি অনুরোধ করব তাঁর কোম্পানির বড়কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এ নিয়ে আর যাতে শোরগোল না হয় তা তিনি দেখবেন। কি বলেন মিঃ তরফদার, আপনি রাজি?

তরফদার সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন, এখানে আপনিই বস, আপনার আদেশ শিরোধার্য।

আপনার অমত নেই তো? অরিন্দম শীলের মুখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল সঙ্কর্ষণ।

তিনি নীরবে দু'পাশে ঘাড় নাড়লেন।

আরও একটা অনুরোধ আছে আমার, সঙ্কর্ষণ বলল, ঠিক একটা নয়, দুটো।

আপনি যদি এখনও লাগাম টানেন, আমার মনে হয় অবস্থা সামাল দিতে পারবেন। তাই অনুরোধ করব বদখেয়ালগুলো ছেড়ে দিন, আখেরে আপনারই মঙ্গল হবে। এই বিরাট বাড়ি আজকাল মস্ত বোঝা। আপনি যদি মেকী আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে কিছু অংশ ব্যাঙ্ক কিংবা নামী কোম্পানিদের ভাড়া দেন, মোটা টাকাই হাতে পাবেন।

আমার দ্বিতীয় অনুরোধ, ভট্‌চাযমশাই মিথ্যে চোরের অপবাদে হয়রানি হয়েছেন, তাঁর মাসোহারা বাড়িয়ে অন্তত পাঁচশো টাকা করে দিন। আজকালকার মাগ্যিগণ্ডার দিনে অতগুলো মুখের অন্ন যোগান দিতে ওই টাকাটাও যথেষ্ট নয়। ভদ্রলোক সৎ এবং বড় ভাল মানুষ।

সঙ্কর্ষণের আপিসে বসে কথা হচ্ছিল। দশ হাজার টাকার চেকটা বাড়িয়ে ধরে তরফদার খুশি মুখে বললেন, আপনি কোম্পানির অনেক টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছেন, ম্যানেজমেণ্ট আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনার অনুরোধ তাঁরা মেনে নিয়েছেন, ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটা কথা আমার জানতে ইচ্ছে করছে।

বলুন। সঙ্কর্ষণ সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল।

আপনি কি সত্যিই মিঃ শীলকে গোড়া থেকে সন্দেহ করেছিলেন?

নিশ্চয়ই, সঙ্কর্ষণ জবাব দিল, হঠাৎ তাঁর বিগ্রহ বীমা করার দরকার পড়ল কেন? বীমা করার এক বছরের মধ্যেই ওটা খোয়া গেল আর মিঃ শীল পাঁচ লাখ টাকা ক্লেম করে বসলেন, এটা আমার কাছে খুবই সন্দেহজনক মনে হয়েছিল। যেন ছকে বাঁধা পরিকল্পনা। কিন্তু অনুমান দিলে তো আর কেসের কিনারা হয় না, তার জন্য চাই প্রমাণ, সেটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কেন? প্রমাণ তো আপনি যোগাড় করেই ছিলেন। তরফদার বললেন।

সে তো আমি বলেছি, সঙ্কর্ষণ হাসল।

মানে! তরফদার অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন।

আরে উত্তর আর মধ্য কলকাতা মিলে সোনার দোকান কি কম নাকি, অত দোকানে ঢুঁ মারা কি সহজ কথা?

আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না, তরফদার যেন বোকা বনে গেছেন।

নকল মূর্তিটা যে সোনার জলে পালিশ করা সে কথা আপনার মুখেই শুনেছিলাম। ও কাজ নিখুঁতভাবে সোনার দোকানেই করা হয়, তাই আমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিলাম। উনি ভাবলেন সত্যিই আমি সেই দোকানের খোঁজ পেয়েছি, সেই সঙ্গে ডান চিবুকের কাছে কাটা দাগটা উল্লেখ করায় উনি ভাবলেন ধরা পড়ে গেছেন।

মাই গড, তরফদার বললেন, আপনি তো সাঙ্ঘাতিক মানুষ। ধাপ্পা দিয়ে কাজ হাসিল করে ফেললেন!

আর কি উপায় ছিল, সঙ্কর্ষণ বলল, উনি কি নিজে থেকে নিজের অপকর্মের কথা স্বীকার করতেন?

কিন্তু ওঁকে যদি গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিলেন, তবে সেদিন ওই মিটিংয়ের কি দরকার ছিল? সবাই যে ও-কাজ করে থাকতে পারেন অমন বিশ্লেষণেরই বা কি দরকার ছিল?

ছিল,—সঙ্কর্ষণ বলল, ওটা হলো মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। মিঃ শীলের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করার জন্যই ওই বৈঠকের দরকার ছিল। শুধু ভট্‌চাযমশাই নন, বাড়ির অন্যদের ওপরেও সন্দেহ সৃষ্টি করে ওঁকে বেসামাল করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। স্বাভাবিকভাবেই নিজের পরিবারের লোকদের ওপর তাঁর দুর্বলতা থাকবে, তাঁদের অনিষ্ট নিশ্চয়ই তিনি কামনা করবেন না। ফলে তাঁর মনে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। আপনি লক্ষ্য করেননি, আমার বক্তৃতার মাঝে ওঁর দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল শঙ্কায় ছাপ। তারপরই সোজাসুজি ওঁর দিকে বাণ ছুঁড়লাম, ব্যস কুপোকাৎ।

আপনাকে তবে মনস্তত্ত্ব নিয়েও পড়াশোনা করতে হয়েছে? তরফদার পরিহাস-তরল কণ্ঠে বললেন।

নিশ্চয়ই, সঙ্কর্ষণ জবাব দিল, ভাল গোয়েন্দা হতে হলে, একজন ভাল মনস্তত্ত্ববিদও হওয়া দরকার।

খুনি কে

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

অমল ও সুরেশ দুই বন্ধু। সুরেশ থাকতো পেশোয়ারে। এসেছে কলকাতায় বেড়াতে। উঠেছে অমলের বাড়ি।

বাড়িতে অমল থাকে একা। দোতলা বাড়ি। অমল অনেক টাকার মালিক। পৈতৃক সম্পত্তি তো পেয়েইছে ; মাতৃক অথাৎ দাদামশায়ের খানদুই বাড়িও মাস-কতক হলো তার হাতে এসেছে। এক মামা। সেও আবার পাতানো। টাকা-পয়সা পেলেও অমলের মাথা ঠিক আছে। সে বাবুগিরি করে না। সখের মধ্যে যা দেখা যায়, তা হচ্ছে বই কেনা ; কেবল কেনা নয়, সেই সঙ্গে পড়াও।

সে উত্তর-ভারতে বেড়াতে গিয়ে সেবার পেশোয়ারে সুরেশের বাড়িতে অতিথি হয়েছিল। সুরেশ সেখানে রেলে চাকরি করে। মাইনে যা পায়, তা বেশ। সেখানে খাতিরও খুব। অনেকদিন বাঙলাদেশ ছাড়া। তাই কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে।

সে-রাতে একটা বিশ্রী শব্দে সুরেশের ঘুম ভেঙে গেল, কিন্তু ঘুমের ঘোরটা গেল না। সে প্রথমে বুঝতে পারলে না কোথায় আছে। পরক্ষণেই তার মনের জড়তা

কেটে গেল। বুঝতে পারলে, সে আছে অমলেরই বাড়িতে। কিন্তু শব্দটা কিসের? সম্ভবত ঝড়ের। ঝড়েই যেন জানলা-দরজার পাল্লা দড়াম্ করে বন্ধ করলে। কিন্তু তারপরও সেই রকম শব্দ হতে লাগলো।

শীতকাল ; তাই সুরেশের দরজা-জানলা বন্ধই ছিল। কিন্তু শীত-গ্রীষ্ম সব সময়েই অমলের জানলা খুলে শোবার অভ্যাস ; সে বলতো, জানলা বন্ধ করে শুলে আমার দম আটকে যায়! শব্দটা যেন সুরেশেরই ঘরখানার নিচে হচ্ছে। তার ঘরের নিচে আছে অমলের পড়বার ঘর। হয় সে এখনও পড়ছে অথবা জানলা খুলে রেখেই শুতে গেছে। পড়বার ঘরের পাশেই তার শোবার ঘর।

এই সব ভেবে সুরেশ আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলে। কিন্তু ঘুম আর এলো না, থেকে থেকে শুধু শব্দই হতে লাগলো!

সে উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বাললে। ঘড়ি দেখলে—রাত দুটো!

আবার দড়াম্ করে শব্দ হলো। এরকম শব্দ হতে থাকলে ঘুমোনোই দায়! সুরেশ বিছানা ছেড়ে উঠলো। মোটা আলোয়ানখানা গায়ে, চটিজোড়া পায়ে দিয়ে, ধীরে ধীরে সে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

দরজার পাশে সুইচ ছিল। সুইচটা টিপতেই বারান্দাটি আলোকিত হলো। সামনে নিচের সিঁড়ি। সিঁড়ির মাথায় আলো ছিল। সে বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ির আলো জ্বেলে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতেই, পরিষ্কার বুঝতে পারলে শব্দটা কোথা থেকে আসছে!

সুরেশ ঘরখানার দরজাটা টানতেই খুলে গেল। ঘরে তখনও আলো জ্বলছিল। অমল কি এখনও পড়ছে? না,—সামনের দিকে তাকিয়েই তার হাত-পা অসাড় হয়ে গেল, আর এক পাও নড়বার শক্তি রইলো না! সে দেখলে, অমল কার্পেটের ওপর চিৎ হয়ে হাত দু'খানা ছড়িয়ে পড়ে আছে। তার কপালে একটি ক্ষত। সেই ক্ষত থেকে রক্ত বার হয়ে একটি লাল ধারায় কার্পেটে পড়ছে।

ক্ষতটি দেখেই সুরেশের মনে পড়লো, এরকম ক্ষত হয় রিভলভারের গুলিতে। সে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো, তাহলে সেই অস্ত্রটি কোথায়? কিন্তু এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে কিছুই দেখতে পেল না। এটা খুন, না আত্মহত্যা? আত্মহত্যা হলে অস্ত্রটা কাছেই থাকবে, খুন হলে খুনিই সেটা নিয়ে গেছে। কিন্তু—সুরেশ সাহসে ভর করে এগিয়ে গিয়ে অমলের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো। সেই সময় একবার চোখ মেলে তাকালো এবং তার ঠোঁট দু'খানি কেঁপে উঠলো। সে যেন কি ফিস্ ফিস্ করে বললে!

সুরেশ তার দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলে, অমল, এ কি? কে করলে এ কাজ?

অমল অতি কষ্টে ফিস্ ফিস্ করে বললে, সুরেশ, সে আমাকে খুন করেছে। পুলিশকে বলো যে—

ঠিক সেই সময় জানলায় এত জোরে শব্দ হলো যে, অমলের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ডুবে গেল।

সুরেশ আরও ঝুঁকে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, আমি শুনতে পাচ্ছি না অমল, কে?

কিন্তু অমলের কণ্ঠস্বর চিরদিনের মতো থেমে গেল!

সুরেশের হাত-পা আর চললো না। সে অসাড়ের মতো তার দিকে তাকিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে রইলো। কিন্তু একটু পরেই স্বপ্নের মতো মনে হলো, সেখানে আরও কে এসে দাঁড়িয়েছে!

সুরেশ তাকিয়ে দেখে, দরজায় অমলের এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় দাঁড়িয়ে। সে-ও এসেছে দিন-দুই হলো, শিলং থেকে কলকাতায়। নাম তার শরৎ।

শরৎ বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় পুরুষ ; সে জিজ্ঞেস করলে, কি হয়েছে সুরেশবাবু?

—অমলকে কেউ খুন করেছে। আপনি নিচে ওর সরকারকেও জানান। আমি ততক্ষণ এইখানেই থাকবো।

শরৎ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। সে শুয়েছিল সুরেশের পাশের ঘরে।

শরৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সুরেশ জানলাটা বন্ধ করে দিলে। টেবিলের ওপর টেলিফোন ছিল। রিসিভারটা তুলে নিয়ে পুলিশকে আসবার জন্যে থানায় ফোন করলে। একজন ডাক্তারকেও সঙ্গে আনতে বললে।

পুলিশ যখন এল, তখন হল্‌ঘরে বাড়িরই কয়েকজন জমা হয়েছে। সব ঘরেই আলো জ্বলছে। এমন কি, বাড়ির চারধারে যে বাগানখানি ছিল, সেখানেও আলো জ্বলছিল।

ডাক্তারকে নিয়ে পুলিশ তাড়াতাড়ি অমলের পড়বার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ডাক্তার অমলকে পরীক্ষা করে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন ; বললেন, বারুদের দাগ নেই, পিস্তলটাকেও দেখা যাচ্ছে না। এ তো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে খুন। তবে বেশিক্ষণ আগে হয়নি। মিনিট কুড়ি কি বড় জোর আধঘণ্টা আগে হবে।

দরজার কাছে যারা ঘোরাঘুরি করছিল, দারোগাবাবু তাদের লক্ষ্য করে বললেন, সকলের আগে কে দেখেছেন?

সুরেশ সভয়ে গলা পরিষ্কার করে বললে, আমি যখন আসি, তখনও ওর নিশ্বাস পড়ছিল। কে খুন করেছে ও আমাকে বলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি।

—তার আগে কি হয়েছিল?

—জানি না। কেবল ঝড়ে ঐ জানলাটা জোরে জোরে বন্ধ হচ্ছিল। সেই শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। তারপরও শব্দের জন্যে আর ঘুমোতে পারিনি। তাই নিচে নেমে এসেছিলাম।

—কাউকে তখন দেখেছিলেন?

—কাউকে দেখিওনি, ঝড়ের শব্দ ছাড়া কিছু শুনতেও পাইনি। তবে আমার পর এসেছিলেন শরৎবাবু। উনিও শব্দে ঘুমোতে পারছিলেন না।

দারোগা সরকারের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, এ বাড়িতে আর কে কে আছে?

—দু'জন চাকর আর একটা ঠাকুর। মোটর-ড্রাইভারটার বাড়ি কাছেই ; সে সকালে আসে, রাতে চলে যায়।

—কোথায় খাওয়া-দাওয়া করে?

—এখানেই।

—বলতে পারেন, আপনার বাবু এত রাত অবধি কি করছিলেন?

—তা জানি না। তবে মাস-কয়েক থেকে উনি রাতে ভাল ঘুমোতে পারতেন না। প্রায়ই রাত জেগে পড়াশুনা করতেন।

—আচ্ছা, উনি এ রকম বিপদের কথা কখনো বলেছিলেন?

—আমার কাছে তো বলেননি ; আমি সরকার। আমার কাছে মনের কথা বলবেন কেন?

—তবে কার কাছে বলতেন, বলতে পারেন? বলে দারোগাবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

—বন্ধু-বান্ধবের কাছে।

—ওঁর বন্ধু কে?

—অনেকে। অনেকেই বাবুর সঙ্গে গল্প করতে আসতেন। বড়লোক—অনেকের সঙ্গেই আলাপ ছিল।

—এঁরা কে?

—ইনি সুরেশবাবু ; আমাদের বাবুর বন্ধু। পেশোয়ারে থাকেন। দিন-কয়েক হলো বেড়াতে এসেছেন। উনি বাবুর আত্মীয়। শিলংয়ে থাকেন।

—আজ সন্ধ্যে থেকে ওঁর মনের অবস্থা কেমন ছিল, জানেন?

—আমি ভাড়া আদায়ে বেরিয়েছিলাম, রাত দশটায় ফিরেছি।

দারোগাবাবু সুরেশের দিকে ফিরে বললেন, আপনার সঙ্গে শেষ কখন দেখা হয়?

—রাত ন'টায়। রাত আটটায় আমরা একসঙ্গে খাই। তারপর একঘণ্টা গল্প করেছিলাম।

—তখন কি ওঁর উদ্বেগের ভাব দেখেছিলেন?

—সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বুঝতে পারিনি। তবে কেমন উন্মনা মনে হচ্ছিল! আগে আমি ওঁকে কখনো এ রকম দেখিনি।

দারোগাবাবু তারপর শরতের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সঙ্গে কখন ওঁর শেষ দেখা হয়েছিল?

—রাত সাড়ে দশটায়।

—আপনার কি অনুমান হয়েছিল, অথবা ওঁর সঙ্গে কথায়-বার্তায় কি বুঝতে পেরেছিলেন যে, উনি জানেন ওঁর জীবননাশ হতে পারে?

—তখন যে রকম দেখেছিলাম, তাতে সে-ধারণা করতে পারিনি বটে, তবে এখনকার অবস্থা দেখে বলা যেতে পারে, উনি এই রকমই আশঙ্কা করেছিলেন।

—হুঁ। দারোগাবাবু একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারপর আবার বললেন, বলুন তো শরৎবাবু, ওঁর সঙ্গে আপনার কতদিন অন্তর দেখা হয়?

—ঠিক নেই, মাসে, দু'-একবার তো বটেই! কারবারের কাজে আমাকে প্রায়ই আসতে হয়।

—উনি কি বরাবরই এই রকম অস্থির ছিলেন?

—না। সুরেশবাবু যা বলেছেন, তা ঠিক। উনি আগে এরকম ছিলেন না।

—আচ্ছা, কবে থেকে আপনি তাঁকে এরকম দেখেছিলেন?

—তা মাস-দুই হবে। মধ্য-প্রদেশের এক শহরে একটা খুন হবার পরেই ওঁকে কেমন একটু বিচলিত দেখেছি!

—কি রকম? সে আবার কি? দারোগাবাবুর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো।

—সেখানে উনি গিয়েছিলেন বেড়াতে। তখন ওঁর এক বন্ধুকে একজন খুন করে। বন্ধুটির নাম ছিল হরিশ সমাদ্দার। সমাদ্দার যে হোটেলে ছিল, সেই হোটেলে উনিও গিয়ে উঠেছিলেন।

—তারপর?

—সমাদ্দারকে একজন সাহেববেশী বাঙালী গুলি করে। যে লোকটা তাকে গুলি করে, তার নাম উপেন চন্দ্র। তার সঙ্গেও ওঁর পরিচয় ছিল। উপেন ধরা পড়ে, কিন্তু কি করে যেন হাজত থেকে পালিয়ে যায়! এ খবর কি আপনি জানেন না?

—বলে যান।

—উপেন তো আর ধরা পড়েনি! বলে শরৎবাবু চুপ করলেন।

দারোগাবাবু তাঁর দিকে আর একবার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, ওঁর কোনও শত্রু ছিল, এমন কথা কোনও দিন বলেছেন?

—না। মনে পড়ে না।

—আচ্ছা, উনি বিয়ে করেননি কেন?

—জানি না।

দারোগাবাবু তারপর সুরেশকে বললেন, আপনি কি প্রায়ই ওঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন?

—না, সে সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। কেননা, আমি থাকি ভারতের এক প্রান্তে ; ছুটি বড় একটা পাই-ই না। আর ও নিজেই আমার ওখানে যেত, হয়তো বছরে একবার!

দারোগাবাবু চুপ করলেন। তার একটু পরেই বললেন, আপাতত আপনাদের আর দরকার নেই। তবে চাকর-বাকররা কেউ যেন কোথাও যায় না, পরে সকলকে আবার দরকার হতে পারে। আপনারা এখন বাইরে যান। আমি ঘরখানা ভাল করে পরীক্ষা করবো।

সকলে বার হয়ে গেল। দারোগাবাবু পরীক্ষা করতে লাগলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে রইলো কনস্টেবল।

দারোগাবাবু দেখতে লাগলেন। আরাম-চেয়ারের পাশে একখানি ছোট টেবিলের ওপর একখানি বই খোলা পড়ে আছে। বোঝা যাচ্ছে, অমল বইখানি পড়ছিল। খোলা জানলাটার দিকে সে পেছন ফিরে বসেছিল। খুনিটা হয়তো সোজা ঘরে ঢুকেছে। সে ঢুকতেই অমল বইটি নামিয়ে রেখে খুনিটার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কপাল লক্ষ্য করে গুলি করেছে। গুলি লাগতেই কার্পেটের ওপর ওইভাবে, যেমন করে আছে—সেই রকম করে পড়ে গেছে। পিস্তলের আওয়াজ হয়ত বাজ পড়ার শব্দে গেছে ডুবে। ঘটনাটা খুব সহজ নয়। এর ভেতর কিছু একটা আছে। খুনিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে একটা কনস্টেবলকে ডেকে বললেন, আচ্ছা, দেখ তো এঁর পকেটে কি আছে?

কনস্টেবলটা এগিয়ে এসে অমলের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার পোশাক তল্লাস করতে লাগলো।

জামার পকেট হাতড়ে প্রথমেই পেল একখানি রুমাল, দুটো চুরুট ও এক বাক্স দেয়াশলাই। তারপর আর এক পকেটে পেল এক গোছা চাবি ও খানকয়েক নোট, আধুলি, সিকি, আনি।

পরক্ষণেই আবার প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে একটা জিনিস টেনে বার করেই বলে উঠলো, ই ক্যায়া?

দারোগাবাবু দেখলেন একটি রিভলবার। তিনি সেটা কনস্টেবলটার হাত থেকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, তার ছ'টি খোপেই ছোট গুলি ভরা।

—হুঁ। দেখা যাচ্ছে, এরকম কিছু একটা হবে তা উনি বুঝতে পেরেছিলেন। তবে রিভলবারটা ব্যবহার করার সময় পাননি। আচ্ছা, আর কি আছে?

আর এক পকেটে ছিল কতকগুলো চিঠি। দারোগাবাবু চিঠিগুলো কনস্টেবলের হাত থেকে নিয়ে আলোয় পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপরই বলে উঠলেন, আরে! পাওয়া গেছে! এই যে একখানা টাইপ-করা চিঠি। এতেই খুনি কে, কেন খুন

করেছে, তা পাওয়া যাবে। আমাদের গোয়েন্দা-বিভাগের খোরাক। খাসা!

তিনি কাগজখানি পড়ে সাবধানে ভাঁজ করে চিঠিগুলো একখানি খামে পুরে পকেটে রাখলেন, এবং ঘরখানি আরও কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে বেরিয়ে গেলেন।

বেশ কিছু দিন পর।

ভোরের দিকে তারা তখন মোটরে ফিরছে, মুখার্জি জিজ্ঞেস করলেন, শরৎই যে খুনী, এটা কি করে ধরতে পেরেছিলেন মিঃ গুপ্ত?

—আপনার কথার উত্তর দেবার আগে একটা কাজের ফয়সালা করা যাক। চন্দ্রের কি হবে? আপনি নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে আর মামলা চালাবেন না?

—না। শরৎ রায়ই সে-পথ বন্ধ করে দিল। মিঃ শুক্লও বোধহয় আর এগোবেন না?

—এগোবার উপায় নেই।

গুপ্ত বললে, মিঃ মুখার্জি, এবার আপনার প্রশ্নের উত্তর দি। যখন খবর পাই, শরৎ রায়কে কে গুলি করেছে, তখনই আমার সন্দেহ হয় এটা ওর সাজানো। এর জামার হাতায় যে-লোকটা গুলি করেছিল, সে ওর ঐ ওলি মহম্মদ। আপনি জানেন না, কিন্তু আমি ওর ঘর থেকে রায়ের পিস্তলটা সরিয়েছি। তাতে গুলি চালাবার চিহ্নও আছে।

—কি বলছেন?

—আজই আপনাকে দেখাবো। আর ওর সেই ড্রাইভারটাও সরে পড়েছে আপনার সহকারীর চোখে ধুলো দিয়ে। শরৎ রায়ই যে মাকড়শা, এটা আমি আবিষ্কার করি তখনই। ওর ওপর আমার কড়া নজর ছিল। ও থানায় খবর দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল সত্যি ; কিন্তু যেখানে এসেছিল, সেখান থেকে আমারই লোক টেলিফোন করেছিল। সে ছিল ওর পিছু-পিছু। লোকটা ছিল ভারী চালাক। কতবার আমার চোখে ধুলো দিয়েছে!

—যাক্, আজ একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারবো।

—এখনও নয়। আগে বড়কর্তার কাছ থেকে চন্দ্র-সম্বন্ধে অভয় নিতে হবে, তারপর।

শুক্ল বললে, আমার মনে শান্তি এসেছে। অবার হাল্কা মনে দেশে ফিরে যেতে পারি।

—আমার রবিবারে পার্টিতে যোগ দেবার পর যাবেন-তার আগে নয়।

শুক্ল হাসতে-হাসতে বললে, আচ্ছা।

গোবিন্দদার গোয়েন্দাগিরি

সুনির্মল বসু

সেদিন ভোরবেলা শহরের সমস্ত দৈনিক খবরের কাগজগুলিতে এই সংবাদটি বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল।

পাঁচশত টাকা পুরস্কার

বাগবাজারের গলিতে কে বা কাহারা একটি অজ্ঞাত বাঙালি যুবককে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছে। হত্যাকারীর সন্ধান যে দিতে পারিবে, তাহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

এই ঘোষণাটি পড়ে আমাদের গোবিন্দদা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। গোবিন্দদাকে তোমরা চেন না? ওই যে যিনি ঘুঁটের ব্যবসা করে এক সময়ে বিস্তর টাকা উপার্জন করেছেন, যাঁর অব্যর্থ ছারপোকা-বিধ্বংসী পাচন এক সময় সারা বাংলায় হুলুস্থূল লাগিয়ে দিয়েছিল!

ছারপোকা-বিধ্বংসী পাচন! তোমরা যে অবাক হয়ে যাচ্ছ! তোমাদের অবাক হয়ে যাবার কথাই তো! তখন তোমরা নেহাত ছেলেমানুষ, জানবেই বা কেমন করে?

ছোট্ট ছোট্ট লাল শিশিতে নীল রঙের তরল ওষুধ, তার সঙ্গে ব্যবস্থাপত্র থাকত।

ব্যবস্থাপত্রে ছাপার অক্ষরে লেখা থাকত—অতি সাবধানে ছারপোকা ধরিয়া, তাহাকে হাঁ করাইয়া এই অভ্যর্থ পাচন এক ফোঁটা মুখে দিয়া দিবেন! খুব সাবধান, দেখিবেন পাচন খাওয়াইবার আগে যেন ছারপোকা মরিয়া না যায়! এই পাচন কার্যকরী না হইলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরত দিব।

এই পাচন এখন আর পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলে অবশ্যই তোমরা এক-এক শিশি নিয়ে পরীক্ষা করতে পারতে!

তারপর গোবিন্দদার ভুঁড়ি-সংহারী মালিশ এক অদ্ভুত আবিস্কার। যত বিপুল ভূঁড়িই হোক না কেন—এই মালিশের গুণে একদম আমসত্ত্বের মত চুপসে যেত! ভূঁড়িতে মালিশ লাগাবার পর পনেরো দিন মাত্র উপোসের ব্যবস্থা—তারপরেই ব্যস, হাতে হাতে ফল! সে ওষুধও আজকাল আর বাজারে নাই।

যাক্— গোবিন্দদা এখন ওসব আবিস্কারের পথ ছেড়ে দিয়ে সখের গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করেছেন। এমন উর্বর মস্তিষ্ক—তিনি আর ছোটখাটো কাজে নষ্ট করতে রাজী নন। এই তো সেদিন একটা ডাকাতের দল ধরে ফেলেছিলেন আর কি! অবশ্য জানা গেল, সেটা ডাকাতের দল নয়, সেটা—কংসহারী যাত্রা-পার্টি।

এরকম ভুল অনেক বড় বড় গোয়েন্দারও হতে পারে। গভীর রাতে একদল লোক মুখে রং-চং মেখে ঢাল-তলোয়ার ছোরা-ছুরি নিয়ে যদি কোথাও যায়, কে-না তাদের ডাকাতের দল বলে মনে করে? গোবিন্দদারও তাই ভুল হয়েছিল। কিন্তু ভুল তো নাও হতে পারত! কংসহারী যাত্রাপার্টি না হয়ে, হয়তো ধ্বংসকারী ডাকাতের দলও হতে পারত!

আর একবার একটা টুকরো চিঠির অংশ কুড়িয়ে পেয়ে গোবিন্দদা একটা হত্যার ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছিলেন আর কি! চিঠির টুকরোতে লেখা ছিল—

আজ রাত্রেই সাবাড় করতে হবে। না হলে...

তারপর অবশ্য চিঠির অপর অংশও পাওয়া গেল-সে দুটো অংশ জুড়লে দাঁড়ায় ঃ প্রিয়নাথ,

বরিশাল থেকে যে রসগোল্লা এসেছে সেগুলো আজ রাত্রেই সাবাড় করতে হবে। নাহলে পচে যাবার বিশেষ সম্ভাবনা। তুমি নিশ্চয়ই এসো। ইতি,

সুধীন।

গোবিন্দদা সেদিন ষড়যন্ত্র ধরতে গিয়ে খুব একচোট রসগোল্লা খেয়ে এসেছেন,—এতে তাঁর লাভ-বই লোকসান কিছু হয় নাই।

যাক্, এইবার তোমাদের আসল গল্পটা বলি।

সেদিনকার খবরের কাগজে হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে গোবিন্দদা মনে মনে ঠিক করলেন, তিনি গোপনে এই ব্যাপারে তদন্ত করে পুলিশকে সাহায্য করবেন। ফাঁকতালে যদি পাঁচশো টাকা লাভ করা যায়, তা এই মাগ্যির বাজারে মন্দ কি! আর টাকা না পেলেই বা কি, খবরের কাগজে যখন বড় বড় করে গোবিন্দদার বাহাদুরীর খবর বেরুবে—তখন...গোবিন্দদাকে আর পায় কে?

সেদিন রাত্রি বারোটায় গোবিন্দদা বাসে চড়ে কালীঘাট থেকে শ্যামবাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। অত রাত্রে বাসে বেশি কেউ ছিল না। ঠিক সামনের আসনে দুজন ভদ্রলোক আর ঠিক তার পিছনে বসে গোবিন্দদা।

বাঙালী দু'জনের মধ্যে একজনের খুব রোগা ছিপছিপে চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল, চোখে কালো চশমা, আর একজনের বেশ বলিষ্ঠ দোহারা চেহারা!

ফাঁকা রাস্তায় বাস হু-হু করে ছুটে চলেছে। গোবিন্দদা অন্যমনস্ক—সেই হত্যা-রহস্যের এখন পর্যন্ত কোন কুলকিনারা পান নাই।

হঠাৎ তার মনে হলো সেই রোগা লোকটি তার সঙ্গীকে বলছে,—গোবর্ধনকে মেরে ফেল্লাম।

সঙ্গী প্রশ্ন করল, কী করে?

বিষ খাইয়ে। এই পর্যন্ত, ব্যস্!—গোবিন্দদার চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল, আগুনের মতো গরম নিশ্বাস পড়তে লাগল,— ওঃ একেবারে হাতে হাতে ধরা পড়েছে! পাছে কোন রকম সন্দেহ করে—তাই গোবিন্দদা মনের ভাব যথাসম্ভব গোপন রেখে লোক দুটোর উপর কড়া নজর রাখতে লাগলেন। আজ আর ছাড়াছাড়ি নাই কিছুতেই।

বাগবাজারের মোড়ে লোক দুটো নামল।—হ্যাঁ—এই বাগবাজারের কোনও গলিতেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। তোমরা ঘোরো ডালে ডালে, গোবিন্দদা ঘোরেন পাতায় পাতায়!

গোবিন্দদা বাঁদিকে নেমে চুপে চুপে খুনি লোকটিকে অনুসরণ করে চললেন। বাড়িটা জেনে এক্ষুণি পুলিশে খবর দিতে হবে।

ওই যে বাড়ি, গ্যাসের আলোতে বাড়ির নম্বরটা বেশ পড়া যাচ্ছে—১৫ নম্বর। আচ্ছা দাঁড়াও।

গোবিন্দদা পুলিশে ফোন করলেন—হ্যালো, শিগ্‌গির আসুন, হত্যাকারীকে ধরেছি, ঠিকানা ১৫ নং—স্ট্রিট, আমি বাড়ির সামনেই অপেক্ষা করছি।

পুলিশ এল, গোবিন্দদা সেই রোগা লোকটিকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এই আসামি। তারপরের দিনের ঘটনা। গোবিন্দদা মুখ চুন করে বাড়ি এলেন। তিনি আমাদের কিছু বললেন না বটে, তবে আমরা খবর পেলাম গোবিন্দদা হত্যাকারী সন্দেহ করে একজন উদীয়মান সাহিত্যিককে ধরেছিলেন।

সাহিত্যিক বেচারীর একটি উপন্যাস সাময়িক একটা কাগজে প্রতি সপ্তাহে বের হচ্ছিল। সেই উপন্যাসের নায়ক হচ্ছে গোবর্ধন। সেই গোবর্ধন বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে—পরের সংখ্যায় এই বিষয়টি বেরুবে—তাই সাহিত্যিক বায়োস্কোপ দেখে ফিরবার পথে সেই কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে এই সম্বন্ধেই আলোচনা করছিলেন। গোবিন্দদা অতটা বুঝতে পারেননি।

তা গোবিন্দদার আর কি দোষ? ভুল তে সকলেরই হয়।

রহস্যের সন্ধানে

আশাপূর্ণা দেবী

বাবার নতুন কেনা এই পুরনো বাড়ীটায় এসে বাসুর ভারী স্ফূর্তি। এটা মোটেই তাদের রেলকোয়ার্টারের বাড়ীর মতো ঝাড়-ঝাপটা হালকা-পাতলা নয়। বেশ কেমন ভারীভুরি, আর আলো-অন্ধকারে মেশানো। জায়গায় জায়গায় কেমন লুকোচুরি খেলার মত হঠাৎ সরু একটা প্যাসজ, হঠাৎ তার গা দিয়ে ছোট্ট একটা কোনাচে ঘর, সিঁড়ির চাতাল দিয়ে বেরিয়ে পড়ে আচমকা একটা বারান্দা। আর সব থেকে মজা-ঘরে দালান এখানে-সেখানে এক একটা দেওয়াল আলমারি। ছোট বড় নানান মাপের।

পুরনো পুরনো সেই আলমারিগুলো খুললেই কেমন একটা চাপা চাপা ভ্যাপসা ভ্যাপসা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, বাসুর দারুণ ভালো লাগে। যেন এর মধ্যে কি একটা রহস্য লুকিয়ে ছিল, আগের মালিকরা সেটা নিয়ে চলে গেছে। ভিতরের দেওয়ালগুলো তাই বোবা মুখ করে ক্ষুণ্ণ হয়ে বসে আছে।

একটা আলমারির তাকের মধ্যেও খানিকটা কালির ছিটে, কেমন একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ। তার মানে এটায় ওরা সব কিছু রাখতো। দালানের তাকগুলোয় যে বই রাখতো সেটা তার মেঝের দাগ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ভাঁড়ার ঘরের দেয়ালের

কুলুঙ্গিতে নির্ঘাৎ কোনো ঠাকুরের মূর্তি থাকতো। তা নইলে কুলুঙ্গির মাথায় ধূপের ধোঁয়ার দাগ কেন?

বাসু এই সব ঘুরে ঘুরে দেখে আর বলে, বাসুর দিদি হাসে। আর কিনা মাকে ডেকে ডেকে বলে, 'মা, তোমার পুত্তুরটি ভবিষ্যতে ডিটেকটিভ হবে যা অবজারভেশান। আর যা অনুমানশক্তি।'

বাসু অবশ্য তাতে দমে না, চিরদিনই তো বাসুকে 'ডাউন' করাই দিদির জীবনের মূল লক্ষ্য। তাই দিদির কথায় কান না দিয়ে বাসু অভিযান চালিয়ে যায়। সেকেলে পুরনো বাড়ি, দু'দিকে দেয়াল দেয়া চাপা সিঁড়ি, তাই সিঁড়ির তলাটা অন্ধকার ঘুটঘুটে। মা বলেন, 'আগের দিনে লোকে এই ঘরটাকে চোরা-কুঠুরি বলত।'

বাসু বলল, 'আগের দিনে যদি বলতো.....তা'হলে এখন বললেই বা দোষ কি? মা হেসে ফেলে বললেন, 'চোরা-কুঠুরি, চিলেকোঠা, কথাগুলো যেন বড্ড সেকেলে। আমার ঠাকুমা-দিদিমারা বলতেন।'

বাসু গম্ভীরভাবে বলল, 'তোমার ঠাকুমার ঠাকুমা তাঁর ঠাকুমা তাঁরও ঠাকুমা তো ভাতকে ভাত বলতেন, তুমিও তাই বল কেন?

কিছুই হাসির কথা বলেনি বাসু, তবু বাসুর কথা নিয়ে বাড়ি সুদ্ধ সকলের সে কী হাসির ধুম। 'ওরে বাবা ছেলের কি লজিকের জ্ঞান।...ওঃ বাসু কালে উকিল হবে।' এই সব বাজে বাজে কথা থাক, কথাকে বাসু কেয়ার করে না। তার বাংলার মাস্টারমশাই বলেন, 'কারো সমালোচনায় লজ্জা পেয়ে কোনো কাজে পিছিয়ে যাওয়া ভীরুর লক্ষণ। লোকের কথায় ভয় পেলে মহৎ কাজ হয়?'

কাজেই বাসু ওই সব ঠাট্টা ফাট্টায় লজ্জা না পেয়ে এই বাড়িটার রহস্য আবিস্কারের মহৎ ব্রত নিয়ে খেটে যাচ্ছে। বাসু 'ছোটদের গোয়েন্দা গোকুল সেন' বইটা পড়েছে। একটা ভীষণ পুরনো জমিদার বাড়ী ভাঙা হতে দেখা গেল তার কড়িকাঠের খাঁজে খাঁজে চোরা কুলুঙ্গি, আর তার মধ্যে রাশি রাশি সোনা।

এই বাড়িটার কড়িকাঠগুলোও ভারী ভারী আর যেন ঝুলে পড়া। কে বলতে পারে ওর অন্তরালে তেমন চোরা কুলুঙ্গি আছে কি না। ঘাড় উঁচু করে হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বাসু, কোনখানে সন্দেহজনক কিছু দেখা যাচ্ছে কিনা। — কিন্তু দেখা গেলেই বা কি? বাসু নিজে তো আর মইয়ে উঠে পরীক্ষা করে দেখতে পারবে না। আর বড়দের বললে? তারা তো হাসির তোড়েই বাসুকে উড়িয়ে দেবেন।...

কিন্তু এখন?

এখন কি হলো?

এখন সকলের মুখ হাঁ, চোখ ছানাবড়া, আর নাক রসপুলির মত হয়ে গেল কি না?

সিঁড়ির তলার ওই চোরা-কুঠুরির দেওয়ালে একটা চোরা আলমারি আবিস্কার করে ফেলেনি বাসু?

এখানে যে আগের লোকেরা ডাঁই করে কয়লা ঢেলে রাখতো তার স্মৃতিচিহ্ন এখনো জ্বলজ্বলাট, এমন কি কয়লার চাঁইও কিছু কিছু ছিল। কিন্তু বাসুর মত অবজারভেশন শক্তি না থাকলে কি কেউ ধরতে পারত ওই কয়লা-মাখা দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট্ট কাটা খাঁজ আছে। আর তার মধ্যে একটা ক্যাশবাক্স বসানো আছে। কয়লা ঢালা জায়গায় এমনিতে কারোর চোখই পড়ত না, বাসু কয়লার চাঁইগুলো সরিয়ে দেখেছিল বলেই না—হঠাৎ বাক্স দেখেই বাসুর হাত-পা ঠাণ্ডা।

অথচ উল্লাসও আছে।

তাই কাঁপা-কাঁপা চেঁচিয়ে সেই দিদিকেই ডেকে ওঠে-যে দিদির জীবনের লক্ষ্য বাসুকে ডাউন করা।....কিন্তু উপায় কি? দিদি ছাড়া বাসুর সুখ-দুঃখের ভাগীদার হতে আসছে কে?

বাসুর 'দিদি' ডাক শুনেই দিদি দুদ্দাড়িয়ে নেমে আসতে-আসতে বললো, 'হলোটা কি? বিছে কামড়েছে নিশ্চয়। কামড়াবেই তো। খেলবার আর জায়গা পায়নি।'

কিন্তু দিদি এসে থমকে দাঁড়ালো। বাসু দিব্যি জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে, তবে বাসুর চোখ দুটো গোল আলুর মত। আর মাথার চুল সজারুর কাঁটার মতো।

দিদি আসতেই বাসু নীরবে শুধু আঙুল বাড়িয়ে দেখালো।

'কি ও?'

'দেখ্ না।'

'বাক্স!'

'হুঁ!'

'কিসের বাক্স?'

'ভগবান জানেন।'

'এই, 'টাকাকড়ি লুকানো নেই তো? যারা ছিল, যাবার সময় হয়তো ভুলে গেছে।'

বাসু গম্ভীরভাবে বলে, 'টাকাকড়ি কেউ ভুলে যায়? হয়তো বাড়িতে আগুন লেগেছিল, তাই তাড়াতাড়ি—'

'দূর, আগুন লাগলে তো পরে আবার ফিরে আসবে। তাছাড়া কই, কোথায় আগুন লেগেছিল, বাড়িতে তো দাগ নেই।'

'দিদি, তাহলে বোধহয় ভূমিকম্প!'

'মোটেই না, তাতেও পরে চলে আসবে লোকে।'

'তবে বোধহয় ডাকাত পড়েছিল দিদি। ওরা ভয়ে পালিয়ে গেছে। আর কখনো আসেনি।'

দিদি বলে, 'তা হতে পারে। কিন্তু ডাকাতরা কি তন্ন তন্ন করে না দেখে ছাড়তো? ওরা তো শুনেছি বালিশ ছিঁড়ে তুলো বার করে দেখে—'

'দিদি ঠিক হয়েছে। যে রেখেছিল, সে বোধ হয় হঠাৎ মরে গেছে কাউকে বলে যেতে পারেনি।'

দিদি মহোল্লাসে বলে, 'ঠিক, ঠিক বলেছিস। তোর বুদ্ধি হ্যাজ।'

এই প্রথম দিদি বাসুর বুদ্ধির তারিফ করলো।

কিন্তু বাক্সটা টানা যায় কি করে?

খাঁজের মধ্যে যা আঁটা। বাসুর অসাধ্য।

'দিদি, তুই পারবি?' 'উহুঁ আমার বাবা ভয় করছে দিদি, পিছনে সাপ টাপ যদি থাকে।' 'তবে? তবে কি বৃন্দাবনকে ডেকে আনবো? ওর গায়ে তো খুব জোর।'

দিদি আস্তে বলে—'এই, চুপ। চেঁচাস না। যদি অনেক সোনা টোনা থাকে, বৃন্দাবন সবাইকে বলে বেড়াবে—'

'তাহলে মাকে ডাকি?' বললো বাসু। দিদি হেসে ওঠে, 'আহা রে মার গায়ে কী জোর।'

'তাহলে ছোটকা ছাড়া কোন গতি নেই।'

'ছোটকা।'

ছোটকা মানেই তো সব চাঁটি খাওয়া, তবু উপায় কি?

বাক্সটাকে তো টেনে বার করতে হবে। ছুটির দুপুরে বাবা নিদ্রামগ্ন, কাকা বইমগ্ন, বাসু গিয়ে বলে,

'ছোটকা, আবিস্কার।'

'আবিস্কার তো—'

ছোটকা হেসে উঠে বলে, 'কি? ব্যাঙাচির মধ্যে বৃহৎ বিশ্বের, ছায়া।'

'আঃ কেবল বাজে কথা, দেখাব চলো চোরা কুঠুরিতে বাক্স।'

'বাক্স? কার বাক্স?'

'বাড়িটা যাদের ছিল তাদেরই নিশ্চয়ই।'

'কিসের বাক্স?'

'আঃ। তুমি চলোই না—'কাকার হাত ধরে টান মারে বাসু।

অগত্যাই যেতে হয় কাকাকে।

গিয়েই কাকার মুখ গম্ভীর। 'খবরদার কেউ হাত দিয়ো না। বাবাকে ডাকো।' দিদি ভয় পেয়ে ছুটে চলে যায় বাবাকে ডাকতে। কিরে বাবা, ভৌতিক বাক্স? না কি সাপ খোপ আছে?

বাবা আসেন, মা আসেন এবং তারা বিজবিজ করে বলাবলি করতে থাকেন, তার থেকে এইটুকু বুঝতে পারে বাসু এই বাক্সয় কারো হাত দেওয়া হবে না। পুলিশকে খবর দিতে হবে। তারা নিয়ে গিয়ে থানায় জমা দেবে।

শুনে বাসু প্রায় ভ্যাঁ করে কেঁদেই ফেলে। এত কষ্টের আবিস্কার বাসুর, পুলিশ

নিয়ে গিয়ে থানায় জমা দেবে? বাসুরা নিজে মজা করে খুলে দেখতে পারবে না? 'কেন?' ওরা কি চোর?

কাকা বলে, 'এখন চোর নই, কিন্তু ওই পরে বাক্সর মালটি নিতে গেলেই চোর হয়ে যাবো, আইন হচ্ছে এ রকম—গুপ্তধন পেলে তা পুলিশের হাতে তুলে দিতে হয়।'

আর কী করা।

বাবা থানায় ফোন করেন। পুলিশ আসে জনা তিনেক। তারা অন্ধকারে হেঁট হয়ে টর্চ জ্বেলে ব্যাপারটা দেখে নেয়, তারপর জেরা করতে থাকে। কবে কেনা হয়েছে এ বাড়ী? কার কাছ থেকে? তারা কোথায় থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে বহু পুরানো বাড়ীওয়ালা মাদ্রাজে চলে গেছে শুনে নাক কুঁচকে হ্যাঁচ করে এক টান মেরে বাক্সটাকে বার করে আলোয় নিয়ে এল। টানের চোটে দেওয়ালের বালি চাপড়া খসে পড়ল খানিকটা। দিদি ফিসফিস করে বললে, 'এই বাসু, বাবাকে বলনা—ওরা নিয়ে যাবার আগে অন্ততঃ আমাদের দেখিয়ে যাক।'

বাসু বেজার মুখ করে বললে, 'দেখিয়ে আর কি হবে! যা আছে তা তো নিয়েই চলে যাবে। আশ্চর্য! ছোটকার এই নিষ্ঠুরতার কোনো মানে হয়?'

তা' বাসুকে আর বলতে হয় না, দেখা যায় ওরা খোলবারই চেষ্টা করছে।.....এমনি খুলতে না পেরে বলে, 'চাবি আছে?'

'চাবি? আমরা চাবি কোথায় পাবো?'

ছোটকা বেশ রাগের গলায় বলে, 'বাক্সের হিস্ট্রি জানায়নি আপনাদের?' হুঁ, তা একটা ইঁয়ে টিয়ে কিছু দিন, চাড় দিয়ে খুলে ফেলার মতো—'

শুনে সকলেই উত্তেজিত। এতক্ষণে যেন একটা ঘোরালো রহস্যের সূচনা দেখা দিয়েছে। সকলেই চঞ্চল হয়ে ইঁয়ে টিয়ে খুঁজতে ছোটে।

.....মা নিয়ে আসেন একখানা লম্বা খুন্তি, ছোটকা একখানা ক্ষুদে বাটালি, দিদি একটা পেন্সিল কাটা ছুরি আর বাসু একখানা পুরোনো ব্লেড।

পুলিশ ইন্সপেক্টর ওগুলোর দিকে একটু অবহেলার দৃষ্টিতে তাকিয়ে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করে নিজেই সংগ্রহ করে নেন একখানা কয়লা ভাঙা হাতুড়ি, ঠাঁই করে বসিয়ে দেন ডালার ওপরে। চমকে ওঠে সবাই।

মা বলেন, 'ঠিক জানি না বাবা, ভেতরে ঠাকুর টাকুর নেই তো!' বাবা বললেন, 'মাথা খারাপ, ওইখানে লোকে ঠাকুর রাখতে আসে? চোরাই মাল বলেই মনে হচ্ছে। বোধ হয় বাড়ির কোনো চাকর টাকর নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল, তারপর আর সরাতে সুবিধে পায় নি।' দিদি বলে, 'আমার মনে হচ্ছে কোনো গুপ্তধনের ব্যাপারে ম্যাপট্যাপ আছে। সেই যে গল্পটা মা একদিন বলেছিল, মনে আছে? একটা ছোট্ট ছড়ার মধ্যে গুপ্তধনের ঠিকানা। এমা মনে নেই? সেই যে—

পায়ে ধরে সাধা
রা নাহি দেয় রাধা
শেষে দিল রা
পাগোল ছাড় পা।

তার মানে ওর মধ্যে রয়েছে। 'ধারাগোল! এও হয়তো তেমনি কোনো—'

আর বলতে হলো না, আবার হাতুড়ির প্রচণ্ড ঘা পড়লো ঠাঁই ঠাঁই...সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের ডালা ছিটকে উঠে পড়লো।

আর তারপর?

তারপর পুলিশ সাহেব নিজেই লাফিয়ে ছিটকে উঠলেন।...

অতঃপর আর সবাই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছিটকে একেবারে কে কার ঘাড়ে পড়ে?

সকলের মুখে একই কথা 'এই এই এইরে বাবা! আরে আরে কি সর্বনাশ লম্ফঝম্পর ব্যাপার শুরু হয়ে যায়।

বাক্স খোলা মাত্র ডজন ডজন নেংটি ইঁদুর বেরিয়ে পড়ে ঝুটোপুটি লাগিয়ে দিয়েছে এর পায়ের ওপর দিয়ে ওর পায়ের ওপর দিয়ে।

কে জানে কতকাল ধরে পুত্রপৌত্রাদি সমেত রাজ্য বিস্তার করে ভোগ দখল করে আসছে।

কিন্তু খাচ্ছিল কি? না খেয়ে তো বাঁচতে পারে না। আর বংশের এতো বাড়বাড়ন্ত হতে পারে না। তাছাড়া হাওয়া বাতাসেরও দরকার।....তা দেখা গেল সে ব্যবস্থা ওরা নিজেরাই করে নিয়েছে। ইঁদুর হলেও ওরা মানুষের থেকে কম বুদ্ধিমান নয়। ওদের মধ্যেও ছুতোর মিস্ত্রী আছে, ইঞ্জিনীয়ার আছে, বাক্সের দেওয়ালে দিব্যি দোর, জানালা বানিয়ে নিয়েছে।

আর খাওয়া? দেখা গেল বাক্সের মালিক এদের সাতপুরুষের 'বসে খাওয়ার' ব্যবস্থা করে গেছেন।...এতকাল ধরে খেয়ে দেয়েও এখনো যা রয়েছে তা কম নয়,...কে জানে ওই কুচি কাগজের রাশি কোনো উইলের অথবা দলিলের না কি কোনো গুপ্তধন আবিষ্কারের নকশা,...পুলিশ যদি নিয়ে গিয়ে ফোরেনসিক ল্যাবরেটারিতে দিয়ে দিতো, তা হলে, রহস্য উদ্ঘাটন হতো...কিন্তু পুলিশ প্রভুরা সে দিক দিয়ে গেলেন না। বেজায় বিরক্ত মুখে সকলের দিকে একটু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেলেন।

কল্কে-কাশির কাণ্ড

শিবরাম চক্রবর্তী

প্রফুল্ল গোড়া থেকেই বিষণ্ণ মেরে আছে। হ্যাঁ, ভারি তো কাজ! তার জন্যে আবার কল্কে-কাশিকে তার ল্যাজে বেঁধে দেওয়া! হোন না গে তিনি একজন নামজাদা ডিটেকটিভ, (প্রফুল্ল শুনেছিল কোরিয়া অঞ্চলে কল্কে-কাশির মত অত বড় গোয়েন্দা নাকি আর নেই!) তবু এই সামান্য একটা মশা-মারার ব্যাপারে অমন ভারি কামান কাঁধে বয়ে আনতে প্রফুল্লর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সত্যি, কামস্কাটকা থেকে উনি না এলেও কিছু কাজ আটকাত না।

বোম্বের একটা বিখ্যাত রেস্তোরাঁর এক কোণের টেবিলে কল্কে-কাশির মুখোমুখি বসে গুম হয়ে এইসব কথাই প্রফুল্ল ভাবছিল। সামনে চপ-কাটলেট-ডেভিল-ডিম-কেক-পুডিং-এর সমারোহ সত্ত্বেও তার জিভ সরছিল না। বাস্তবিক, এত বড় অপমান হজম করবার পর খেতে কারু রুচি থাকে?

কিন্তু মিঃ কল্কে-কাশি বেপরোয়া। ডিশের পর ডিশ তিনি সাবড়ে চলেছেন—কাঁটা-চামচের তাঁর কামাই নেই। এর ফাঁকে সামনের ভদ্রলোকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি

পড়ে। একি! কঙ্কে-কাশি একটু অবাকই হন। একজন খুনে একটার পর একটা দশটা খুন করেছে, নিজের চোখেই এরকম দৃশ্য তাঁর জীবনে একাধিক বার তিনি দেখেছেন কিন্তু বিস্মিত হতে পারেননি। কিন্তু এক ভদ্রলোক দশ দশটা প্লেটের সামনে একেবারে নির্বিকার। একদম জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন, একটাকেও কাবু করতে পারছেন না। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনস্মৃতির মধ্যে এবম্বিধ কাণ্ড স্মরণে পড়ে না।

বিস্ময়ের ব্যাপারই বটে। কঙ্কে-কাশির বিরাট বপু-পরিধির তুমুল আন্দোলন (অবশ্য খাবার সময়েই যেটা সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ হয়) অকস্মাৎ থেমে যায়; মাছের চোখের মত ড্যাবড্যাবে চোখ ঈষৎ প্রসারিত হয়। 'প্রফুল্লবাবুর প্রফুল্লতর হবার পক্ষে কী বাধা হচ্ছে, জানতে পারি কি?' তিনি প্রশ্ন করেন।

বাংলাতেই প্রশ্ন করেন। সোজা পরিষ্কার বাংলাতেই। কামস্কাটকার লোক হলে কী হবে! বাংলা, হিন্দি, উড়ে (এবং কোন-কোন জানোয়ারের ভাষাও) কঙ্কে-কাশির ভালভাবেই আয়ত্ত। তবে কামস্কাটকার ভাষায় তাঁর দখল আছে কি না বলা যায় না। এ বিষয়ে প্রফুল্লর সন্দেহ থাকলেও পরীক্ষক হবার তার সাহস নেই। কেননা সে নিজেও কামস্কাশিয়ানে অজ্ঞ, দারুণ অজ্ঞ।

প্রফুল্ল আরও বেশি গম্ভীর হয়ে যায়; মাথা চুলকোতে চুলকোতে উত্তর দেয়, 'ভাবনায়, মশাই ভাবনায়! কীরকম গুরু দায়িত্ব মাথার উপরে, বুঝতেই তো পারছেন।'

'বুঝতে পারছি বইকি।' কঙ্কে-কাশি ঘাড় নাড়েন, 'মিস্টার ব্যানার্জির কবে এসে ভারতবর্ষে পৌঁছবার কথা! অথচ তিনি কি-এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিলেতে আটকে গেছেন। তিনি আসতে পারলেন্নি না। তাঁর সই-করা নমিনেশন পেপার এয়ার মেলে কাল বিকেলে বোম্বে পৌঁচেছে; তাঁর অ্যাটর্নি গলস্টোন কোম্পানির আপিসের জিম্মায় আছে। সেই নমিনেশন পেপার আজই সঙ্গে নিয়ে আমাদের কলকাতাতে ছুটতে হবে। তবেই আঠারো তারিখের আগে সেই নমিনেশন পেপার ফাইল হতে পারবে। আঠারোই হচ্ছে ফাইলিং-এর শেষ দিন। তা না হলে মিস্টার ব্যানার্জির আর কাউন্সিলে যাওয়া হবে না।'

'বিলেতে মিস্টার ব্যানার্জির আকস্মিক দুর্ঘটনার মূলে কি কোনও রহস্যজনক কারণ আছে আপনি আশঙ্কা করেন?' প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করে।

কঙ্কে-কাশি এর জবাব দেন না। 'এই নমিনেশন পেপার ডাকে পাঠানো নিরাপদ নয়। কোন কারণে একদিন কিংবা কয়েক ঘণ্টা লেট হলেই সমস্ত পণ্ড, তার চেয়েও বড় আশঙ্কা হচ্ছে নমিনেশন পেপার মারা যাবার।'

'মারা যাবার?' প্রফুল্লর চোখ প্রকাণ্ড হয়, 'কেন' নমিনেশন পেপার মেরে কার কী লাভ? ওকি মাতব্য জিনিষ?'

'হ্যাঁ, ডাকে পাঠালে, এমনকি রেজেস্ট্রি করে ইনসিওর করে পাঠালেও যথাস্থানে জিনিসটা পৌঁছবে কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্টই সন্দেহ আছে। কার কী লাভ আপনি জিজ্ঞাসা করছেন? বাংলা দেশে দুটি দল আছে আপনি জানেন?'

'উঁহুঁ', প্রফুল্ল বলে, 'জানি না তো।'

'এই দুটি দলই কাউন্সিলে ঢুকতে চায়। দু-দলে ভয়ানক রেষারেষি। কাউন্সিলে যে দল ভারী হতে পারবে তাদেরই সারা বাংলায় আধিপত্য হবে কিনা! একটি দলের নাম হচ্ছে ফ্লু-ফ্লস্ক্ স্-ফ্যান, যারা ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভোগে, রেস খেলে, আর ফ্যানের তলায় হাওয়া খায় তারাই মিলে এই দল গড়েছে ঃ আমেরিকার বিখ্যাত কু-ক্লু ক্ স্-ক্ল্যানের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই, একমাত্র নামের কতকটা সামিল ছাড়া।'

'বটে?' প্রফুল্লর নিশ্বাস পড়ে-কি-পড়ে না। 'আরেকটা দল কারা?'

'মিস্টার ব্যানার্জী হচ্ছেন এই 'ফ্লু-ফ্লক্ স্-ফ্যানের পাণ্ডা। অন্য দলের নাম হচ্ছে 'বাই হুক আর ক্রুক'। এই বাই হুক আর ক্রুক-পার্টির নেতা হচ্ছেন মিস্টার সরকার। যেমন করেই হোক নিজের মতলব সিদ্ধ করতে এঁরা সিদ্ধহস্ত!'

'আপনি কি তাহলে বলতে চান যে সরকারি চালে মিস্টার ব্যানার্জী বিলেতে আটকা পড়েছেন?'

'আপাতত আমি ঐ কোণের লোকটার দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি।' কঙ্কে-কার্শি চোখ টিপে ইশারা করেন।

এতক্ষণে কঙ্কে-কাশির ওপরে প্রফুল্লর কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়েছিল। সত্যি, অনেক খবর রাখেন ভদ্রলোক! এইজন্যে অপর দিক থেকে সহসা 'তুমি' সম্বোধনেও সে অপ্রসন্ন হতে পারে না। কঙ্কে-কাশির ইঙ্গিতের অনুসরণ করে সে।

'ও সে কাটখোট্টা গোছের চেহারা, মাথার চুল ক্রপ-করা, চোখে কুটিল ভঙ্গি, ঐ কোণের ছোট্ট টেবিলে বসে অমলেটের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে, ওকে লক্ষ্য কর। সহজেই বুঝতে পারবে, এরকম ফ্যাশানেবল রেস্তোরাঁয় গতিবিধি ওর স্বভাবসিদ্ধ নয়, কাঁটা চামচের কসরতে এখনো অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। খাদ্যের সঙ্গে কাটাকাটি নয়, হাতাহাতিতেই ও পরিপক্ক। উনি এখানে এসেছেন তোমার অনুসরণ করে।'

'আমার?' প্রফুল্লর বিশ্বাস হয় না, 'তার মানে?'

'একটু কায়দা করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে, চোখ অমলেটের দিকে থাকলেও মনোযোগ ওর আমাদের দিকেই। কলকাতার একটি বিখ্যাত চীজ উনি—ওর মত কৌশলী এবং ভয়লেশহীন ভদ্র-গুণ্ডা আর দুটি আছে কি না সন্দেহ। ওই শ্রেণীর ক্রিমিনাল ব্রেনের আমেরিকায় জোড়া মিলতে পারে, কিন্তু এদেশে

দুর্লভ। মিস্টার ব্যানার্জির পার্টি আমাকে যে তোমার সঙ্গে দিয়েছি, উনিই হচ্ছেন তার একমাত্র কারণ।'

প্রফুল্লর সহজে বাক্যস্ফূর্তি হয় না, সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করে বলে, 'ওর নাম?'

'ওর নাম হচ্ছে, সমাদ্দার, ওরফে সমরেশ ঠাকুর, ওরফে গোপাল হাজরা, ওরফে নটেশ্বর রায়, ওরফে আরো এক ডজন। প্রেসিডেন্সি জেল আর হরিণবাড়ির ফেরতা। আমার সঙ্গে ওর অনেকদিনের পরিচয়,—অনেকটা হৃদ্যতার সম্বন্ধই বলতে পার। এই কারণে আমাকে তোমার সঙ্গে দেখে ও একটু সঙ্কোচ বোধ করছে, নইলে এতক্ষণ তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে দ্বিধা করত না।'

প্রফুল্ল চমকে ওঠে, 'বলেন কী মশাই?'

'ওই রকমই।' কল্কে-কাশি যৎসামান্যই হাসেন! 'সরকারের দল ওকে লাগিয়েছে তোমার পেছনে, ধ্যানার্জির নমিনেশন পেপার নিয়ে তুমি যথাসময়ের আগে যাতে না পৌঁছতে পার সেইজন্যেই। এজন্যে তোমাকে খুন করতেও ও পেছপা হবে না। তবে কৌশলে কাজ উদ্ধার করতেই ও ভালবাসে—খুনোখুনি করার তেমন পক্ষপাতি নয়। এ বিষয়ে একটু সুরুচিই আছে লোকটার।'

প্রফুল্ল আশ্বস্ত হতে পারে না, 'আপনি কেন ওকে অ্যারেস্ট করছেন না তাহলে? গ্রেপ্তার করে ফেলুন! এক্ষুনি।'

'এখন পর্যন্ত ও কোন অপরাধ করেনি, কেবল মনে মনে এঁকেছে মাত্র এবং মনে আঁকার জন্যই যদি গ্রেপ্তার করা শুরু করতে হয়, তাহলে অ্যাতো লোককে ধরতে হয় যে জেলে তার জায়গা কুলোবে কি না সন্দেহ। কেবল মনের মধ্যেকার প্ল্যানের জন্যে কাউকে তো জেলে পোরা যায় না!'

'তাহলে, তাহলে তো ভারি মুস্কিল।' প্রফুল্ল ভীতই হয়; বলে 'আমাকে খুন করে ফেলবে তবে?'

'যদি করেই ফেলে, তখন—হ্যাঁ তখন ওকে ধরে ফেলতে আমার বিলম্ব হবে না, যদি নিতান্তই পালিয়ে না যায়। তবে, সমাদ্দারের সঙ্গে আমার হৃদ্যতারই সম্বন্ধ। আমাকে দেখে অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরেও তোমাকে একেবারে খতম করবে না। ভয় কী তোমার?'

বিশেষ ভরসাও পায় না প্রফুল্ল।

'এই জন্যেই বলছিলাম ভয়ানক গুরু দায়িত্ব তোমার মাথায়। যদি নমিনেশন পেপার নিয়ে আঠারোই এগারোটার মধ্যে কলকাতায় না পৌঁছতে পারো তাহলে ব্যানার্জির আর কাউন্সিলে যাওয়া হল না—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দফাও রফা। মিঃ সরকারের দলেরই একচ্ছত্র আধিপত্য হবে কাউন্সিলে, মন্ত্রিসভা ইত্যাদিও দখল করে বসবেন তাঁরাই। সামান্য একটা সই-করা কাগজের উপর একটা পার্টির

কতখানি নির্ভর করছে ভেবে দ্যাখো। সে যে-সে পার্টি নয়, ফ্লু-ফ্লু-ক্স্‌ফ্যান!'

'অর্থাৎ আপনার ভাষায় যারা ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভোগে, রেস খ্যালে—ইত্যাদি। কিন্তু আমি তো এদের দলের কেউ নই, বিন্দুবিসর্গও জানি না, আমাকে এই মারাত্মক কাজে পাঠাবার মানে?' প্রফুল্ল বিরক্তিই প্রকাশ করে।

'তার মানে তুমি যে-অফিসের কেরানি তার বড়কর্তা ঐ দলের একজন হোমরা-চোমরা। তিনি তো ফ্যানের হাওয়া খান, তাহলেই হল। এসব কাজে অজ্ঞ এবং আনাড়িকে পাঠানোই হচ্ছে যুক্তিযুক্ত। নাড়িজ্ঞানওয়ালা লোক অনায়াসেই অন্য দলের ঘুস খেয়ে—বুঝতেই পারছ! তাছাড়া, ওদের বিশ্বাস আছে। এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ তোমার ওপর দেওয়ায় সেটা প্রমাণ হয় না কি?'

'আমার গায়েও জোর যথেষ্ট!' প্রফুল্ল কোটের হাতা তুলে মাসল কন্ট্রোল করে কঙ্কে-কাশিকে দেখায়, 'সহজে যে কেউ আমার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিতে পারবে তা প্রাণ থাকতে নয়!'

'এস সমাদ্দারের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই'—কঙ্কে-কাশি প্রফুল্লকে আহ্বান করেন, 'কী ছুতোয় যে গায়ে পড়ে তোমার সঙ্গে ভাব জমাবে ভেবে কাহিল হয়ে উঠছে বেচারা!'

'ওর সঙ্গে আলাপ?' দারুণ বিস্মিত হয় প্রফুল্ল, 'বলেন কী?'

'ক্ষতি কী তাতে? গিলে ফেলবে না তোমায়।' কঙ্কে-কাশি প্রফুল্লকে টেনে নিয়েই চলেন, 'এই যে সমাদ্দার! অনেক দিন পরে দেখা, কেমন, ভাল আছ তো?'

সমাদ্দার চমকে ওঠে, 'মিস্টার কঙ্কে-কাশি যে! এখানে এখন এইভাবে আপনাকে দেখতে পাব আশা করিনি।'

আমি কিন্তু আশা করেছিলুম, পরশু সন্ধ্যায় আমাদের বোম্বে মেলে যখন তোমাকে উঠতে দেখলাম।'

'বটে?' সমাদ্দার যেন একটু অপ্রস্তুত হয়, 'আপনারাও তাহলে আজ সকালেই বোম্বে পৌঁচেছেন? উনি আপনার বন্ধু বুঝি?'

'হ্যাঁ, এই একটু আগেই। নেমেই এই রেস্তোরাঁতেই প্রাতরাশের চেষ্টা করছিলাম। এমন সময়ে।—হ্যাঁ, কী জিজ্ঞাসা করছিলে? ইনি? ইনি হচ্ছেন বাবু প্রফুল্লকুমার রায়, কেন যে এঁর বোম্বে আগমন তা তো তোমার ভালমতই জানা আছে।'

'আমার?' সমাদ্দার থতমত খায়, 'না তো! তবে, ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলে বিশেষ আপ্যায়িত হব।'

'তা তো হবেই। হবার কথাই। বেশ, তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আমার বন্ধু প্রফুল্লবাবু, আর ইনি হচ্ছেন সমাদ্দার, আমার বন্ধু। অন্তত আমার শত্রু নন। এর পরিচয় তো টেবিলে বসেই তোমাকে দিয়েছি। প্রফুল্ল তুমি সমাদ্দারকে নমস্কার করলে না? প্রথম পরিচয়ে নমস্কার করাই তো ভদ্র রীতি।

প্রফুল্ল এবং সমাদ্দার বোকার মত পরস্পরকে প্রতিনমস্কার করে। 'সুখী হলাম, প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে আলাপিত হয়ে।' সমাদ্দার বলে।

'হবেই তো।' কঙ্কে-কাশি যোগ করেন, 'নিশ্চয়! এইজন্যেই কি কলিকাতা থেকে এতটা পথ তোমাকে আসতে হয় নি? বল। ভাগ্যিস আমি ছিলাম এখানে! বন্ধু-বান্ধবের উপকার করতে কখনই আমি পেছপা নই বলেই তোমাদের আলাপ করিয়ে দিলাম।'

'সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ মিঃ কঙ্কে-কাশি!' সমাদ্দার বিস্ময়ের ভান করে, 'কিন্তু আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'সত্যি বলছ?' কঙ্কে-কাশি আকাশ থেকে পড়েন, 'আমার সঙ্গে তুমি জোচ্চুরি করবে বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।'

'সত্যি, আপনার কথায় কিছু বুঝতে পারছি না। এখানকার একটা ফিল্‌ম্ স্টুডিয়োয় চাকরির চেষ্টাতেই আমার বোম্বে আসা।'

'তাই নাকি? তবু তোমাকে বলে রাখছি, যদি তোমার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে তাহলে আমার কথাগুলো কাজে লাগবে। এখান থেকে প্রফুল্লবাবু যাবেন গলস্টোন কোম্পানির অফিসে, সেখানে তাঁর কি কাজ আছে। আমি অবশ্য ওঁর সঙ্গে যাচ্ছি না। আরেকটা জরুরি খবর আমরা উঠেছি তাজমহল হোটেলে। তারপর আজ রাত্রের গাড়িতেই আমরা ফিরছি কলকাতায়। আচ্ছা এখন আসা যাক, হোটেলেই আমাদের আবার সাক্ষাৎ হচ্ছে আশা করি।

হতভম্ব সমাদ্দারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দু-জনে বেরিয়ে আসে। প্রফুল্ল অসন্তোষ প্রকাশ করে—'মিস্টার কঙ্কে-কাশি। আপনি একজন বড় গোয়েন্দা হতে পারেন—'

'উঁহু উঁহু! আদৌ না। এই বরাতের জোরেই যা করে খাচ্ছি!'

'কিন্তু আপনি কি অনেক গুপ্ত সংবাদ ওকে দিলেন না?'

'কাকে? সমাদ্দারকে?' কঙ্কে-কাশি অবাক হন, 'কী রকম?'

'এই—অফিসে গলস্টোন অফিসে যাবার খবর? এবং তাজমহল হোটেলে ওঠার কথা। তারপর আজ রাত্রেই কলকাতা-মেলে ফেরা—'

কেন, কী হয়েছে তাতে? ওর কত কষ্ট, কাজ পাকা হয়ে গেল! বেচারাকে এসব খুঁজে বের করতে আর হাঙ্গামা পোহাতে হবে না।'

'সেটা কি ভাল হল?' প্রফুল্ল বিরক্তি চাপতে পারে না।

'আহা, বুঝতে পারছ না? যতই ওকে কম হাঙ্গামা পোহাতে হবে, ততই বেশি ও ভাববার সময় পাবে। আর যতই ও ভাবতে পারবে ততই নিজের কাজ মাটি করবে তা জান?'

অতঃপর প্রফুল্ল কঙ্কে-কাশির কাছে বিদায় নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসে।

একটার পরেই আরেকখানা ট্যাক্সি প্রফুল্লর গাড়ির পিছু নেয়—এই ট্যাক্সি সমাদ্দারের। পরমুহূর্তেই আরো একখানা গাড়ি দূর থেকে দু-জনের অনুসরণ করে চলে—এ গাড়িতে আর কেউ নয়, স্বয়ং শ্রীযুক্ত কঙ্কে-কাশি মহাশয়।

তিনখানি গাড়িই অনেক ঘুরে-ফিরে শহরের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হয় চারধারে বাগান ঘেরা প্রকাণ্ড এক বাড়ির ফটকে। গলস্টোন কোম্পানির বড়সাহেবের রেসিডেন্স। প্রফুল্লর গাড়ি ফটকের ভিতরে ঢোকে! একটু দূরে সমাদ্দারের গাড়ি থামে—কঙ্কে-কাশির গাড়ি দ্বিতীয় গাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে অকস্মাৎ যেন থেমে যায়।

'সমাদ্দার মশাইকে এখানে এ অবস্থায় দেখব আশা করতে পারিনি!' কঙ্কে-কাশি বলেন। তাঁর মুচকি হাসিটিও লক্ষ্য করবার।

'এই একটু শহর দেখতে বেরিয়েছি।' সমাদ্দার থতমত খায়, 'হাওয়া খেতেও বটে?'

'শহর দেখতে বাইরে? মন্দ নয়! ফিল্‌ম্ আর্টিস্টের কাজটা তোমার পাকা তাহলে?' কঙ্কে-কাশি গলা পরিষ্কার করেন, 'আমি তাই আন্দাজ করছিলাম, যাচাই করে নিতেই এতদূর আসা। যাক, আমার কাজ আছে। শহরেই আমি ফিরলাম।' তারপর একটু থামেন, 'হ্যাঁ, হয়ত তোমার জানাই আছে, তবু খবরটা তোমাকে দিয়ে রাখাই ভাল! ঐ বাড়িটাই মিঃ গলস্টোনের—ব্যানার্জির নমিনেশনের কাগজপত্র আনতে প্রফুল্লবাবু ওখানেই গেছেন। দ্যাখো চেষ্টা করে যদি তোমার বরাত খুলে যায়! বন্ধু-বান্ধবের শুভাকাঙ্খা করাই আমার দস্তুর, জানই তো!'

কঙ্কেকাশি গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নেন। যেপথে এসেছিলেন সেই দিকেই ফিরে চলে। সমাদ্দার কোর্ন জবাব দিতে পারে না।

তারপরে আরেক ঘণ্টা সমাদ্দারকে অপেক্ষা করতে হয়। অবশেষে প্রফুল্লর গাড়ি বাইরে বেরোয়। সমাদ্দারের আবার অনুসরণ। প্রফুল্লর ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায় তাজমহল হোটেলের সামনে। সমাদ্দারেরও। প্রফুল্ল নেমেই ট্যাক্সিওয়ালার পাওনা চুকিয়ে সটান তেরো নম্বর ঘরে ঢুকেই খিল আঁটে। সমাদ্দার গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে কি বন্দোবস্ত করে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে কঙ্কে-কাশির অভ্যুদয় হতেই প্রফুল্ল রুদ্ধনিশ্বাসে ছুটে যায়— 'সর্বনাশ হয়েছে, মিঃ কঙ্কে-কাশি!'

কঙ্কে-কাশি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না—'কী সর্বনাশ?'

'সমাদ্দার এসে উঠেছে এখানে। আমাদের পাশের বারো নম্বর ঘরে!'

'তাই নাকি? তাহলে তো ওকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করতে হচ্ছে। আমিও ওর শুভাগমন আশা করছিলাম।'

কঙ্কে-কাশি রসিকতা করছেন প্রথমটা প্রফুল্ল তাই ভেবেছিল, কিন্তু সত্যিই

ডিনারের টেবিলে সমাদ্দারের পাশে বসে নিজের চক্ষুকর্ণকে ওর বিশ্বাস করতে হল। ওর চিরকালের ধারণা, গোয়েন্দায় আর বদমাইসে মুখোমুখি হলেই ঝটাপটি বেধে যায়। শেষোক্তরা স্বভাবতই পলায়ন-তৎপর এবং প্রথমোক্তরা সর্বদাই ওদের পশ্চাদ্ধাবনে ব্যতিব্যস্ত। মাসিক পত্রের পাতায় আর গোয়েন্দা-গ্রন্থমালার বইয়ে পড়ে এই রকমের একটা বিশ্বাস ওর বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু এখন ওদের পরস্পরকে অন্তরঙ্গের মত কথাবার্তা কইতে দেখে তার ধারণা দস্তুর মত টলে গেল।

মধ্যাহ্নভোজ প্রফুল্লর মাথায় উঠে গেল, সে মাঝে মাঝে তার কোটের বুকপকেটে হাত দিয়ে গুরুতর বস্তুটির অস্তিত্ব অনুভব করতে লাগল। যে-কাগজের টুকরোটির উপর একটা পার্টির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাকে সে যত্নের সহিত কোটের লাইনিঙের মধ্যে সেলাই করে রেখেছে। জিনিসটার সেখান থেকে অকস্মাৎ উবে যাবার কথা নয় কিছুতেই, তবু সে বারবার পরীক্ষার দ্বারা আপনাকেই যেন ভরসা দিতে চাচ্ছিল।

ওর হস্তচালনা কঙ্কে-কাশির নজরে পড়ে একবার। তিনি হাসতে থাকেন, 'ভয় নেই প্রফুল্লবাবু। ও নিরাপদেই আছে, এবং থাকবেও, যদি না তোমার কোট তুমি খোয়াও।'

কঙ্কে-কাশির কথায় প্রফুল্লর ভারি রাগ হয়, তার মুখ লাল হয়ে উঠে। কঙ্কে-কাশি বুঝতে পারেন।

'আমি কি কোন গুপ্তকথা ফাঁস করে দিলাম নাকি? মোটেই না, প্রফুল্লবাবু! সমাদ্দার জানত যে কোথায় তুমি নমিনেশন পেপার রেখেছ। কিহে সমাদ্দার, জানতে না?'

সমাদ্দার ঘাড় নাড়ে—'নিশ্চয়ই! কোটের লাইনিং, ঐখানেই তো রাখবার জায়গা। সকলেই রাখে এবং সকলেই জানে।'

গোয়েন্দা এবং বদমাইস দু-জনে মিলে অকপটে হাসতে থাকে। প্রফুল্ল ভারি মুষড়ে যায়। হতে পারে কোটের লাইনিংই মূল্যবান কাগজ-পত্র রাখার একমাত্র জায়গা এবং সকলেই তা জানে, তবু কী দরকার ছিল মিস্টার কঙ্কে-কাশির সমাদ্দারকে এই খবর দেবার? বরং যাতে সমাদ্দারের মনে এরকম সন্দেহ না জাগে বা জেগে থাকলেও তা দূর হয় সে চেষ্টা করাই কি তাঁর উচিত ছিল না? কঙ্কে-কাশির গোয়েন্দাপনায় সে ঘাবড়ে যায় সত্যিই।

যাক, প্রফুল্লর আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। যতক্ষণ সে জেগে আছে ততক্ষণ তার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেওয়া কারো ক্ষমতার বাইরে—এবং রাত্রে, রেলগাড়িতে, হয় সে গা থেকে কোট খুলবেই না, আর খোলেও যদি, তাহলে বালিশের মতই সেটাকে ব্যবহার করবে, সে ঠিক করে রাখল। তার ভারি সজাগ ঘুম, তার মাথার তলা থেকে কোট নেয় কার সাধ্য?

খাওয়া শেষ হলে কঙ্কে-কাশি বলেন—'এস সমাদ্দার, একটু দাবা খেলা যাক। প্রফুল্ল, জানো নাকি দাবা খেলা?'

'জানি সামান্যই।' প্রফুল্ল মুখ গোঁজ করে বলে।

'আমার আপত্তি নেই।' সমাদ্দার উত্তর দেয়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই খেলা বেশ জমে ওঠে। কঙ্কে-কাশি ও সমাদ্দারের তো ভালই জানা আছে, প্রফুল্লও নেহাত কম যায় না। ক্রমশ ওর উৎসাহ বাড়তে থাকে, সমাদ্দারের চাল কেড়ে নিয়ে নিজে চাল দেয়। প্রফুল্ল উত্তেজিত হয়ে উঠে, ওর গরম বোধ হয়; সে কোট খুলে ফেলে, সমাদ্দারের উপস্থিতি সম্বন্ধে ওর হুঁশই নেই তখন। সমাদ্দারও নিজের কোট খোলে এবং প্রফুল্লর কোটের পাশেই রাখে। খেলা চলতে থাকে।

খানিক বাদে সমাদ্দার উঠে পড়ে—'প্রফুল্লবাবু, আপনি ততক্ষণ মিস্টার কঙ্কে-কাশির সঙ্গে খেলুন। আমি আসছি এক্ষুনি।'

একটু পরেই সমাদ্দার ফিরে আসে—'প্রফুল্লবাবু, ভুল করে নিজের কোট ফেলে আপনার কোট নিয়ে গেছি, কিছু মনে করবেন না।' কোট খুলতে খুলতে সে বলে।

প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে, নিজের কোট কেড়ে নেয়। যেখানে নমিনেশন পেপার ছিল সেখানটা অনুভব করে। পরমুহূর্তেই সে সমাদ্দারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে উদ্যত হয়। কঙ্কে-কাশি মাঝে পড়ে বাধা না দিলে তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে বদমাইশটাকে হয়ত এইদণ্ডেই সে টুটি টিপে খুন করেই বসত!

'প্রফুল্লবাবু, করছেন কী? কী ব্যাপার?'

'ওই চোর—'

'আহা, গালাগালি কেন? কী হয়েছে?'

'আপনি বুঝতে পারছেন না। এই লোকটা এইমাত্র আমার কোট থেকে নমিনেশন পেপার চুরি করেছে।'

কঙ্কে-কাশি তেমনই অবিচলিত থাকেন, 'তাই নাকি হে সমাদ্দার? তাই নাকি?'

'প্রফুল্লবাবু তো সেইরকমই ভাবছেন!' সমাদ্দার বলে, 'কিন্তু আমি নিজেই বুঝতে পারছি না কখন করলুম!'

সমাদ্দার উচ্চহাস্য করে, কঙ্কে-কাশিও হাসতে থাকেন। প্রফুল্ল রেগে আগুন হয়ে উঠে, কিন্তু একা সে কী করবে? আপন মনেই জ্বলতে থাকে। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই তার কেমন-কেমন ঠ্যাকে। সমাদ্দার ও কঙ্কে-কাশির মধ্যে যেরকম অন্তরঙ্গতা তাতে ওর নিদারুণ সন্দেহ হতে থাকে। ওরা দু-জনে মাসতুতো ভাই নয় তো?

'তুমি, যদি এখুনি আমার কাগজ ফিরিয়ে না দাও, তোমার হাড় ভেঙে আমি ছাতু করব।' প্রফুল্ল ঘুসি বাগিয়ে প্রস্তুত হয়।

'আহা, হচ্ছে কী এসব! মারামারি কি ভদ্রলোকের কাজ? কঙ্কে-কাশি ওকে সামলাতে যান।

'আপনি থামুন মশায়! আপনারা দু-জনেই এক গোত্র। আমি বেশ বুঝেছি? গোড়াতেই ধরতে পেরেছিলাম, কিন্তু—সে যাক। আপনার কোন কথা আমি শুনছি না আর।' প্রফুল্ল মরীয়া হয়ে ওঠে।

এবার সমাদ্দার কথা বলে—'আপনি যদি আমার গায়ে হাত দ্যান প্রফুল্লবাবু, তাহলে আমি এক্ষুনি হোটেলের ম্যানেজারকে ডেকে আপনাকে পুলিশে দেব। আপনার কাগজ যে আমি নিয়েছি তার প্রমাণ কী?'

'বেশ, আমি তোমাকে সার্চ করব! তোমার কামরাও?'

'স্বচ্ছন্দে! এক্ষুনি!' সমাদ্দার কঙ্কে-কাশির দিকে ফেরে, 'আপনিও কি সার্চ করতে চান? আসুন আমার সঙ্গে, কোন আপত্তি নেই আমার!'

'বাজে কাজে সময় নষ্ট করি না আমি,'—কঙ্কে-কাশি একটা সিগারেট ধরান। 'তুমি যদি সত্যিই ও-কাগজ নিয়ে থাকো সমাদ্দার, তাহলে প্রথম তোমাকে সার্চ করে কোনই লাভ নেই। কোথায় তুমি তা রেখেছ তাই যদি আমি ভেবে বার করতে পারি, তাহলে তা পেতে আমার বিলম্ব হবে না।'

'আপনি কি তাহলে সার্চ করতে প্রস্তুত নন?' প্রফুল্ল এবার ক্ষেপে ওঠে।

'উহুঁ!' কঙ্কে-কাশির সংক্ষিপ্ত জবাব। 'আপাতত না।'

'বেশ, আমি নিজেই করব তাহলে।'

প্রফুল্ল সমাদ্দারের ঘরে যায়, তার পর আপাদমস্তক অনুসন্ধান করে, সবগুলো জামার ভেতরের-বাইরের সমস্ত পকেট হাতড়ায়, কোটের যাবতীয় লাইনিং পরীক্ষা করে;ঘরের আঁতিপাঁতি সমস্ত জায়গায় ওর তল্লাস শেষ হয়। অবশেষে মুহ্যমানের মত যখন নিজের কামরায় ফেরে তখন কঙ্কে-কাশি জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছেন। মুখ না ফিরিয়েই তিনি বলেন, তখনই বললাম, প্রফুল্লবাবু, এখন ওকে সার্চ করে কোনই ফল নেই! কোথায় জিনিসটা সরিয়েছে যতক্ষণ তাই না আন্দাজ করতে পারছি—'

সমাদ্দার ফিরতেই কঙ্কে-কাশির কথায় বাধা পড়ে। প্রফুল্ল কোন জবাব দেয় না। নিজের মধ্যে নিজেই সে নেই তখন; এতই সে দমে গেছে।

'তবে, সত্যি বলতে কী, দোষ তোমার নিজেরই প্রফুল্লবাবু। তুমিই বল, তোমার আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিল না কি?' কঙ্কে-কাশি কথাটা শেষ করেন।

কিন্তু এ-কথায় প্রফুল্লর এখন আর সান্ত্বনা কোথায়? সে গুম হয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কঙ্কে-কাশি সমাদ্দারকে বলেন, 'ভারি দমিয়ে দিয়েছ তুমি বেচারাকে! ওর মুখ দেখলে মায়া হয়।'

সমাদ্দার ঘাড় নাড়ে। স্বভাবতই সে কোমল-হৃদয়, সত্যি-সত্যিই দুঃখ হয় ওর। 'বিজনেস, মিস্টার কঙ্কে-কাশি!' সে বলে।

'সে কথা হাজার বার। কিন্তু ভেবে দেখ দিকি কী সর্বনাশ হল ওর, হয়ত চাকরিই থাকবে না আর। ও তো ভেঙে পড়ছেই, আমিও খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি না।' কঙ্কে-কাশি সমাদ্দারের চোখের উপর চোখ রাখেন—'কাগজখানা রাখলে কোথায় হে সমাদ্দার?'

সমাদ্দার হাসে, 'আমি যে রেখেছি আমি তো স্বীকারই করিনি।'

'না। এবং তোমাকে স্বীকার করতে বলছিও না। কিন্তু একথাও ঠিক, ও-কাগজ নিয়ে সটকাতে পারছ না তুমি, হাওড়ায় নেমেই আমি তোমাকে আটকাব এবং খানাতল্লাসি করব—যাকে বলে পুলিশের খানাতল্লাসি।'

সমাদ্দার আতঙ্কিত হয়। 'সেটা সঙ্গত হবে মিঃ কঙ্কে-কাশি? কাগজখানা যে আমার কাছে আছে তার বিন্দু প্রমাণও আপনি পাননি।'

'না পাই। কিন্তু কাগজখানা আমি পেতে চাই।'

কঙ্কে কাশির সঙ্কল্প শুনে সমাদ্দারের শঙ্কা হয়। সে তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরে যায়, গিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। অনেক ভেবে সে একটা উপায় আবিষ্কার করে। দরজার খিল আঁটে। তারপর নিজের সুটকেস বার করে এক কোণের একটা গুপ্ত বোতাম টেপে, তার পরে ডালার দিকে একটা লুকানো খুপরি খুলে যায়। তার ভিতর থেকে সদ্য অপহৃত নমিনেশন পেপার বেরিয়ে পড়ে।

সমাদ্দার কাগজটা পরীক্ষা করে। সেইসঙ্গে আরেকখানা অনুরূপ নমিনেশন পেপারও। দ্বিতীয় কাগজখানা ফাঁকা, এখানা তাঁকে দেওয়া হয়েছে আসল কাগজ চেনার সুবিধের জন্যে। সমাদ্দার দ্বিতীয় কাগজের যথাস্থানে প্রথম কাগজের দেখাদেখি ব্যানার্জির সই নকল করে বসিয়ে দেয়। হঠাৎ দেখলে মনে হবে একই কাগজ, হুবহু একই সই; কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলেই এ-সই যে জাল করা তা স্পষ্টই ধরা পড়ে যাবে।

অবশেষে জাল কাগজখানা গুপ্ত ডালার মধ্যে এঁটে রেখে, আসল কাগজটা একখানা লেফাফায় ভরে। খামের উপরে লেখে মিস্টার সরকারের নাম আর ঠিকানা। কাগজটা সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয় দেখে রেজিষ্ট্রি করে পাঠানোই সে সমীচীন মনে করে। ডাকে গেলেও তার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় পৌঁছবে এবং একেবারে তার নিয়োগকর্তার হাতেই, সুতরাং তার অসুবিধা কিছু নেই। তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে, কাছাকাছি পোষ্ট-অফিসের উদ্দেশ্যে সে রওনা হয়।

প্রফুল্ল ঘরে ঢোকে। আপন মনেই যেন বলে, 'দরজায় তালা লাগিয়ে সমাদ্দারকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম।'

'তাই নাকি?' কঙ্কে-কাশি সিগারেটের সামান্য অবশেষটা ফেলে দেন, 'তাহলে তো ওর ঘরটা আর একবার তল্লাস করতে হয়! এই তো সেরা সুযোগ।'

সব-খোল চাবির সাহায্যে সহজেই তালা খুলে যায়। প্রফুল্লকে নিয়ে তিনি ঢোকেন।

'কোথায় তুমি খুঁজেছিলে?'

তদুত্তরে প্রফুল্ল তার অনুসন্ধান বৃত্তান্ত প্রকাশ করে।

'এই সুটকেশটা দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ। এর ভিতরেও দেখেছি। ওতে নেই।'

'দেখেছ ঠিকই। কিন্তু আরেকবার দেখা যাক।'

কঙ্কে-কাশি সুটকেসটাকে উন্মুক্ত করেন, ভিতরের যা কিছু জিনিসপত্র সব তাঁর পায়ের কাছে উজাড় হয়।

'দেখলেন তো? বললাম ওতে নেই।' প্রফুল্ল বলে।

কঙ্কে-কাশি ওর কথায় কান দেন না; খুঁজতে খুঁজতে সেই গুপ্ত বোতাম আবিষ্কৃত হয়। 'পেয়েছি প্রফুল্লবাবু, এতক্ষণে পেয়েছি।'

'কী?'

'এই দেখ।' চাবি টিপতেই সেই লুকানো ডালা ব্যক্ত হয়। তার মধ্যে একটা লম্বা লেফাফা। লেফাফাটা না খুলেই তিনি প্রফুল্লর হাতে দেন। 'এই নাও, কিন্তু সাবধান আর যেন খোয়া না যায়।'

প্রফুল্ল কম্পিত হাতে লেফাফা খোলে। কাগজখানা দেখেই সে লাফিয়ে ওঠে। তারপর দু-হাতে কঙ্কে-কাশির একখানা হাত চেপে ধরে—'আপনাকে সন্দেহ করেছিলাম, আমাকে মাফ করুন—'

উত্তরে কঙ্কে-কাশির শুধু একটু মৃদু হাসি দেখা যায়। সমস্ত জিনিস যথাযথ রেখে তেমনি তালা এঁটে তাঁরা বেরিয়ে আসেন।

সমাদ্দার হোটেলে ফিরে নিজের ঘরে ঢুকেই তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে কঙ্কে-কাশির কাছে। 'এটা কি ভাল কাজ আপনার মশাই? আমার অবর্তমানে আমার ঘরে ঢুকে সুটকেশ খুলে—'

কঙ্কে-কাশি বাধা দেন—'আমরাই যে তোমার সুটকেশ খুলেছি তার কী প্রমাণ তুমি পেয়েছ? প্রমাণ ছাড়া তুমি তো চল না সমাদ্দার।'

প্রফুল্ল এতক্ষণে মন খুলে হাসতে পারে।

সমাদ্দার গজরাতে থাকেন ভয়ানক রাগের ভান করে; কিন্তু সেও মনে মনে হাসে।

আর মিস্টার কঙ্কে-কাশি? তাঁর মুখে হাসি দেখা যায় না।

সমাদ্দার চলে গেলে প্রফুল্ল মুখ খোলে—'একবার বাগাতে পেরেছে, আর পারবে না এ কোট আর আমি গা থেকে খুলছি না। রাত্রেও না!'

'ঠেকে শেখা ভয়ানক শেখা প্রফুল্লবাবু!' কঙ্কে-কাশি ঘাড় নাড়েন, 'এবং একবারই একটা মানুষের পক্ষে যথেষ্ট।'

'আচ্ছা, মিস্টার কঙ্কে-কাশি, সুটকেশটার যে-একটা গোপন খুপরি আছে কী করে আপনি বুঝলেন?'

'তোমার কোটের লাইনিং আছে যেমন করে সমাদ্দার বুঝেছিল।' কঙ্কে-কাশি ব্যাখ্যা করে দেন—'ও থাকতেই হবে। তোমার কি ডিটেকটিভ উপন্যাস একেবারেই পড়া নেই প্রফুল্লবাবু?'

প্রফুল্ল নিজের বিদ্যাবত্তা জাহির করতে লজ্জা পায়। একেবারেই যে এক-আধখানা ওর পড়া নেই তা নয়, তবু সে সসঙ্কোচেই বলে, 'এবার থেকে পড়ব কিন্তু।'

কলকাতায় ফেরার পরদিনই কঙ্কে-কাশি সমাদ্দারের আড্ডায় গিয়ে আবির্ভূত হন, 'আসতে পারি ভেতরে?'

'আসুন, আসুন! আমার কী সৌভাগ্য, আপনি এসেছেন!' সমাদ্দার শশব্যস্ত হয়ে ওঠে।

'সরকারদের কাছ থেকে টাকাটা পেয়ে গেছ তো?' কঙ্কে-কাশি জিজ্ঞাসা করেন।

'হ্যাঁ, কালই দিয়ে দিয়েছে। নগদ পাঁচটি হাজার।' সমাদ্দার উত্তর দেয়, কেন, কী হয়েছে তার?

'না, এমন কিছু না। কঙ্কে-কাশি তাঁর হাতঘড়ির দিকে তাকান। এখন দশটা, আর এক ঘণ্টা পরেই প্রেসিডেন্সি কোর্টে নমিনেশন পেপার সব দাখিল হয়েছে কিনা। তোমাকে আমি কেটে পড়তে বলতে এসেছি। বন্ধুভাবেই বলতে এসেছি অবশ্য।'

'কেটে পড়ব! আমি? কেন? সমাদ্দার সচকিত হয়।

'সরকারদের পার্টির কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়েছ এইজন্যে। ওদের হাতে খুনে গুণ্ডা তো নেই, যাদের তুলনায় তুমি আস্ত দেবদূত।'

'ফাঁকি দিয়ে নিয়েছি কী রকম?' সমাদ্দার এবার হাসে, 'আপনি কি এখনো বুঝতে পারেন নি, মিস্টার কঙ্কে-কাশি, আমার সুটকেশ থেকে যে কাগজ আপনি বের করে নিয়েছিলেন তা আসলে জাল-সই করা?

'আগাগোড়াই তা আমি জানতাম।' কঙ্কে-কাশির গলার স্বর গম্ভীর।

'তবে—?'

'আসলে একটা কথা তুমি নিজেই এখনো বুঝতে পারনি, সমাদ্দার। প্রফুল্লর পকেট থেকে যে কাগজ তুমি বাগিয়েছিলে তাও জাল ছাড়া কিছু না.'

'অ্যাঁ?' এবার সত্যিই চমকে উঠে সমাদ্দার। 'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়! যে সময়ে তুমি বাগানবাড়ির গেটে প্রফুল্লর জন্যে অপেক্ষা করছিলে

সেই সময়ে আমি শহরে ফিরে গলস্টোন কোম্পানির অফিস থেকে আসল কাগজখানা হস্তগত করি। স্টেশনে নেমেই গলস্টোন সাহেবকে ফোন করে আমি ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম যাতে সাহেবের বাড়ি থেকে প্রফুল্লকে একখানা নকল নমিনেশন পেপার দেওয়া হয়—এখন সব বুঝতে পারছ তো? যাতে তোমার নজর একেবারেই আমার দিকে না পড়ে সেইজন্যেই আমার এত কাণ্ড করা। প্রফুল্লকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এবং সবকিছু। অমন মূল্যবান কাগজ আমি নিতান্ত অবহেলাভরে আমার এই কোটের পকেটে করে নিয়ে এসেছি, ইচ্ছেমত জামা খুলেছি; রেখেছি তুমি তা ঘূণাক্ষরেও জানতে পার নি। প্রফুল্লও তা জানে না; কোনদিন জানবেও না। যাক, বেচারা আনন্দেই আছে, ওর বেতন বেড়ে গেছে খবর পেলাম।—'

হরবিলাসের মৃত্যু রহস্য

বনফুল

হরবিলাসের মৃত্যু হইয়াছে।

এ মৃত্যু সুখের অথবা দুঃখের, তাহার বিচার নীতিবিদেরা করিবেন। আইনত যিনি ললিতার স্বামী ছিলেন, তিনি ছিলেন একটি মনুষ্যরূপী দানব, ইঁহার কবল হইতে ললিতাকে উদ্ধার করিয়া হরবিলাস সৎসাহসেরই পরিচয় দিয়াছেন। আজীবন তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে একঘরে হইয়া বাস করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহার কর্মটি যে একটি অসাধারণ রকম সৎকর্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজ সংস্কারের জন্য হরবিলাসের মত সাহসী লোকেরই তো প্রয়োজন। এরূপ লোকের তিরোভাব নিতান্তই দুঃখের।

হরবিলাসের একমাত্র বন্ধু সিদ্ধেশ্বর, কিন্তু এসব লইয়া মাথা ঘামাইতেছিল না। সে কেবল ভাবিতেছিল, হরবিলাসের মৃত্যুর কারণ কী! লোকটা কাল রাত্রি দশটা পর্যন্ত সুস্থ ছিল, খোসমেজাজে কতরকম গল্প করিল, সহসা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কী হইল! মৃত্যুর কোন লক্ষণই তো তাহার মধ্যে সে লক্ষ্য করে নাই! ব্যাপারটা

বেশ একটু রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। বিশেষত হরবিলাসের একটি কথা মনে হওয়াতে সিদ্ধেশ্বরের ধারণা হইল যে এ মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। হরবিলাস কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন, 'ললিতাকে নিয়ে যখন এখানে চলে আসি তার কিছুদিন পরে বক্কেশ্বরবাবু আমাকে একটা চিঠি লেখেন। কী লিখেছিলেন জান? লিখেছিলেন—এর প্রতিশোধ আমি নেবই। জীবন দিয়ে আপনাকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দূরে পালিয়ে গিয়ে নিস্তার পাবেন না। আদালতে নালিশ করে ললিতাকে আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি, কিন্তু ওর মুখদর্শন করবার ইচ্ছে নেই। ওকেও আমি শাস্তি দেব, দেখে নেবেন।'

হরবিলাসের ম্লান হাসিটা সিদ্ধেশ্বরের চোখের ওপর ভাসিয়া উঠিল। ভীতু, ম্লান হাসি। সহসা তাহার মনে হইল, ললিতার মৃত্যুটাও ঠিক অস্বাভাবিকভাবে হয় নাই। কে একজন অপরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া কি একটা প্রসাদ তাহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া গিয়াছিল। সেইদিনই কলেরায় তাহার মৃত্যু হয়। সত্যই কি তাহার কলেরা হইয়াছিল? সেই সন্ন্যাসী যে বক্কেশ্বরের চর নয়, তাহাও তো নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। হয়ত প্রসাদের সহিত বিষ ছিল...।

বন্ধুর মৃত্যুসংবাদে সিদ্ধেশ্বর শোকাকুল হইয়াছিল, এইসব কথা চিন্তা করিয়া একটু উত্তেজিত হইল। তাহার মনে হইল, ললিতার মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও তদন্ত করিবার কথা কাহারও মনে হয় নাই। কিন্তু হরবিলাসের এই রহস্যময় মৃত্যুতে যখন তাহার মনে খটকা লাগিয়াছে, তখন তদন্ত না করিয়া সে ছাড়িবে না। হরবিলাসের আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই, তাহাকেই সব করিতে হইবে। উত্তেজনাভরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। যে ভৃত্যটি হরবিলাসের মৃত্যুসংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া বলিল ঃ 'তুই যা, আমি আসছি এখনি। বাড়িতে আর কোন লোক যেন না ঢোকে। বুঝলি?

ভৃত্য সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল। একটু পরে সিদ্ধেশ্বরও বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমেই গেল থানায়।

॥ দুই ॥

শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নাই। হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হইয়া হরবিলাসের মৃত্যু হইয়াছে, ইহাই ডাক্তারের অভিমত। হরবিলাসের হৃদ্‌যন্ত্র দুর্বল ছিল, তাহা আরেকজন ডাক্তারও বলিয়াছিল। ইহা লইয়া হরবিলাসের খুঁতখুঁতানিরও অন্ত ছিল না, সামান্য একটু কিছু হইলেই তাঁহার বুক ধড়ফড় করিত। কিন্তু এতদিন তো ওই হৃদ্‌যন্ত্র লইয়াই তিনি বেশ বাঁচিয়া ছিলেন। সহসা এমন কী হইল? থানার দারোগা হরবিলাসের মৃত্যুতে সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই,

সিদ্ধেশ্বর কিন্তু নিঃসন্দেহ হইতে পারিল না। সে বাড়ির চাকরটাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

'তুই প্রথমে কী করে টের পেলি যে বাবু মারা গেছেন?'

'বাবু রোজ ভোরে ওঠেন, কিন্তু সেদিন যখন বেলা দশটা পর্যন্ত উঠলেন না, ডাকাডাকি করেও সাড়া পেলাম না, তখন জানলার সেই ফোকরটা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম—'

'ও!'

ছোকরাটার ইতিহাস সিদ্ধেশ্বরের মনে পড়িয়া গেল। হরবিলাসের দেশ হইতে একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আসিয়াছিলেন। হরবিলাস তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি যখন আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিলেন, তখন তাহাকে বাড়িতে স্থান দিতে হইল, ভদ্রলোক নাকি ব্যবসা-সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে এ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন, হরবিলাসের বাড়িতে দিনসাতেক ছিলেন। সেই সময়ে তিনি নাকি লক্ষ্য করেন যে, ঘুমের ঘোরে হরবিলাস প্রত্যহ গোঁ-গোঁ করিয়া শব্দ করেন, মনে হয় যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। হরবিলাস ব্যাপারটা তত গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নাই, ভদ্রলোক কিন্তু ইহাতে খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। তিনি আসিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধেশ্বরের এখনো মনে আছে। একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওখানে। ইনি পশ্চিমে প্রাকটিস করেন, এখানে একজন মাড়োয়ারী রোগীর কল পেয়ে এসেছেন। আমার সঙ্গে আলাপ ছিল, তাই এঁকে ডেকে নিয়ে এলাম। তুমি একবার বুকটা দেখাও তো এঁকে! রাতে ঘুমের ঘোরে যেরকম কর, ভয় হয়!'—

ডাক্তার ঘোষ হরবিলাসের বুক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন ঃ 'আপনার হার্ট খারাপ, তাই শ্বাস কষ্ট হয়?'

হরবিলাস বলিল, 'আমি তো তেমন টের পাই না।'

'আর কিছুদিন পরে টের পাবেন।'

'কী করব তাহলে?'

'মাথার কাছের জানালাটা খুলে শোবেন। সাফ হাওয়া দরকার।'

'ও বাবা, আমি ভীতু মানুষ, তা পারব না মশাই।'

'জানালা সবটা খুলতে না পারেন, ছোট একটা ফোকর করিয়ে নিন জানলায়। বাইরের অক্সিজেন ঘরে খানিকটা ঢুকলেই হল।'

হরবিলাস চুপ করিয়া ছিল।

আত্মীয়টি বলিলেন, 'আচ্ছা, সে আমি করিয়া দিয়া তবে যাব।'

হরবিলাসের মাথায় শিয়রের গোল ছিদ্রটি তিনিই করাইয়া দিয়াছিলেন। পরদিন নিজে গিয়া মিস্ত্রি ডাকিয়া ছিদ্রটি করাইয়া তবে অন্য কাজ করেন। তাহার পর তিনি বেশিদিন ছিলেনও না।

সিদ্ধেশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল। ওই ছিদ্রপথেই মৃত্যু আসে নাই তো! কিন্তু কিরূপে?

'আচ্ছা, হরবিলাসের সেই আত্মীয়টি চলে যাবার পর কেউ কি এসেছিল?'

'আজ্ঞে না, তবে সেদিন একটি পাঞ্জাবী জ্যোতিষী এসেছিল।'

'পাঞ্জাবী জ্যোতিষী? কবে?'

'দিন পনের আগে।'

'কী বললে সে?'

'তা তো জানিনে বাবু, তবে অনেকক্ষণ ছিল।'

সিদ্ধেশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। হরবিলাসের মৃত্যুরহস্যের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাহার মনে হইল না।

॥ তিন॥

মৃত্যুর ছয়মাস পূর্বে হরবিলাস একটি উইল করিয়াছিলেন। উইলে ছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হইবে। 'ললিতা বৃত্তি' নাম দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নারী-শিক্ষা প্রসারের জন্য উক্ত টাকার সুদ হইতে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিবে। তাহার মৃত্যুর পর সিদ্ধেশ্বর যদি জীবিত থাকেন তাহা হইলে সিদ্ধেশ্বরই তাহার বিষয় প্রভৃতির বিক্রয়ের ভার লইবে। সিদ্ধেশ্বর যদি জীবিত না থাকে গভর্নমেণ্টের উপর এই ভার অর্পিত হইবে।

বিষয় সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিদ্ধেশ্বর হরবিলাসের খাতাপত্র দেখিতেছিল। সহসা কতকগুলি ডায়েরি তাঁহার হাতে পড়িল। হরবিলাস যে এমন নিয়মিতভাবে ডায়েরি লিখিতেন, তাহা সিদ্ধেশ্বরের জানা ছিল না! মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত হরবিলাস ডায়েরি লিখিয়া গিয়াছেন।

ডায়েরির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক স্থানে সিদ্ধেশ্বরের দৃষ্টি আটকাইয়া গেল। একস্থানে লেখা ঃ আজ একজন পাঞ্জাবী জ্যোতিষী আসিয়াছিল। সে আমার হস্তরেখা বিচার করিয়া একটি অদ্ভুত কথা বলিল। খানিকক্ষণ আমার হাতের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল, 'আপনাকে যদি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রাগ করিবেন না তো?'

বলিলাম, 'না রাগ করিব কেন, কী জানিতে চান বলুন।'

সে বলিল, 'আপনি কি কখনো পরস্ত্রী হরণ করিয়াছিলেন?'

আমি প্রথমটা অবাক হইয়া গেলাম, তাহার পর মনে হইল এ খবর কাহারও নিকট সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। বলিলাম, 'ধরুন যদি করিয়াই থাকি।'

জ্যোতিষী বলিল, 'তাহা হইলে একটি বিষয়ে আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। সর্পাঘাতে আপনার মৃত্যু হইবে। এমন স্থানে কখনও যাইবেন না, যেখানে সাপ থাকিতে পারে।' এই কথাগুলি বলিয়া জ্যোতিষী চলিয়া গেল।

জ্যোতিষীর কথাটা বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে ললিতার ব্যাপারটা সে আমার হস্তরেখা হইতেই নির্ণয় করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার ক্ষমতা আছে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় ভবিষ্যৎবাণীটি তুচ্ছ করিবার মত নয়, সাবধানে থাকা উচিত। সাবধানেই আছি, বাড়ি হইতে পারতপক্ষে কখনও বাহির হই না। নিজের ঘরটিতেই বসিয়া থাকি। কাল কিছু কার্বলিক অ্যাসিড আনাইব। শুনিয়াছি ঘরের চারিদিকে কার্বলিক লোশন ছিটাইলে সাপ আসে না।

সিদ্ধেশ্বর ডায়েরির পাতাটার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হরবিলাস যে কিছুদিন পূর্বে কার্বলিক অ্যাসিড আনাইয়া ঘরের চর্তুদিকে ছিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধেশ্বর জানিত। সহসা তাঁহার এ খেয়াল হইল কেন জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল কিন্তু কোন উত্তর আসে নাই। হরবিলাস একটু হাসিয়াছিল মাত্র। সিদ্ধেশ্বর ভাবিতে লাগিল, জানলার এ ছিদ্রপথে সত্যই কি সাপ ঢুকিয়াছিল? সর্পাঘাতে যদি তাঁহার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে শবব্যবচ্ছেদের সময় কি তাহা ধরা পড়িত না? সিদ্ধেশ্বর ডায়েরি বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িল। যিনি শবব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন, সোজা তাঁহার কাছে চলিয়া গেল।

'আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, হরবিলাসের যদি সর্পাঘাতে মৃত্যু হত, আগে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন আপনি, না?'

'তা পারতাম বৈকি। হঠাৎ একথা মনে হচ্ছে কেন এতদিন পরে?'

'না, এমনি।'

সিদ্ধেশ্বর ব্যাপারটা ডাক্তারবাবুর কাছে ভাঙিল না।

'হার্টফেল করে মারা গেছেন ভদ্রলোক, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর ও নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভই বা কী?'

'তা বটে।'

একটু অপ্রস্তুত হাসি হাসিয়া সিদ্ধেশ্বর চলিয়া আসিল, কিন্তু তাহার মনে একটা খটকা লাগিয়াই রহিল।

॥ চার ॥

মাসখানেক পরে।

হরবিলাসের বসতবাটীটি বিক্রয় করিবার জন্য সিদ্ধেশ্বর তাহার চৌহদ্দিটি মাপিতেছিল। সেই সময়ে একটি জিনিস তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জিনিসটি কিছুই নয়, একটি বড় কার্ডবোর্ডের বাক্স। হরবিলাস যে ঘরে শুইত, সেই ঘরের পাশেই একটি ঝোপের ভিতর বাক্সটি পড়িয়া ছিল। খালি বাক্স, ভিতরে কিছুই নাই। তবে, বাক্সের উপর একটা নম্বর এবং দোকানের ঠিকানা লেখা রহিয়াছে। রোদে জলে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু পড়া যায়। কী মনে করিয়া সিদ্ধেশ্বর বাক্সটি তুলিয়া লইল।

কী ছিল এ বাক্সে? নানারূপ আন্দাজ করিতে করিতে অবশেষে তাহার মনে হইল, বাক্সের গায়ে যে ঠিকানাটা লেখা আছে, বাক্সটি সেই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া যদি লেখা যায় যে, এই বাক্সে যাহা ছিল ঠিক এমনি একটি জিনিস ভি. পি. করিয়া আমার নামে পাঠাইয়া দিন, তাহা হইলে কী হয়? হয়ত কিছুই হইবে না। কিংবা হয়ত একটা গেঞ্জি বা কয়েকজোড়া মোজা বা ঐ ধরনের কিছু একটা আসিয়া পড়িতেও পারে। দেখাই যাক না কী হয়।

সিদ্ধেশ্বর বাক্সটি প্যাক করিয়া এবং উপরোক্ত মর্মে একটি পত্রও তাহার ভিতর দিয়া সেটি পাঠাইয়া দিল। কেবল কৌতুহলের বশবর্তী হইয়াই যে সে এ কার্য করিল তাহা নহে, কেমন যেন নিগূঢ়ভাবে মনে হইতেছিল যে, এই বাক্সটির সহিত হয়ত হরবিলাসের মৃত্যুর কোনও সংস্রব আছে।

॥ পাঁচ ॥

দিন দশেক পরে সিদ্ধেশ্বর হরবিলাসের বাড়িতে বসিয়া জিনিসপত্রের একটা ফর্দ করিতেছিল। সম্মুখের দেওয়ালে টাঙানো ছিল ললিতার একখানি ছবি। পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল।

'আপনার নামে একটা ভি. পি. আছে বাবু।'

'ভি. পি? ক-টাকার?'

'দশ্ টাকা পনের আনা।'

সিদ্ধেশ্বর সবিস্ময়ে দেখিল, সেই দোকান হইতেই ভি. পি. আসিয়াছে। ভি. পি. ছাড়াইয়া লইল। পিওন চলিয়া যাইবার পর সহাস্যে স্বগতোক্তি করিল ঃ 'দেখা যাক কী এসেছে।'

...অবিকল সেইরকম কার্ডবোর্ডের বাক্স। বাক্স খুলিয়া কিন্তু সিদ্ধেশ্বর লাফাইয়া

উঠিল। বাক্সের ভিতর একটা সাপ রহিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ঘরের কোণে যে লাঠিটা ছিল সেই লাঠিটা আনিয়া দূর হইতে স্পর্শ করিল। সাপ নড়িল না। তখন সাহস করিয়া খোঁচা দিল একটা। খোঁচা দিতেই সাপটা আঁকিয়া বাঁকিয়া বাক্স হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সাপটা যে রবারের এবং স্প্রিং-এর একটা কারসাজি তাহা বুঝিতে সিদ্ধেশ্বরের দেরি হয় নাই। তবু সে সাপটার দিকে সভয়ে চাহিয়া রহিল। অবিকল একটা গোক্ষুর।

নিমেষের মধ্যে হরবিলাসের মৃত্যু-রহস্যটা তাহার কাছে যেন পরিষ্কার হইয়া গেল। হরবিলাসের সেই আত্মীয়, সেই ডাক্তার, সেই জ্যোতিষী সকলেই বক্রেশ্বর বক্সীর লোক।

সহসা একটি শব্দে সিদ্ধেশ্বর চমকাইয়া উঠিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, ললিতার ছবিখানা মেঝেতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।

নবার ডাইরি

লীলা মজুমদার

তোমার নিশ্চয় জান যে পৃথিবীর অধিকাংশ অদ্ভুত ঘটনা উত্তর কলকাতার একটা বিশেষ এলাকায় ঘটে থাকে। আমি কাউকে চটাকে চাই না বলে সাল তারিখ নাম নিবাসের বিষয়ে ধোঁয়া ধোঁয়া ভাসা ভাসা ভাবে ছাড়া বলছি না। তাও খানিকটা বদলে-সদলে। ঐ অঞ্চলে অজস্র পুরানো বাড়ি আর অস্বাভাবিক লোকজন আছে, যাদের নিয়ে এসব ঘটনা ঘটতে পারে। নিশ্চিত ঘটেছে, তাও বলছি না।

মোট কথা, এক রবিবার সকালে ঐ রকম একটা বাড়ির লাগোয়া ছোট মতো সাজানো সারানো নতুন বাড়ির একটা তলায়, বুড়ো ডাক্তার নীলু ভট্টাচার্য্যের খুদে বসবার ঘরে হুড়মুড় করে একটা আধাবয়সী ভদ্রলোক ঢুকে পড়ে, তাঁর হাঁটুর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সব্বনাশ হয়েছে ডাক্তারবাবু, আমি বোধ হয় ভুলে আমার নিজের মাস্তুতো ঠাকুমাকে বিয়ে করে ফেলেছি!'

ডাক্তারবাবু আঁৎকে উঠলেন, 'এ্যাঁ! এই বয়সে আবার একটা বিয়ে করলে কোন্ আক্কেলে, বদ্যিনাথ? তাও আবার মাস্তুতো ঠাকুমাকে! তোমার কি কোন বিবেচনা নেই? কাজটা বেআইনী হয়েছে।'

বদ্যিনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'না, না আবার করিনি। পুরনো গিন্নিই বোধহয় আমার মাস্তুতো ঠাকুমা। একটা ওষুধ-পত্র দিন, ডাক্তারবাবু। লোকে বলে আপনি মরা মানুষ জিন্দা করে দিতে পারেন, আপনার কাছে এ সমস্যা কিচ্ছুই নয়। একটা পুরিয়া দিন। গিন্নিই বলেন, হোমিওপ্যাথিকে সব হয়।'

ডাক্তারবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'আহা, অত বাড়িও না, বদ্যিনাথ। এই পুরিয়াটা খালি পেটে খাও। তাছাড়া মাস্তুতো ঠাকুমাকে বিয়ে করলে কোন দোষ হয় না। তবু শুনি ব্যাপারটা, শুনে দরকার হলে আরেক পুরিয়া দেব। চা খাবে?'

বদ্যিনাথ বলল, 'ওষুধ খাওয়ার কথা ভাবলেও গা শিউরে উঠছে ডাক্তারবাবু। সব খুলে বলছি তা হলেই বুঝবেন। জানেন তো পার্কের পাশের ঐ পুরানো বাড়িটা গিন্নির পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। বিয়ের পর এই ত্রিশ বছর ধরে প্রায়ই ভেবেছি চিলে কোঠায় ওঁদের পাঁচ পুরুষের রাবিশ, ওটা একবার আগাগোড়া তাড়ু হাঁকড়াতে হবে। তা বদলির চাকরি, এত দিন সময় পাইনি। তার ওপর ধুলো ঘাঁটলে গিন্নি চটে যান। ওতেই নাকি হাঁপানি হয়। সে যাই হক, গিন্নি সইয়ের সঙ্গে পরশু কাশী গেছেন, সেই ফাঁকে কাল সারাদিন আমি ঐ চিলে কোঠার ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত সরু চিরুণী দিয়ে আঁচড়েছি। না আঁচড়ালেই হত।

দু তিন ঝুড়ি ইঁদুর আরশুলোর নাদি। পর্বতপ্রমাণ ভাঙা কাচের গাদা, পুরনো বই কাগজের আর ন্যাকড়ার স্তূপ। তাই বেচেই বামুনদিদি আজ বলছে সে-ও কাশী যাবে! এক ঢাঁই কাঁসা পেতলের বাসন। কালই সে সমস্ত পশুপতির দোকানে পাচার করেছি। নিকট ভবিষ্যতে আমারি হয়তো কিছু দরকার পড়তে পারে। আর পেয়েছি খেরো দিয়ে বাঁধানো মোটা একটা বিকট হিসাব খাতা। তার প্রথম পাতার ওপরে লেখা-টু দীনেশদা। তার তলায় লেখা, 'নবার ডাইরি'। খাতাখানাতে আগাগোড়া সবুজ কালিতে খুদে খুদে অক্ষরে যা লেখা আছে, সারা রাত ধরে—লোডশেডিং-এর সময়টুকু ছাড়া—তাই পড়ে আমি নিশি কাবার এবং মনের শান্তি নষ্ট করেছি।'

এই অবধি বলে বদ্যিনাথ পকেট থেকে মোটামতো একটা হিসাব খাতা বের করল। ঘরটা অমনি কেমন একটা ধুলো ধূলো ধূনো ধূনো গন্ধে ভরে গেল। হয়তো পোকার প্রকোপ থেকে বই বাঁচাবার জন্য কোনো ওষুধপত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকবে। খাতা দেখে নীলু ডাক্তার হঠাৎ সটাং হয়ে উঠে বসলেন। আশী পেরিয়ে অবধি তাঁর একটু ঠেস দিয়ে বসার এবং কথা বলার অভ্যাস হয়েছিল। কিন্তু খাতা হাতে নিয়ে, নেড়ে চেড়ে, আলোর কাছে ধরেও যখন সবুজ রঙের পিঁপড়ে অক্ষরের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলেন না, তখন ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বদ্যিনাথকে খাতা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'পঞ্চুটা একটা অপদার্থ! এ চশমা দিয়ে যদি কিছু পড়া যায়! তুমি বরং মমার্থটা সংক্ষেপে বল।'

বদ্যিনাথও তাই চাইছিল। একবার পড়েই ডাইরির বীভৎস কাহিনী তার মনে

গেঁথে গেছিল। সে বলল, 'বুঝলেন ডাক্তারবাবু 'ডাইরি' পড়ে যদ্দূর বুঝলাম ঐ নবা-ভশ্চায্যি ছিলেন গিন্নির বাপের বাড়ির পেটোয়া ডাক্তার। সব অসুখ-বিসুখে, বিপদে ও সমস্যার সময়ের পরামর্শদাতা। তা নিজে যতই গুণবান হন না কেন, ওঁর ঠাকুরদা ছিলেন স্রেফ একটি ধনুর্ধর। লেখাপড়া বেশী না শিখেও নানা উপায়ে দেদার পয়সা করেছিলেন। ডাইরিতে নবা সে বিষয়ে দুঃখ করে লিখেছে যে গ্রামের বাড়িতে স্ত্রী পুত্র খেতে পাক, বা না পাক তিনি তাঁর সাহেব সঙ্গীদের সঙ্গে চীন সীমান্তে যাতায়াত করতেন। আফিং পাচারের ব্যবসা ছিল তাঁদের। ঠাকুরদার কাজ ছিল চীনের লোকেদের আফিং-এর নেশা ধরিয়ে সীমান্তের কাছে সাহেবদের আফিং খেতের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা এবং খদ্দের বাড়ানো। এদিকে চীনে কোনোকালেও আফিং-এর চল ছিল না। চীনের সম্রাট এই সর্বনেশে নেশার কুফল লক্ষ্য করে সে দেশে আফিং খাওয়া বা বিক্রী করা বে-আইনী করে দিলেন। আইন ভাঙার কড়া সাজার ব্যবস্থাও করলেন। সাহেবদের ফলাও ব্যবসা প্রায় রাতারাতি পড়ে গেল। তাঁরা রেগেমেগে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সেই যুদ্ধেরি নাম বক্সার ওয়ার।

বুঝলেন ডাক্তারবাবু, যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে কথা নয়, তবে নবার ঠাকুরদা সেই সময় চীনদেশে কার্যগতিকে গিয়ে যুদ্ধের জোয়ার ভাঁটার প্রকোপে পড়লেন। পালাবার পথ পান না, বনে বনে গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। সান-পো নদী যে-সব সংকীর্ণ গিরিপথ ধরে পাহাড় ভেদ করে নেমে এসেছে, ঠাকুরদার ইচ্ছে, সেই পথে দেশে ফেরেন। প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থা ; কিছু শুকনো ফলমূল আর একটা কম্বল মাত্র সম্বল। পাহাড়ের উঁচু ঢালে হাড়-কাঁপানো শীত।

সেইখানে এক নিরাশায় ভরা সন্ধ্যায়, একটা গিরিগুহায় আশ্রয় নিয়ে দেখেন, গুহার মধ্যে যুদ্ধে ভীষণ ভাবে আহর্ত মরণাপন্ন এক চীনে বদ্যি। নিজে কষ্ট পেয়ে পেয়ে ঠাকুরদার মন তখন অন্যরকম হয়ে গেছিল। জলতেষ্টায় বদ্যির ছাতি ফাটছিল। কাছেই বরফের মতো ঠাণ্ডা পাহাড়ি ঝরণা। ঠাকুরদা সেখান থেকে লাউয়ের খোলায় করে জল এনে, তাঁকে পান করালেন, মুখ মাথা মুছিয়ে যতটা পারেন আরাম দিলেন।

কিন্তু তাঁর যাবার সময় হয়ে এসেছিল। তাঁর বড় ভয় মৃত্যুর পর বুনো জানোয়ারে তাঁর শরীর অপবিত্র করবে। ঠাকুরদা স্থানীয় ভাষা জানতেন, তিনি আশ্বাস দিলেন যে নিজের হাতে তাঁকে সমাধি না দিয়ে সেখান থেকে যাবেন না। মারা যাবার আগে বদ্যি তাঁকে দুটি জিনিস দিয়েছিলেন। একটি মহামূল্য সুবজ মণি আর আধ বিঘৎ লম্বা সুন্দর সবুজ শিশিতে কি এক দুষ্প্রাপ্য ওষুধ। তার বিষয়ে চ্যাং যা বললেন মুখ্যু ঠাকুরদা তার এক বর্ণ বুঝলেন না। হাতে তৈরি কাগজে ওষুধের নিয়ম ইত্যাদি চীনে ভাষায় লেখা ছিল। সেটুকু পড়বারো বিদ্যে ঠাকুরদার ছিল না। একটা পেতলের কৌটো করে জিনিস দুটি তিনি দেশে নিয়ে এলেন।

দেশে তাঁর চেনা জহুরীর কাছে মণি বিক্রি করে তিনি যা পেয়েছিলেন, তাই দিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখেই তাঁর জীবন কেটেছিল। ছেলেও বেশিদূর লেখাপড়া শেখেননি বটে, কিন্তু তাঁর ছেলে নবরতন একটি রত্ন বিশেষ। এই নবরতনই হল নবা। ডাক্তারি পাশ করে তার নাম-ডাক হয়েছিল। ঐ শিশির ওষুধের গল্প ঠাকুরদার কাছে শুনে অবধি, একটু একটু করে চীনে ভাষাও সে আয়ত্ত করে ফেলেছিল। শুনেছি সেকালে চীনে হরপ চিনতেই নাকি সাত বছর লাগত।

এর পর নবার ডাইরির গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলো পড়ে বদ্যিনাথ তাজ্জব বনে গিয়েছিল। ওষুধের নিয়ম প্রাচীন চীন ভাষার পুরনো হরপে লেখা। রাত জেগে নবা তার তর্জমা করে যা বুঝেছিল তাতে তার চুল দাড়ি খাড়া। ঐ ওষুধ নাকি প্রাণ নবীকরণের জন্য ব্যবহার্য এবং অব্যর্থ। মাসে একবার এক চামচ জলে ১ ফোঁটা সেব্য। তাতেই নাকি ভাবনাতীত ফল পাওয়া যায়। ঐ শিশিতে দু-জনের সারা জীবনের ব্যবহারের পরিমাণে ওষুধ ছিল। কুড়ি বছর সেবন করলে প্রায় চির যৌবনের শক্তি আসে দেহে। তখন আর ওষুধ না খেলেও চলে। সেবনকারীদের অপঘাত ছাড়া বড় একটা মৃত্যুও হয় না। অবিশ্যি যদি তারা পবিত্র জীবনযাপন করে। এ ওষুধ নির্দোষ হরিণের পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড থেকে নির্যাস বানিয়ে তৈরি। এতে অলৌকিক কিছু নেই। এই রকম সব লেখা ছিল ঐ কাগজটাতে।

যতই পড়ে নবা, ততই শিউরে ওঠে। চিরযৌবনে তার নিজের লোভ ছিল না। পুরনো ইংরেজি বইতে সে কয়লা থেকে হীরে করার কথাও পড়েছিল। ভাবত ঐ নিয়মটি শিখতে পারলেই বড়লোক হওয়া যায়। তার বড়লোক হওয়ায় বড় ইচ্ছে। এখন মনে হল এতো আরো ভালো। এই তো সোনা তৈরির স্পর্শমণি। বড়লোক বুড়োবুড়ি পাকড়ে মাসে ১ ফোঁটা ওষুধ দেব, ব্যস ওদের বয়স কমে যাবে আমিও লক্ষ লক্ষ টাকা কামাব। ঐ শিশি ফুরোতে জীবন কেটে যাবে। এক জোড়া ধনী বুড়োবুড়িকে একমাত্র মূলধন করে, সুখে শান্তিতে থাকব।

বদ্যিনাথের শ্বশুর বাড়িতে সে সময় নবার মামা ছিলেন কুলগুরু। সঙ্গে সঙ্গে দরকার হলে একটু আধটু কবরেজি ওষুধও দিতেন। পণ্ডিত মানুষ। নবা তাঁর কাছে গিয়ে উঠল আর অল্প দিনেই বুড়ো কর্তা কেশব চৌধুরীর ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান হয়ে পড়ল। খুব ভালো চিকিৎসা করত নবা, এ কথা সে নিজেই লিখেছে। বাড়িতে শুধু কর্তা গিন্নি। তাঁদের একমাত্র সন্তান দীনেশ চৌধুরী আবার নবার সঙ্গে এক টীমে ফুটবল খেলত। কেশব টাকার পাহাড়ের ওপর বসে থাকতেন। এদিকে বেশ হিসাবী ছিলেন।'

সংক্ষেপে এই অবধি বলে, বদ্যিনাথ ডাইরিটা খুলে মাঝে মাঝে দেখে নিতে লাগল। নবা লিখেছে, টাকার স্তূপে বসে থাকে বুড়ো, অথচ একমাত্র ছেলে দীনেশকে আলাদা করে দিয়েছে। দুশো টাকা মাসোহারা আর বাগানের কোণে খুদে অতিথিশালায়

বাস। বলে নাকি, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখতে হবে। ঐ টাকার গাদা থেকে বুড়োকে আলাদা করবার জন্য আমার হাত নিশপিশ করে। টনিক, কাশির ওষুধ, ঘুমের ওষুধ, জোলাপ, এই সব দিই আর বুড়ো দীনেশের বৌ সম্বন্ধে ঝুড়ি ঝুড়ি নালিশ করে। ভীষণ নাকি খরচে, ওর কথায় দিন ওঠে-বসে, বদ-মেজাজী ইত্যাদি। বয়স হয়েছে, কোনদিন না পটল তুলতে হয়, তখন টাকাগুলো সব বৌয়ের হাতে উঠবে, এই ভেবে বুড়োর রাতে ঘুম হয় না।

'একদিন বলে বসল, ''আমাদের বয়সটা ১৫/২০ বছর কমিয়ে দিতে পারেন না, ডাক্তার? আজকাল শুনেছি তোমরা টিকে দাও আর বসন্ত হয় না। তা এই সামান্য জিনিসটার ওষুধ নেই?''

'বুঝলাম মা-লক্ষ্মী আমার হাতে সুযোগ গুঁজে দিচ্ছেন। সেটি ফেললে মহাপাতকী হব। তাই বললাম—তা আছে বৈ-কি। মাসে এক ফোঁটা খেলে পাঁচ বছর করে বয়স কমে যাবে। তবে অনেক দাম। অনেক দিন খেতেও হবে। দীনেশদার পৈতৃক সম্পত্তি অনেকটা কমে যাবে। ভেবে দেখুন।'

'শুনে বুড়ো চিড়বিড় করে উঠল, ''দীনু? দীনু এক কানাকড়িও পাবে না। সব ঐ তাড়কা সুন্দরী (বৌয়ের নাম ছিল তারকাসুন্দরী) সিন্দুকে তুলবে। যত কম বাকি থাকে, আমি তত খুশি। তাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখাচ্ছি। আয়ুটা ৪০/৫০ বছর বাড়িয়ে দিতে পারবে না?''

নবা হেসেছিল, 'প্রায় অমর করে দিতে পারি, স্যার। তবে দু'জনেই খাবেন। মা-ঠাকরুণ সঙ্গে না থাকলে আপনার কষ্ট হবে। আর কাউকে একটা কথা নয়। জানাজানি হলে ওষুধ নিয়ে আমি নিখোঁজ হব।'

বুড়ো বলেছিলেন, 'পাগল নাকি! আমার মুখে কুলুপ। গিন্নিকে কিছু বলে কাজ নেই। ছেলে-বৌয়ের ওদিকে তর সইছে না। পথ চেয়ে আছে, কবে আমরা সগ্‌গে যাব আর ওরা এ বাড়িতে উঠবে। সে গুড়ে বালি। আমরা সহজে মরছি না। ওষুধটা দিয়ে দাও, বাপ।'

তাই দিল নবা, একেকজনকে বড় এক চামচ জলে ড্রপারে করে ১ ফোঁটা। খাওবামাত্র মনে হল ওঁদের চোখগুলো অস্বাভাবিক রকম চকচক করতে লাগল। কাজটা ভালো হল কি না কে জানে।

পরের মাসের ডোজ দেবার সময় দেখা গেল দু'জনার বাঁকা শিরদাঁড়া তক্তার মতো সোজা। তার পরের মাসে মুখের বলীরেখা অদৃশ্য। তার পরের তিন মাসের মধ্যে কুচকুচে কালো চুলে টাক ঢাকল, নড়া দাঁত শক্ত হল, পড়া দাঁত আবার গজাল।

তার পরের মাসে ওষুধ দিতে এসে নবা বলল, 'খবরদার যদি ওষুধের কথা কাউকে বলেছেন!' বুড়ো—আর তাকে বুড়ো বলা কেন?—খিল-খিল করে হেসে

বললেন, 'পাগল না গন্ধ গোকুল? তাই বলি আর সবাই মিলে কেঁচে যাক আর কি! আমি বাপু মাম্! স্পিকটি নট্।' আজকাল কেশব কথায় কথায় ইংরিজি বোলচাল ঝাড়েন। মন ভালো করবার জন্য কলেজ্ জীবনের পোকায়-কাটা বই থেকে হাইড্রোস্ট্যাটিক্সের জটিল অংক কষেন।

এই সব দেখে নবা একটু চিন্তিত না হয়ে পারল না। ব্যাপারটা অন্য লোকেরও চোখে পড়তে বাধ্য। দীনেশ তো চটে কাঁই। বৌয়ের শেখানো কথা চার দিকে বলে বেড়াতে লাগল। 'টনিক খেয়েছেন না আরো কিছু! এই ভাবে ক্রমে বয়স কমার কি মানে হতে পারে? এটা অস্বাভাবিক। কেউ ওদের বিষ খাওয়াচ্ছে। আমি বড় ডাক্তার আনাচ্ছি—

এই অবধি শুনে ধিক্ ধিক্ করে হাসে তার মা চঞ্চলা হরিণীর মতো—তা ছাড়া আর কি? সিঁড়ির দুটো করে ধাপ এক লাফে পেরিয়ে ওপরে পালাবেন। আর বাপ বজ্রমুষ্টিতে টেবিল চাপড়ে গর্জে উঠলেন, 'গেট আউট ! স্কাউন্ড্রেল! তোর দেখছি বড্ড বাড় বেড়েছে। ফের ডাক্তারের কথা মুখে আনবি তো আমি তোকে দেন্ অ্যাণ্ড দেয়ার ত্যাজ্যপুত্র করে দেব। সমস্ত টাকাকড়ি দুঃস্থ বেড়াল নিকেতনে দিয়ে যাবো! গো।' মাথা নিচু করে ছেলের প্রস্থান।

এবার নবা বেশ নার্ভাস বোধ করছিল। সত্যি কথা বলতে কি ওষুধের গুণ দেখে সে নিজেও তাজ্জব বনে গিয়েছিল। কেশব আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখছিলেন। ততক্ষণে গিন্নিও ফিরে এসে পাশে দাঁড়িয়ে নিজের এক গোছা কোঁকড়া চুল চুষছিলেন। নবা বলল, 'ওষুধটা বরং কিছুদিন বন্ধ থাকুক, বড়বাবু।' গিন্নি রেগে গেলেন 'তা তো বটেই! তা আর বলবি নে। কর্তা যে রূপেগুণে তোকেও ছাড়িয়ে গেছেন। হিংসেয় গা জ্বলে যাচ্ছে না? এই দ্যাখ, সবটা খেয়ে ফেলছি। তুই কি করতে পারিস।'

এই বলেই আ সর্বনাশ!! সামনের টেবিল থেকে ওষুধের খুদে সবুজ শিশিটা তুলে সোনালি ছিপি খুলে কাঁচা বেশ খানিকটা গলায় ঢালতে না ঢালতে, কেশব সেটি ছিনিয়ে নিয়ে বাকিটুকু নিজের গলায় ঢেলে দিয়ে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'দেয়ার'!

নবা শিশি বাঁচাবার মোক্ষম একটা চেষ্টা নিয়েছিলেন। কিন্তু টানা-হ্যাঁচড়ার ফলে সেই অমূল্য জিনিসটা ছিটকে শ্বেতপাথরের মেঝেতে পড়ে চক্ষের নিমেষে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। একটু ধোঁয়া মতো উঠল। ধোঁয়া কাটলে দেখা গেল চিমটে ছাই পর্যন্ত বাকি নেই।

দীনেশের মা বাবা হাই তুলতে শয্যা নিলেন। নবা দীনেশকে একটা চিঠি লিখে অসুস্থতার দোহাই দিয়ে এক মাসের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। হয়তো কোনো দূরবাসিনী মাসিপিসিকে দেখতে গিয়ে থাকবে। ভারি কর্তব্যপরায়ণ ছিল ছেলেটা।

মাসের হিসেব করছে। শুনে নবাব হাত-পা হিম। আবার কি সর্বনাশ হল কে জানে! সেই ভর সন্ধ্যায়, নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেল ছুটে বড়কর্তার বাড়ি। দীনেশ দোতলার বারান্দায় পাইচারি করছিল।

'কি হয়েছেটা কি, দীনেশদা? ওষুধটা তো ভালোই।'

দীনেশ কাষ্ঠ হাসল, 'দেখে যাও, তোমার ভালো ওষুধের গুণ।'

তারপর নবাকে তার মা বাবার বড় শোবার ঘরের দরজার কাছে নিয়ে গেল। সে ঘরে দুটি দামী দোলনায় দুটি পরীদের মতো সুন্দর খোকাখুকু হাসিমুখে দোল দিচ্ছে দীনেশের বৌ। তাকে এত খুশি নবা কখনো দেখেনি। ছেলেপুলে নেই বলে তার বড় দুঃখ ছিল!

নবা কপালের ঘাম মুছে বলল, 'খারাপটা কি হল, দীনেশদা? বৌদির দুঃখ ঘুচল। ওঁরা নিজেদের নবীকরণ করতে চেয়েছিলেন, এখন একেবারে নবীন হয়েছেন। তুমি সম্পত্তি চেয়েছিলে, এখন তুমি ছাড়া সম্পত্তি দেখার কেউ নেই।'

দীনেশ একটু ভীতু প্যাটার্নের। সে বলল, 'আত্মীয়স্বজন কেউ যদি মামলা ঠুসে দেয়?'

'দূর! তুমি একমাত্র ওয়ারিশ!'

'যদি কেউ ওঁদের খোঁজ করে? ওষুধের কথা তো কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি তোমাকে দায়ী করব।'

অসম্ভব বুদ্ধি ছিল নবার। শেষ পর্যন্ত তার পরামর্শে এক চিঠি লেখা হল। ইদানীং চোখে ছানি পড়াতে লেখাপড়ার কাজ দীনেশই করত। কেশব খালি সই দিতেন। একটা চিঠি লেখা হল, তাতে বলা হল মা-বাবা অনির্দিষ্টকালের জন্য হিমালয়ে গুরুর আশ্রমে যাচ্ছেন। দীনেশ যেন সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং পত্রপাঠ দুটি অনাথ ছেলেমেয়েকে পুষ্যি নেয়। নিচে কেশবের কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং সইও কপি করা হল।

নবা বলল তাতে কোনো দোষ হয়নি, কারণ ওঁদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্যেই এই সমস্ত ঘোরা পথ ধরতে হয়েছিল। নবাই স্বাক্ষরের সাক্ষী হল।

এ ব্যবস্থায় সব দিক দিয়ে মঙ্গল হল। ছেলেমেয়েকে দীনেশের বৌ বুকে করে মানুষ করল। ভালো স্কুলে লেখাপড়া শেখানো হল। একেবারে সত্যিকার খোকা খুকুর মতো। ওঁদের আগের কথা একটুও মনে ছিল না। নবা লিখেছে-ক্রমে দীনেশদা আর বৌদিও বোধ হয় আগের কথা ভুলে গেলেন।

ছেলেমেয়ে বড় হল। তাদের রূপগুণের প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ। ছেলে বড় এঞ্জিনীয়ার হল, মেয়ের ভালো বিয়ে হল। দীনেশদা শেষ বয়সে কাশীতে চমৎকার বাড়ি কিনে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন। সব ভালো যার শেষ ভালো। ইতি। নবার ডাইরি।'

বদ্যিনাথ খাতা বন্ধ করে বলল,

'কিন্তু সব ভালো নয়, ডাক্তারবাবু। আমি-আমি-ঐ মেয়ের (অর্থাৎ আগে যে কেশবের গিন্নি ছিল, তার) মেয়েকে বিয়ে করেছি। এদিকে দীনেশ চৌধুরীর মা আমার ঠাকুরদার নিজের পিসি ছিলেন। তাহলে গিন্নিও আমার সাক্ষাৎ ঠাকুমা! এমনিতেই সারা দিন এটা কর! ওটা কর! তার ওপর যদি ঠাকুমা হয়, তাহলে আমি কোথায় যাব?' এই বলে বদ্যিনাথ নিজের কপাল চাপড়াতে লাগল।

বুড়ো ডাক্তার বললেন, 'ওকি হচ্ছে? নবা আমার নিজের বাবা। উনি রোমাঞ্চকর উপন্যাস লিখে দীনেশ জ্যাঠা 'নবার ডাইরি' পড়ে মনে মনে খুব চটে, পাঁচশো টাকা দিয়ে পাণ্ডুলিপিটা কিনে নিয়েছিলেন। পাছে ছেপে বেরুলে, লোকে ভাবে ও তো সব বুঝি সত্যি ঘটেছিল। বাবাও খুব খুশি ; প্রকাশকরা যাই বলুক, একজন সমঝদার লোক তো পাঁচশো টাকা দিয়ে পাণ্ডুলিপি কিনেছেন। পরে বাবার কাছে শুনে আমি ওটার অনেক খোঁজ করেছিলাম। বরং আমাকেই দিয়ে যাও, আমি নামধাম বদলে বই করি। বেড়ে গল্প।'

খাতাটা হাতছাড়া করে বদ্যিনাথ যেন বাঁচল। মিথ্যা কে জানে!

ভয়ঙ্কর ভাড়াটে ও পরাশর বর্মা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাড়ি খুঁজে বের করে ভিতরে গিয়ে বসতে না বসতেই প্রথম কবিতার খাতার চাপে দম বন্ধ হবার জোগাড়। একটি দুটি নয়, পাঁচ-পাঁচটি মোটা বাঁধানো খাতা, আর প্রত্যেকটি খাতা আগাগোড়া কবিতায় ঠাসা।

প্রথম খাতা খুলে প্রথম কবিতা পড়েই চক্ষুস্থির!

কবিতাটির নমুনা ঃ

যদি বল, মাঝরাতে ঘুম যেই ভেঙে যায়
ছটফট কর শুধু বিছানায়
আমি বলি ভাব্ না কী?
ঘুম যদি নাহি আসে—
ছাদে গিয়ে দাঁড়াও না খাড়া পায়।
দেখবে শহর ঘুমে মগ্ন।
দূরে কোথা গাড়ি চলে যাচ্ছে
ঠিক যেন মাঝে মাঝে

চিত হয়ে শুতে গিয়ে ঘড়-ঘড় নাক তার ডাকছে।
বিছানায় নিঃসাড়ে ছারপোকা মশারা
যেভাবে কামড় দিতে ব্যস্ত
চোর, বাটপাড় আর বদমাশ যেথা যত—
কোথা নেই কেউ অলস তো।
আহা কিবা মনোহর
তারাদের ঝিকমিক
মনে হয় আকাশেতে কারা করে পিকনিক।
আমি তাই বলি মিছে
যেয়ো নাকো ঘাবড়িয়া
মাঝে মাঝে মন্দ কী?
হলে ইনসোমনিয়া!

কবিতাটি শেষ করে খাতা থেকে মুখ তোলার আগেই লেখকের সলজ্জ মন্তব্য শোনা গেল, 'আমি একটু আধুনিক ধরনের লিখি, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন।'

যাঁরা এ লেখা পড়েছেন, তাঁরাও এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন যে, এ কবিতার লেখক পরাশর বর্মা ছাড়া আর কেউ নয়। নিজের গরজে তাঁরই বাড়ি খুঁজে আজ সকালে এসে পৌঁছাবামাত্র তিনি আনন্দে এমন গদ্গদ যে আসল কথাটা বলবার এখনও সময় পাই নি।

খিদিরপুরের একটি গলির ভিতর বাড়ি। দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তেই হঠাৎ একেবারে কানের কাছে ভারী গলায়—'কাকে চান?' শুনে চমকিয়ে উঠেছি।

কাছে-পিঠে তো কেউ নেই!

এই অশরীরী ধাক্কাতেই মুখ থেকে আপনা হতে বেরিয়ে গেছে, ''আজ্ঞে পরাশর বর্মাকে!'

'নাম বলুন আপনার।' আবার সেই ভুতুড়ে আওয়াজ।

নামটা বলার পরই দরজাটা যেন মন্ত্রবলে খুলে গেছে। কিন্তু ওধারেও তো কেউ নেই।

সত্যিই ঢুকব, না এইখান থেকে সরে পড়ব ভাবছি, এমন সময় ভিতরের ঘর থেকে স্বয়ং পরাশর বর্মাই বেরিয়ে এসেছেন।

'আরে, আসুন, আসুন। আমার কী সৌভাগ্য।' পরাশর বর্মার কণ্ঠে সাদর অভ্যর্থনা।

ভুতুড়ে আওয়াজের অস্বস্তিটা তখনও কাটাতে পারি নি। সন্দিগ্ধভাবে পেছনে একবার তাকিয়ে তাঁর পিছু পিছু ভিতরের ঘরে গিয়ে ঢোকবার পথে জিজ্ঞাসা করেছি, 'ব্যাপারটা কী বলুন তো? এসব ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানার মানে কী?'

'ভুতুড়ে!' প্রথমে একটু অবাক হয়ে পরাশর বর্মা হেসে উঠলেন। 'আরে না

ভুতুড়ে হবে কেন? চাকর-বাকর পাওয়া আজকাল কিরকম শক্ত জানেন তো, তাই একটু—' বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার পরিচয় তাঁর বাড়িতে তারপর আরও অনেক পেয়েছি। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আজ থাক।

সেখানে তারপর ঢুকেছি, সাদাসিধে ভাবে সাজানো সেটি সাধারণ বসবার ঘর। শুধু চেয়ার টেবিলের বদলে দেশী ধরনের নিচু গদি দেওয়া বসবার আসন।

তার একটিতে বসতে-না-বসতেই আক্রমণ শুরু হয়েছে। পরাশর বর্মা এই ঘরে বসেই বোধহয় কাব্য-চর্চা করছিলেন। ঘরটার চারদিকে আমার চোখ বোলানো শেষ হতে না হতেই দেখি, সামনে বাঁধানো খাতাগুলি উপস্থিত।

পরাশর প্রথম খাতাটি তুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনি নিজে থেকে আমার খোঁজ করতে আসবেন ভাবতেই পারি নি। কিন্তু এসেছেন যখন, তখন আপনাকে সব না পড়িয়ে ছাড়ছি না। কী খাবেন বলুন, চা, না কফি?'

বিমূঢ়ভাবে খাতাগুলির দিকে চেয়ে চা, না কফি সায় দিয়েছি মনে নেই।

ভদ্রতার খাতিরে প্রথম খাতাটা হাতেও তুলে নিতে হয়েছে। তারপর নামাবার অবসর পাইনি।

একেবারে কবিতার শিলাবৃষ্টি সমানে চলছে।

প্রথমটির নমুনা আগেই দিয়েছি। আরও একটি না তুলে দিয়ে পারছি না। পরাশর বর্মার এটি নাকি অত্যন্ত প্রিয় কবিতা। কবিতার নাম 'পকৌড়ি'। পকৌড়ি নিয়ে কোন সাহিত্যে আধ্যাত্মিক কবিতা অন্তত কেউ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই।

পকৌড়ি তুমি অতি তুচ্ছ।
আশা তব নয় মোটে উচ্চ।
কী তেলে যে ভাজা হও নাহি তব পরোয়া,
তবু তব স্বাদ কভু পায় নাকো ঘরোয়া।
তেলেভাজা বেসন কি ডালবাটা যাই হোক,
তুমিই সুলভতম রসনার সম্ভোগ।
ও স্বাদের রহস্য কি কোন মশলায়,
জানলে এ দুনিয়ার সব গোল নিটে যায়।
রাস্তার ধুলো সেকি, সকলের মাড়ানো?
ভোজাল তেলের গুণ, বার-বার পোড়ানো?
শুধু তাই নয়, আছে আরো বিশেষত্ব
জনগণ-মন দিয়ে খুঁজে সেই তত্ত্ব।

কবিতার স্রোতে যখন হাবুডুবু খাচ্ছি, এমন সময় কফি এল। এবার আর ভৌতিক কায়দায় নয়, রক্তমাংসের চাকরের হাতে কাঠের ট্রের উপরে।

কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে একটু ফাঁক পেয়ে আসল কথাটা পাড়লাম, 'আপনার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছিলাম পরাশরবাবু।'

'ঠিক আছে। তার জন্যে কিছু ভাববেন না। যে-কটা কবিতা আপনার পছন্দ হয়, সব আপনি নিয়ে যেতে পারেন।' বলে পরাশর বর্মা আবার কবিতা পড়াবার উপক্রম করলেন।

সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, 'আজ্ঞে কবিতা, সেতো নেবই, কিন্তু তার আগে আমার কথাটা যদি একটু শোনেন। একটা রহস্যের কিনারা করতে আপনার সাহায্য চাই।'

'বেশ তো, বেশ তো! কী রহস্যটা বলেই ফেলুন না।' বলে পরাশর বর্মা ভরসা দিলেন।

কিন্তু ঐ ভরসা পর্যন্তই। তাঁর আর-একটি কবিতা তখন পড়া শুরু হয়ে গেছে।

উপায় নেই তাই ঐ কবিতার ফাঁকে-ফাঁকেই কোনরকমে ঘটনাগুলো তাঁকে জানালাম। তাঁর কানে কথাগুলো গেল কি না তাই সন্দেহ।

ফল যে কিছু হবে সে আশা তখন আর নেই। মনে মনে এই কাব্য-পাগলা মানুষটার কাছে রহস্যের মীমাংসা করতে আসাটাই আহাম্মকি হয়েছে বলে নিজেকে এখন দোষ দিচ্ছি। কবে কি সামান্য একটা রহস্যের কিনারা করেছিলাম বলে তার বুদ্ধিশুদ্ধি সম্বন্ধে অত উঁচু ধারণা করাই অন্যায় হয়েছে মনে হচ্ছিল।

রহস্যের মীমাংসার আর দরকার নেই। এ লোকের হাত থেকে ছাড়া পেলেই এখন বাঁচি!

নিজের বক্তব্য শেষ হবার পর ভদ্রতার খাতিরে আরও ঘন্টাখানেক কবিতা শুনে মাথা যখন ঝিম-ঝিম করছে, তখন একটু ফাঁক পেয়ে বললাম, 'আজ আমার একটু কাজ আছে পরাশরবাবু। তাই এখন না উঠলে নয়।'

বেশ একটু হতাশ হয়ে পরাশর বর্মা বললেন, 'এক্ষুণি উঠবেন? কিন্তু সবে তো একটি খাতাই মোটে শেষ হয়েছে।'

সভয়ে অন্য খাতাগুলোর দিকে চেয়ে বললাম, 'একটা খাতাতেই যা পেলাম তাই আগে সামলাই দাঁড়ান। এত ভাল জিনিস সব একসঙ্গে হজম করতে পারব না যে!'

কথাটার মধ্যে বিদ্রুপের সুরটা খুব প্রচ্ছন্ন ছিল না। পরাশর বর্মা খুশী হয়েই বললেন, 'তা ঠিক বলেছেন, আবার একদিন শোনানো যাবে, কী বলেন?'

আমার উৎসাহের অভাবটা লক্ষ্য না করেই পরাশর বর্মা আবার বললেন, 'কিন্তু আপনার রহস্যের কিনারাটা তো করে ফেলতে হয়।'

এবার অসন্তোষটা গোপন না করেই বললাম, 'না থাক, তার আর দরকার নেই।'

পরাশর বর্মা এবারও উল্টো বুঝলেন। যেন প্রসন্ন হয়েই বললেন, 'ও নিজেই এর মধ্যে মীমাংসা করে ফেলাই অবশ্য উচিত। রহস্যটা এমন কিছু নয়।'

'এমন কিছু নয়!' রাগব না অবাক হব বুঝতে না পেরে বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বললাম, 'রহস্যটা কী, না জেনেই বলছেন—এমন কিছু সেটা নয়?'

'বাঃ'—পরাশরই এবার যেন অবাক। 'রহস্যটা না জেনে কীরকম? আপনি এতক্ষণ ধরে বললেন কী তাহলে?'

'আমি তো বলেছি, কিন্তু আপনি তো নিজের কবিতা পড়তেই মত্ত। শুনেছেন আমার কথা কিছু?'

'শুনিনি মানে?' এবার পরাশর হাসলেন, 'আচ্ছা, আমিই তাহলে ব্যাপারটা বলি, আপনি মিলিয়ে নিন ঠিক হচ্ছে কি না! ব্যাপারটা সংক্ষেপে হল এই আপনাদের পাড়ায় একটি বাড়ি আছে। পুরানো ভাঙা বাড়ি, কিন্তু বছর দু-এক আগে এক অবাঙালী ভদ্রলোক সেটা কিনে মেরামত করিয়ে প্রায় নতুন করে তোলেন। ভদ্রলোকের নাম এস্ কাউল। তাঁর কোন কুলে কেউ আছে বলে আপনারা জানতে পারেন নি। ভদ্রলোক একাই বাড়িতে থাকতেন সঙ্গী শুধু একটি কুকুর। কাউল সাহেব খুব মিশুক লোক নয়। পাড়ায় কারুর সঙ্গে বিশেষ আলাপ পরিচয় তাই তিনি করতেন না। তবে মাঝে মাঝে বাড়িতে জাঁকজমক করে উৎসব, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার হত। হোমরাচোমরা বড়লোক, ব্যবসাদার, কারখানার মালিকরাই সাধারণত আসতেন। বড়-বড় গাড়িতে ভর্তি হয়ে যেত। নাচ-গানের ব্যবস্থাও থাকত। আপনারাও কেউ-কেউ এইসব উৎসবের দু-একটিতে নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। অত লোকের ভিড়ের মধ্যে কাউল সাহেবের সঙ্গে বিশেষ আলাপের সুযোগ হয় নি। কিন্তু তার নিজের সাজগোজ থেকে তাঁর বাড়ির সবকিছু ব্যবস্থার মধ্যে তাঁর রুচির পরিচয়। তাঁর অমায়িক ব্যবহার, বিশেষ করে রেশমী পাকা চুল দাড়ির ভিতর দিয়ে তাঁর মুখের সৌম্য প্রসন্নতা আপনাদের ভাল লেগেছে। কথা তাঁর মুখে কমই শুনেছেন। শুধু বাংলা বলতে পারতেন না বলে নয়, ভদ্রলোক কথাই বলতেন কম।

বাড়িটা তখনই আপনাদের অদ্ভুত লাগত।

উৎসব হয়ে যাবার পরদিন সকালেই আবার নিঝুম। মাঝে-মাঝে কুকুরের ডাক ছাড়া বহুকাল আর তারপর সেখানে কোন সাড়াশব্দই পাওয়া যেত না। মনে হত উৎসবটাই যেন শেষ স্বপ্ন। ওই ভুতুড়ে গোছের নির্জন বাড়ি যে একরাত্রে আলোয় ঝলমল মানুষ জনে গমগম করে উঠেছে, তখন বিশ্বাসই হতে চাইত না।

মাঝে মাঝে কাউল সাহেবকে বাড়ি থেকে বেরুতে কি ঢুকতে অবশ্য দেখা যেত। বাড়ির দরজার সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে দরজায় তালা দিয়ে তিনি শুধু একটা ছড়ি হাতে ট্যাক্সিতে উঠে কোথায় যে যেতেন আপনারা জানেন না।'

পরাশর বর্মা একটু থামতেই সবিস্ময়ে বললাম, 'আশ্চর্য!'

পরাশর একটু হেসে বললেন, 'আশ্চর্যটা কী? সব কথাই আপনার শুনেছি, এই তো? দাঁড়ান আগে বাকি সবটা মেলে কিনা দেখুন।'

পরাশর বলতে শুরু করলেন আমাকে থ বানিয়ে, 'শেয়ার মার্কেট বা ঐরকম কোনও জায়গায় যে তিনি যেতেন এইটে আপনারা অনুমান করতেন মাত্র। এ নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা ঘামায়নি। দরকারও হয়নি। একদিন শুধু পাড়ার ছেলেরা ঐ বাইরের দরজাতেই সরস্বতী পূজোর চাঁদার জন্যে তাকে ধরেছিল। তিনি কড়কড়ে একটি একশো টাকার নোট এতটুকু দ্বিধা না করে চাঁদা হিসেবে দিয়ে যথারীতি দরজায় তালা দিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে চলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু একদিন হঠাৎ সেই যে দরজায় তালা দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেছেন আর ফেরেন নি। তাঁকে বাড়ি থেকে বেরুতে অবশ্য কেউ দেখেননি। কিন্তু পরপর কয়েকদিন দরজার সামনে তালা ঝুলতে দেখে আপনাদের কেমন আশ্চর্য লেগেছে।

কাউল সাহেব গেলেন কোথায়?

দিনের বেলায় যে যার নিজের ধান্দায় থাকেন, অত খেয়াল থাকে না। কিন্তু রাত্রে সেই বাড়ির থেকে কুকুরের ডাক শুনে হঠাৎ মনটা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে। কাউল সাহেবের হল কী?

দিন-কয়েক এমনি কাটাবার পর পাড়ার অনেকেই একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু করবার তো কিছু নেই। তালা ভেঙে পরের বাড়িতে তো ঢোকা যায় না। যা রাগী কুকুর, সেটা নিরাপদও হবে না। আর পুলিশে খবর দেবার মত কিছু হয়েছে কিনা তখন তাও বুঝতে পারছেন না।

একটা কিছু করা দরকার আপনাদের মনে হল। আপনাদের ছাড়া আরও অনেকের যে তা হয়েছে, পরের দিন বুঝতে পারলেন। ছুটির দিন। পরের পর বড়-বড় মোটর আসে আর দরজায় তালা দেখে হতাশ হয়ে চলে যায়। কেউ-কেউ আপনাদের কাছে খোঁজখবরও নিলে। আপনারা কী আর জানেন যে বলবেন। আপনারাই বরং শুনে অবাক হলেন যে যারা এসেছে তাদের অধিকাংশই পাওনাদার। শুনলেন অনেকেই নাকি কাউল সাহেবের কাছে অনেক টাকা পায়। ফাটকা বাজারে কাউল সাহেব নাকি বড় দাঁও মারতে গিয়েই কাত হয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। পাওনাদাররা নাকি একজোট হয়ে তাঁর বাড়িটা নিলামে তোলার ব্যবস্থা করছেন। এও কদিন বাদে শুনলেন।

কিন্তু বাড়ি নিলামে আর উঠল না। কাউল সাহেব উধাও হবার হপ্তাখানেক বাদেই একদিন দেখেন, বাড়ির বাইরের দরজার তালা খোলা। ভিতরে মিস্ত্রি লেগেছে, আবার বাড়ি মেরামত আর চুনকাম করতে।

ব্যাপার কী? কে এলেন আবার এ বাড়িতে?

আপনাদের কৌতূহলী হয়ে বেশীক্ষণ থাকতে হল না। বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে না যেতে বাড়ির নতুন মালিক নিজেই গায়ে পড়া হয়ে এসে আলাপ করলেন আপনাদের সঙ্গে। মনে হল বেশ মিশুক। খালি গায়ে ধবধবে পৈতের সঙ্গে কাঁধে গামছা ফেলা। পরনে আটহাত খাটো ধুতি, পায়ে খড়ম। বেলের মত চাঁছাছোলা

মাথা ভর্তি টাক, কামানো গোল মুখের সঙ্গে যেন মানানসই করে তৈরি। কথায় একটু রাঢ় দেশের টান। ভদ্রলোক নিজে থেকেই আলাপ পরিচয় করেছেন ও সারাক্ষণ নিজের কথাই বলেছেন। এসেছিলেন কিছু জানা যায় কি না চেষ্টা করে দেখতে। ভদ্রলোকের অনর্গল কথার তোড়ে দিশেহারা হয়ে মনে হয়েছে, ছাড়া পেলে বাঁচেন।

ভদ্রলোকের নাম বিশ্বম্ভর রায়। তাঁর সব কথায় শুনেছেন। কাউল সাহেবের তার সব পাওনাদারের মত তিনিও কেমন করে ফাঁকে পড়তে বসেছিলেন, নেহাত বরাতজোরে কী করে কাউল সাহেবের অন্তর্ধানের আগে তাঁর কাছ থেকে বাড়িটা নিজের নামে কিনে নিতে পেরেছেন, বাড়িটা পেয়েও এখনও কী গণ্ডগোল তাকে পোহাতে হচ্ছে, অন্য পাওনাদাররা সারাদিন কিভাবে এসে জ্বালাতন করছে, কেউ কেউ বাড়ি বিক্রি নাকচ করবার চেষ্টাও নাকি করছে—এইসব কাহিনীই তিনি বলে গেছেন।

কাউল সাহেবের উধাও হওয়া যত অদ্ভুতই হোক, দু চার দিন বাদে আপনারাও ব্যাপারটা প্রায় ভুলতে বসেছিলেন। এমন সময় আপনাদেরই পাড়ারই যে মিউনিসিপ্যাল পুকুরটায় ছেলেরা সাঁতার শেখে, তার তলা থেকে একটা ছড়ি একটি ছেলে ডুব দিতে গিয়ে তুলে এনেছে। সে ছড়িটা এমন কিছু আশ্চর্য জিনিস নয়, তবু আপনাদের দু একজনের মনে হয়েছে, ঠিক এইরকমই ছড়ি যেন কাউল সাহেবের হাতে আপনারা দেখেছেন। ব্যাপারটা এত সামান্য এ নিয়ে পুলিশে যাওয়া যায় না, অথচ মনের সন্দেহ দূর হয় না।

ক-জনে মিলে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রহস্যটা যেন গভীর হয়ে উঠেছে। আপনাদের মনে পড়েছে যে বিশ্বম্ভরবাবু কখন কবে যে তালা খুলে ও-বাড়িতে ঢুকেছেন আপনারা কেউই দেখেননি। সেটাও না হয় অগ্রাহ্য করা গেল, কিন্তু বিশ্বম্ভরবাবুর চাল-চলনও কেমন অদ্ভুত মনে হয়েছে। এবার সেই প্রথম ক-দিন সকলের সঙ্গে মেলামেশার পর তিনি যেন ডুব মেরেছেন একেবারে। মিস্ত্রি মজুর বাড়িতে আর খাটছে না। তালা দেওয়া না হলেও দরজা বন্ধই থাকে বেশীর ভাগ। রাত্রে মাঝে-মাঝে কুকুরের ডাক ছাড়া বাড়ি আগেকার মতই যেন নিস্তব্ধ।

এর মধ্যে পাড়ার একটি রাস্তায় এক রাত্রে কাউল সাহেবের সেই কুকুরটাকে একটি ছেলে নটার শো-র বায়োস্কোপ ভাঙবার পর বাড়ি ফেরবার পথে দেখতে পায়। বিশ্বম্ভরবাবুকেও নাকি গভীর রাত্রে কেউ-কেউ ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে নির্জন রাস্তায় হাঁটতে দেখেছে। তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে কিন্তু ফল হয়নি কিছু। তিনি যেন বুঝতে পেরে এদিক-ওদিক ঘুরে বাড়িতেই ফিরে এসেছেন।

সমস্ত ব্যাপারটা জড়িয়ে আপনাদের মনে একটা দারুণ সন্দেহ জট পাকিয়ে

উঠেছে। কাউল সাহেব সত্যিই দেনার দায়ে পালিয়েছেন, না তাঁর অন্তর্ধান হওয়ার ব্যাপারে অন্য কোন রহস্য আছে? কাউল সাহেবের সঙ্গে বিশ্বম্ভরবাবুর সম্পর্কটা কী ও কতটা তা নিয়েও আপনাদের মনে সন্দেহ জেগেছে। শুধু নিজেদের মনের এই সন্দেহ নিয়ে পুলিশের কাছে যাওয়া এক্ষুনি সঙ্গত হবে কি? ঠিক করতে না পেরে আমার কাছে এসেছেন। কেমন?'

উত্তর দেবার আগে বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে পরাশর বর্মার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বললাম, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন সমস্ত ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।'

সাঙ্ঘাতিক কিছু এর ভিতর থাকতে পারে বলে মনে হচ্ছে, তাই না?'

বাধ্য হয়ে স্বীকার করলাম যে আমাদের আশঙ্কা সেইরকম।

পরাশর বর্মা গম্ভীর হয়ে খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'যেমন কাউল সাহেব পালিয়ে যায় নি, তাকেই কেউ হয়ত সরিয়ে ফেলেছে—পুকুর থেকে ছড়িটা পেয়ে এইরকম অনুমানই হয়।'

উৎসাহিত হয়ে উঠে বললাম, 'আমরা ঠিক তাই ভেবেছি। শুধু ছড়িটা পাওয়া গেলেও লাসটা কেন পাওয়া যায় নি তাই বুঝতে পারছি না।'

'লাসটা তো বাড়ির ভিতরেই থাকতে পারে?' পরাশরের গলা অত্যন্ত গম্ভীর।

অবাক হয়ে বললাম, 'বাড়ির ভিতর? তাহলে?'

'তাহলে লাশ আর খুনে দুইই যাতে ধরা পড়ে তার ব্যবস্থা এখুনি করা দরকার।' বলে পরাশর পাশের ফোনটা তুলে নিলেন।

'ওকি ফোন করছেন কোথা??' সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

ততক্ষণে ফোনের নম্বর ঘোরানো হয়ে গেছে।

'হ্যালো।' বলে পরাশর যাঁর নাম করলেন, তিনি যে পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগের মস্ত বড় কর্মচারী তা জানি বলে আমি আরও অবাক।

বিমূঢ়ভাবে পরাশরের ফোনের আলাপ শুনতে লাগলাম।

'হ্যাঁ, আমি পরাশর। না না গদাধর না, পরাশর—হ্যাঁ, পরাশর বর্মা, কবি পরাশর বর্মা। না না, কবিতা শোনাতে ডাকছি না। ডাকছি তোমাদেরই একটু উপকারই করতে। নিতাই মুস্তোফি স্ট্রীটের এস, কাউল সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল আছে কি? বেশ! তার অন্তর্ধান-রহস্যের কিনারা করতে চাও? কাউল সাহেবকে কেউ সরিয়েছে সন্দেহ করছ? ভাল ভাল। আমাদের কৃত্তিবাসবাবুরও সেই মত। কৃত্তিবাসবাবু কে? চিনবে না ঠিক। সাহিত্যের খবর তো রাখ না, তিনি মস্তবড় এক কাগজের সম্পাদক। কবিতা শুনতে এসেছেন আমার বাড়িতে। যাক, এখন ওসব কথার সময় নেই। কাউল সাহেবের লাস পাচ্ছ না? পাবে লাস আর খুনী একসঙ্গেই। এখুনি চলে যাও মুস্তোফি স্ট্রীটে। বিশ্বম্ভরবাবুকে এখনও পেতে পার। ওয়ারেন্ট নিয়ে যাও সঙ্গে।

একেবারে দেখামাত্র গ্রেফতার। হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রেফতার। প্রমাণ? প্রমাণ তিনি নিজেই। তাঁর অনেক কীর্তি ঘাঁটলে বেরুবে। হ্যাঁ, তিনিই লাস, তিনিই খুনী।

ওধারে গোয়েন্দা-বিভাগের উচ্চ কর্মচারী, আর এধারে আমাকে সমানভাবে বিমূঢ় করে পরাশর বর্মা ফোনটা তৎক্ষণাৎ নামিয়ে রেখে দিলেন। বিস্ময়ের ধাক্কাটা একটু সামলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন নাকি? না, আপনাদের মধ্যে এরকম ঠাট্টা ইয়ার্কি চলে?'

'ঠাট্টা ইয়ার্কি!' পরাশর হাসলেন। 'পুলিশের লোকের সঙ্গে এমনি যত বন্ধুত্বই থাক, সকল ব্যাপারে ঠাট্টা ইয়ার্কি চলে না।'

'তার মানে? বিশ্বম্ভরবাবু কাউলের লাস আর খুনে—এ কথার মানে কী?'

'মানে যা বলেছি তাই। কাউল বলে কেউ নেই। বিশ্বম্ভর রায়ই কাউল সেজে দুনিয়াসুদ্ধ সকলকে ঠকিয়েছেন, এখন বিশ্বম্ভর হয়ে জাল গুটিয়ে আবার অন্য মৃগয়ায় যাবার তালে আছেন। তখন বাংলা বলতেন না, সাদা দাড়ি গোঁফ দিয়ে সৌম্য বিদেশী সেজে থাকতেন ; এখন আবার বাংলা চেহারাটা বের করেছেন। সকলকে ফাঁকি দেবেন বলেই যেখানে যা পেয়েছেন হাতিয়ে নিয়ে বাড়িটি নিজেকেই অন্য নামে বিক্রি করে গেছেন।'

'কিন্তু চোখে কিছু না দেখে শুধু আমার কাছে গল্প শুনে আপনি এ রহস্য বুঝলেন কী করে?'

'বুঝলাম কুকুরের ডাকে?'

'কুকুরের ডাকে।'

'হুঁ, কুকুরের ডাকে। যুধিষ্ঠিরের বেলায় যম কুকুর সেজেছিলেন, আর বিশ্বম্ভরবাবুর বেলায় কুকুরই যম হল। কাউল সাহেব উধাও হবার পরও আপনারা বাড়িতে কুকুরের ডাক শুনেছেন। আপনিই বলেছেন, কুকুরটা হিংস্র। হিংস্র কুকুর হলে মনিব ছাড়া আর কারুর সঙ্গে এক বাড়িতে কিছুতেই থাকত না। সে যে বন্ধ থাকে কোনও ঘরে তাও নয়, কারণ একদিন তাকে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে একজন দেখেছেন। সেদিন কোনরকমে দরজা খোলা পেয়ে কুকুরটা বেরিয়েছিল, আর বিশ্বম্ভরবাবুও তাকে খুঁজতে নির্জন রাস্তায় রাত্রে বেরিয়েছিলেন। বিশ্বম্ভরবাবু সব ভোল পাল্টেছিলেন, শুধু কুকুরটার প্রতি মায়ায় তাকে কোথাও সরিয়ে দিতে কি মেরে ফেলতে পারেন নি। আশা করি এতক্ষণে পুলিশের গাড়ি রওনা হয়ে পড়েছে তাঁকে ধরতে।'

মুখ থেকে আপনা থেকে বেরিয়ে গেল, 'সত্যি কী বলে যে আপনার প্রশংসা করব ভেবে পাচ্ছি না।'

পরাশর বর্মা সলজ্জে একটু হেসে বললেন, 'তাহলে কোন কবিতাগুলো নেবেন?'

সবুজ রাক্ষস

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

একদিন রাত্রিকালে আমি শয়ন করিয়া আছি। অঘোর নিদ্রায় আমি অভিভূত আছি! বাহির-বাটিতে আমার ঘর, আর ভিতরটিতে পাল মহাশয়ের ঘর,—এই দুই ঘরের মাঝখানে যে দেয়াল, সেই দেয়ালের ঠিক গায়ে আমার বিছানা ছিল। সহসা পাল মহাশয়ের দিক হইতে সেই দেয়ালের গায়ে গুপ-গুপ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। শুইয়া শুইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে শব্দ করে?'

তাঁহার ঘর হইতে পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, 'শীঘ্র উঠিয়া বাহিরে এস। বিশেষ প্রয়োজন আছে। গোল করিও না।'

আমি উঠিয়া প্রথমে ঘড়িতে দেখিলাম যে রাত্রি তখন দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। দ্বার খুলিয়া আমি বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। পাল মহাশয়ও সেই সময় আপনার ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় দ্বারের খিল খুলিলেন। আমার দিকে সেই দ্বার শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ ছিল। পাল মহাশয় আমাকে সেই শৃঙ্খল খুলিতে বলিলেন। আমি শৃঙ্খল খুলিলাম। ভিতর বাটি এক হইয়া গেল। এই সময়

আমি দেখিতে পাইলাম যে, লাঠি ধরিয়া কে একজন অতি ধীরে ধীরে পাল মহাশয়ের সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিবার উপক্রম করিতেছে, আর প্রদীপ হাতে লইয়া পাল মহাশয়ের গৃহিণী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। ভালরূপে দেখিয়া আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম। সে নিয়োগীর পীড়িত পুত্র। শয্যাশায়ী মরণাপন্ন রোগী এত রাত্রিতে কেন যে আসিয়াছে, তাহা ভাবিয়া আমি ঘোরতর বিস্মিত হইলাম।

পাল মহাশয় চুপি-চুপি আমাকে বলিলেন, 'আস্তে কথা কহিও। বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার ঘরের ভিতর এস। তাহার পর সকল কথা তোমাকে বলিব।'

পাল মহাশয়ের আজ্ঞায় বারান্দার দ্বারে খিল দিয়া নিঃশব্দে আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। পাঁচ ছয় পা গিয়াই পাল মহাশয়ের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলাম। পাল মহাশয় ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমিও প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়—সর্বনাশ! চহিয়া দেখি, তাঁহার ঘরের ভিতর এক রাক্ষস! ঘরের মাঝখানে মাদুরের উপর আসন-পিড়ি হইয়া রাক্ষস মহাশয় গট্ হইয়া বসিয়া আছে। আরও আশ্চর্যের কথা, লজ্জা সরমের মাথা খাইয়া পাল মহাশয়ের কন্যা সেই মাদুরের এক পার্শ্বে বসিয়া আছে!

ভয়ে আমার পা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম যে, আর কিছু নয়, পাল মহাশয় এই রাক্ষসকে জামাতা করিয়াছেন। জল-খাবার স্বরূপ আমার দেহটি তাহাকে প্রদান করিবার নিমিত্ত এই ঘোর রাত্রিতে তিনি আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন।

যাহা হউক, আমি তাঁহার ঘরের ভিতর আর প্রবেশ করিলাম না। প্রাণ লইয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে পালাইবার উপক্রম করিলাম। কিন্তু পাল মহাশয় খপ করিয়া আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। আমার হাত ধরিয়া তিনি বলিলেন. 'কোথা যাও?'

আমি তাঁহার পায়ে পড়িলাম। তাঁহার পা দুইটি জড়াইয়া আমি বলিলাম, আমি একেলা মায়ের একেলা ছেলে! দোহাই আপনার।

পাল মহাশয় বলিলেন, 'সে আবার কী?'

আমি বলিলাম, 'দোহাই আপনার! আপনার উনি জামাতা, উনি বোধহয় বিভীষণের প্রপৌত্র! উনি দেবতা! আমাকে খাইয়া উনি সুখ পাইবেন না। উনি বরং আসিয়া টিপিয়া দেখুন, আমার গায়ে মাংস নাই, আমার গায়ে সব হাড়।'

পাল মহাশয় বলিলেন, 'এ বলে কী।'

আমি বলিলাম, 'আমাকে ছাড়িয়া দিন। রাক্ষস মহাশয়ের নিমিত্ত আমি ভাল মোটা তাজা মানুষ ডাকিয়া আনিতেছি। তাহার কোমল মাংস ভক্ষণ করিয়া রাক্ষস মহাশয় পরম তৃপ্তিলাভ করিবেন। জামাতার আদর করিয়া আপনিও সন্তোষ লাভ করিবেন;—আমাকে খাইয়া তাঁহার সুখ হইবে না। এ চাষার মাংস। স্বহস্তে আমরা চাষ করি। আমাদের মাংস শুষ্ক ও কঠিন,—ঠিক দড়ির মত। দোহাই আপনার।'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, 'তোমাকে আর কী বলিব। তুমি মানুষ না কী।

তাহাই আমি বুঝিতে পারি না। রাক্ষস আবার কোথায়? আমার এত বয়স হইয়াছে, কিন্তু রাক্ষস আমি কখনও দেখি নাই। ইনি আমার পুত্র। বিপদে পড়িয়া আমার পুত্রকে ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইয়াছে। এই যে পরচুলের দাড়ি গোঁফ আর এই যে মুখোস,—যাহা দেখিয়া তুমি এত ভয় পাইয়াছ।'

নিজের বড়াই করিতে নাই; কিন্তু স্বভাবত আমি যে একজন সাহসী পুরুষ, সে পরিচয় বোধহয় আর আপনাদিগকে দিতে হইবে না। প্রকৃত রাক্ষস না হউক, রাক্ষসের মত তো বটে? সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের হাতে পড়িয়াও আমি ধৈর্য ধরিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহাই আমার সাহসের যথেষ্ট পরিচয়। আপনারা হইলে ভয়ে হয়ত কত কি করিয়া ফেলিতেন। তাহার পর বলিলে হয়ত আপনারা বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু সত্য বলিতেছি কিছুমাত্র ভয় না করিয়া রাক্ষসের মুখোস আমি টিপিয়া দেখিলাম, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ভয় হইল না। এখন আপনারা বুঝিয়া দেখুন, আমার কত সাহস।

যখন আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে সে বস্তুটা মুখোস বটে, রাক্ষসের মুণ্ড বা অন্য কোন ভয়াবহ পদার্থ নহে, তখন আমি উঠিয়া বসিলাম। বসিয়া আমি পাল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী জন্য আপনার পুত্রকে এরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইয়াছে।'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, 'সে অনেক কথা। বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিবার সময় নাই। আপাতত আমরা ঘোর বিপদে পড়িয়াছি। শীঘ্র তাহার প্রতিকার না করিতে পারিলে আমাদের সর্বনাশ হইবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই রাত্রি দুই প্রহরের সময় বিপদ কোথা হইতে আসিবে?'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, 'আমার পুত্রের নাম মিহির। মিহির এক খুনী মোকদ্দমায় পড়িয়াছে। দুই বৎসর পূর্বে সে ঘটনা ঘটিয়াছে। মিহির সে লোককে খুন করে নাই; কিন্তু সমুদয় দোষটি তাহার ঘাড়ে পড়িয়াছে। সেজন্য এই দুই বৎসর নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সে পথে-পথে ফিরিতেছে। দুঃখের কথা বলিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়, বাবা আমার কতই না কষ্ট ভোগ করিতেছে। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রাত্রিকালে অতি গোপনে সে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করে। আমাদের নিকট আসিতে তাহাকে আমি বার-বার মানা করিয়াছি; কিন্তু আমাকে, তাহার গর্ভধারিণীকে ও তাহার ভগিনীকে না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না। মিহির যদি আজ ধরা পড়ে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার ফাঁসি হইবে। কারণ সে যে খুন করে নাই, সে যে সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ তাহা প্রমাণ করিবার উপায় নাই। এ বিষয়ে যদি তুমি কোনওরূপে সহায়তা করিতে পার সেইজন্য তোমাকে ডাকিয়াছি।'

আমি বলিলাম, 'ঘরে তলোয়ার আছে? থাকে তো দিন, আমি লড়াই করিব।'

পাল মহাশয় বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, 'তুমি পাগল নাকি? কাহার সহিত তুমি লড়াই করিবে? পুলিশের সহিত লড়াই করিবে?'

আমার ভয় হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পুলিশ এ স্থানে কী করিয়া আসিবে? পুলিশ কী করিয়া জানিবে যে আপনার পুত্র মিহির এ বাটিতে আসিয়াছে?'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, 'তাহাই তো ভয়! সেই বিপদেই তো এখন আমি পড়িয়াছি; আর সেইজন্যই তো তোমাকে আমি ডাকিয়াছি। কী করিব, কিছুই আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। পুলিশের লোক এখনি হয়ত আসিয়া উপস্থিত হইবে। নিয়োগী থানায় খবর দিতে গিয়াছে।'

বিস্মিত হইয়া আমি বলিলাম, 'নিয়োগী।'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, 'হ্যাঁ নিয়োগী। তাহার পুত্র বেচুর সহিত আমার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বেচুর এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে সে বিবাহ আমি কিছুতেই দিতে পারি না। সেই কথা শুনিয়া আমার উপর নিয়োগীর অতিশয় রাগ হইয়াছে। সে দেখিয়াছে আমার পুত্র মিহির ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আমার বাটিতে আসিয়াছে। নিয়োগী সেই খুনের কথা সমুদয় অবগত আছে। তাহার পুত্র ও আমার পুত্র হুগলিতে এক বাসায় থাকিয়া লেখা-পড়া করিত, সেই বাসাতেই এই খুন হয়। নিয়োগী-পুত্রের পরামর্শে ও সহায়তায় আমার পুত্র পলায়ন করে। আজ রাত্রিতে মিহিরকে আসিতে দেখিয়া সে থানায় সংবাদ দিতে গিয়াছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কী করিয়া জানিলেন যে সে থানায় খবর দিতে গিয়াছে?'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, 'নিয়োগীর পুত্র বেচু আসিয়া আমাকে এইমাত্র বলিয়া গেল। বেচু এখন আর বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। তথাপি লাঠি ধরিয়া অতি কষ্টে সে এইমাত্র আসিয়াছিল। তাহার পিতা যে ঘোর অন্যায় কাজ করিতেছে, তাহা বোধহয় সে বুঝিতে পারিয়াছে। সেজন্য আমাকে সে সকল কথা বলিয়া গেল।'

আমি বললাম, 'মিহির এইবেলা অশ্বত্থ গাছ দিয়া পলায়ন করুক না কেন?'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন, 'তাহার জো নাই। বেচু বলিয়া গেল যে সদর দরজায় একজন কনস্টেবল দাঁড়াইয়া আছে। সেদিক দিয়া পলায়ন করিবার উপায় নাই। পশ্চিমে গলির রাস্তায় এই জানালার পাহারা দিতেছে। দুই পথে দুইজনকে পাহারা রাখিয়া নিয়োগী থানায় গিয়াছে।'

আমি বাটির উত্তর ও পূর্বদিক পানে চাহিয়া দেখিলাম। সেই দুইদিক একেবারে ভয়; সে-দুইদিক দিয়া পলায়ন করিবার কোন উপায় নাই। তাহার পর আমি ছাদে উঠিবার সিঁড়ির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সিঁড়িও একেবারে ভগ্ন; ছাদে উঠিবার উপায় নাই। পলায়ন করিবার কোন উপায় আমি দেখিতে পাইলাম না।

মিহির এতক্ষণ মাতার নিকট বসিয়া ছিল। খাইবার নিমিত্ত মাতা তাহাকে কিছু

মিষ্টান্ন দিয়াছিলেন, মিহির খাইতে অস্বীকার করিতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে, আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে খাইবার নিমিত্ত মাতা তাহাকে জেদ করিতেছিলেন। মাতার অনুরোধে মিহির সন্দেশ ভাঙিয়া একটু মুখে দিয়া জল পান করিল। তাহার পর সে মাতাকে বুঝাইতে লাগিল।

মিহির বলিল, 'মা! তুমি জননী। আমার দেবতা! তোমার সাক্ষাতে আমি সত্য বলিতেছি যে আমি সে ছোকরাকে খুন করি নাই। দুইজনে আমরা এক ঘরে থাকিতাম। চিরকাল তাহাতে আমাতে বড় ভাব ছিল। বাবার সহিত তাহার বাপের মোকদ্দমা আরম্ভ হইলেও তাহাতে আমাতে ভাব যায় নাই। তবে, যে রাত্রিতে সে খুন হয়, সেইদিন সন্ধ্যাবেলা তাহাতে আমাতে একটু বচসা হইয়াছিল। কিন্তু সে অন্য কথা লইয়া, মোকদ্দমার কথা নয়। যাহা-হউক, সে ঝগড়া কোন কাজের নয়, কথার তর্ক-বিতর্ক মাত্র। তাহার পর আমরা একসঙ্গে কত কথা কহিলাম, একসঙ্গে আহার করিলাম, এক ঘরে শয়ন করিলাম। রাত্রি দুইটা কি তিনটার সময় আমাকে একবার বাহিরে যাইতে হইল। বাহির হইতে আসিয়া পুনরায় ঘরের ভিতর যেই প্রবেশ করিয়াছি, আর সেই সময় বেণীর বিছানার নিকট হইতে কিরূপ একটা ঘড়-ঘড় শব্দ আমি শুনিতে পাইলাম। যে ছোকরা খুন হইয়াছে, তাহার নাম বেণী ছিল। আমি ভাবিলাম, বেণী বুঝি কিরূপ কুভাবে শয়ন করিয়াছে, তাই সে এইরূপ শব্দ করিতেছে। তাহাকে ঠেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতে বলিব, এইজন্য আমি সেই অন্ধকার ঘরে তাহার বিছানার দিকে যাইতে লাগিলাম। সহসা আমার পায়ে মানুষের পা ঠেকিয়া গেল। তখনও আমি কোন বিপদের আশঙ্কা করি নাই। তখন আমি ভাবিলাম যে, বেণী ঘুমের ঘোরে তক্তাপোষ হইতে পড়িয়া গিয়াছে। বেণী, বেণী বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে আমি তাহাকে তুলিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমি দেখিলাম যে তাহার সর্বশরীর অবশ হইয়া গিয়াছে, আর তাহার গলা দিয়া সেই ঘড়-ঘড় শব্দ হইতেছে; আর সেই সময় আমার পায়ে জল অপেক্ষা ঘন কি-সব লাগিয়া গেল। আমি চিৎকার করিয়া উঠিলাম। পাশের ঘরে নিয়োগী মহাশয়ের পুত্র বেচু ও আর আর ছোকরা ছিল। কিন্তু আমার চীৎকার শুনিয়া কেবল বেচু একেলা দৌড়িয়া আসিল। সঙ্গে সে দিয়াশলাই আনিয়াছিল। সে দিয়াশলাই জ্বালিল। সেই আলোতে বেণীকে আমি তাহার তক্তাপোষে শয়ন করাইলাম। আর সেই সময় দেখিলাম যে, তাহার বুকে কে ছুরি মারিয়াছে; বুক হইতে ছলকে ছলকে রক্ত বাহির হইতেছে, তাহাতে আমার জামা কাপড় রক্তে রক্ত হইয়া গিয়াছে। ঘরের মেঝেতে যে স্থানে বেণী পড়িয়াছিল সে স্থানে অনেক রক্ত জমা হইয়াছিল। সেই রক্ত আমার পায়ে লাগিয়া গিয়াছিল। নিয়োগী মহাশয়ের পুত্র বেচু ঘরের ভিতর আসিয়া দিয়াশলাই জ্বালিয়া সমুদয় ব্যাপার দেখিয়া বেচু মনে করিল যে আমি বেণীকে খুন করিয়াছি। সেইজন্য বেচু আমাকে বলিল, চুপ্! গোল করিও না! কিন্তু মিহির, এ কী তুমি করিয়াছ?

বেণীকে তুমি খুন করিয়াছ? সন্ধ্যাবেলা তাহার সহিত তোমার ঝগড়া হইয়াছিল, সেইজন্য ইহাকে খুন করিয়াছ? না, ইহার বাপের কাছ হইতে যে একশত টাকার নোট আসিয়াছে তাহার জন্য তুমি ইহাকে খুন করিয়াছ? আমি বলিলাম, ও কী কথা বেচু! আমি ইহাকে খুন করিয়াছি? আমি যদি খুন করিব, তবে চিৎকার করিয়া লোক ডাকিতে যাইব কেন?— বেচু বলিল, দেখ মিহির, তোমার সেকথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। তোমরা দুইজনে এক ঘরে থাক। তোমার সহিত তাহার ঝগড়া হইয়াছিল,—তোমার গায়ে রক্ত,—আর একি! এই বলিয়া ঘরের মেঝে হইতে বড় একখানি ছুরি সে তুলিয়া লইল। ছুরিখানি রক্তমাখা ছিল। সে ছুরি আমার। ঘরের একপার্শ্বে ছোট টেবিল ছিল। তাহার উপর কাগজ, কলম, পুস্তক প্রভৃতির সহিত আমার সেই ছুরিখানাও থাকিত। ছুরিখানি হাতে লইয়া বেচু বলিল, আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিও না! শীঘ্র তুমি পলায়ন কর! আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। তখন বেচু বলিল, ও কী কর! ওরূপ রক্তমাখা কাপড়ে বাহিরে যাইও না। এখনি তোমাকে চৌকিদারে ধরিবে। এই কথা বলিয়া সে দৌড়িয়া আপনার ঘরে গেল। তাহার একখানি কাপড় আনিয়া আমাকে দিল। সেই কাপড় পরিয়া আমি পলায়ন করিলাম। সে রাত্রিতে বেচু আমার অনেক উপকার করিয়াছে। আজও দেখ, সে আমাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মা! এখন বোধ হইতেছে যে পলায়ন করিয়া আমি ভাল কাজ করি নাই। যখন আমি অপরাধ করি নাই, তখন কী জন্য যে আমি পলায়ন করিলাম তাহা বুঝিতে পারি না। এরূপ অবস্থায় আর কতদিন কাল কাটাইব! ইহা অপেক্ষা ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়া মরাই আমার পক্ষে ভাল। তোমাদিগকে না দেখিয়া আর পথে ফিরিতে পারি না। আর কষ্ট ভোগ করিতে পারি না, মা।'

মাতা কাঁদিতে লাগিলেন। পাল মহাশয়ের কন্যা কাঁদিতে লাগিল। পাল মহাশয়ের চক্ষে জল আসিল, আমারও চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মিহির পুনরায় বলিল, 'আজ আর পালাইবার কোন উপায় নাই। কিন্তু তাহার জন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। পথে-পথে আর বেড়াইতে পারি না।'

এরূপ বলিতে বলিতে মিহির দেখিল যে তাহার পিতা মাতা ও ভগিনী সকলেই অতিশয় কাঁদিতেছেন। সেজন্য তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া সে পুনরায় বলিল, 'মা, কাঁদিও না। তুমি ভয় করিও না। ভগবান মাথার উপর আছেন। বিনা দোষে তিনি আমাকে ফাঁসি যাইতে দেবেন না।'

আমার নিজের সম্বন্ধে এই সময় একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। মিহিরের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া আমার বুকের ভিতর গুর্-গুর্ করিয়া উঠিল। কেন বলিতে পারি না, কিন্তু এই সময় হইতে আমার স্বভাব পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হইল।

পাল মহাশয় বলিলেন, 'প্রাণ থাকিতে তোমাকে আমি ধরা দিতে দিব না। পালাইবার কোন উপায় কি নাই?'

এই সময় বাটির নিম্নে অন্দর মহলের দরজায় সবলে কে আঘাত করিতে লাগিল। দরজা যেন ভাঙিয়া ফেলিতে লাগিল।

শশব্যস্ত হইয়া আমরা সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। পাল মহাশয় বলিলেন, 'ঐ পুলিশ আসিয়াছে!'

পাল মহাশয়ের কন্যা ও গৃহিনী কাঁদিয়া উঠিলেন। মিহির পুনরায় তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল। মিহির বলিল, 'ভয় নাই মা! কাঁদিও না। অন্তর্যামী ভগবান জানেন যে আমি দোষী নই। তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন।'

দরজায় অতি সবলে আঘাত হইতে লাগিল। দরজা যেন ভাঙিয়া ফেলিতে লাগিল।

পাল মহাশয় বারান্দায় গিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে ও? দরজা ভাঙে কে?'

বাহির দিকে নিচে হইতে কে উত্তর দিল, 'আমরা পুলিশের লোক। দরজা খুলিয়া দাও।'

পাল মহাশয় বলিলেন, 'রাত্রি প্রায় একটা বাজে। এ ঘোর রাত্রিতে আমি দরজা খুলিয়া দিতে পারি না। যদি তোমাদের কোন প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে প্রাতঃকালে আসিও, তখন দ্বার খুলিয়া দিব। রাত্রিকালে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবার আইন নাই।'

পুলিশের লোক উত্তর করিল, 'দ্বার খুলিয়া দাও। যদি না খুলিয়া দাও তাহা হইলে দ্বার আমরা ভাঙিয়া ফেলিব। তোমার ঘরে খুনী আসামী আছে।'

পাল মহাশয় বলিলেন, 'আমার ঘরে খুনী আসামী কোথা হইতে আসিবে? এ ঘোর রাত্রিতে আমি দ্বার খুলিয়া দিব না;—তোমরা পুলিশের লোক হও আর যেই হও।'

তাহারা দ্বার যেন ভাঙিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিল। পাল মহাশয় ঘরের ভিতর আসিয়া বলিলেন, 'কী সর্বনাশ হইল। আর কোন উপায় নাই। মিহির এইবার ধরা পড়িল! সর্বনাশ হইল!'

মিহিরের এক হাত মা ধরিয়াছিলেন ও অপর হাত ভগিনী ধরিয়াছিল। মিহিরকে মাঝখানে রাখিয়া দুইজনে পার্শ্বে বসিয়া ক্রমাগত কাঁদিতেছিলেন। পাল মহাশয়ের এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া ভগিনী সহসা মিহিরের হাত ছাড়িয়া দিল। তাহার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে পিতাকে সে বলিল, 'বাবা! নিচে গিয়ে পুলিশের লোককে তুমি দরজা খুলিয়া দাও। আমি মনে মনে এক উপায় স্থির করিয়াছি। ভগবানের কৃপায় আমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে।'

কন্যার কথা শুনিয়া আমরা সকলেই অবাক হইয়া তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলাম।

কন্যা ধীর-গম্ভীর স্বরে ভ্রাতাকে বলিল, 'দাদা, উঠ। মদনবাবুর ঘরে গিয়া তাঁহার বিছানায় তুমি শয়ন কর। বারান্দার দ্বারে ওদিক হইতে তুমি শিকল তুলিয়া দাও, এদিক হইতে সেই দ্বারে আমি খিল দিতেছি।'

পাল মহাশয়ের কন্যা তাহার পর মাদুরের উপর হইতে সেই রাক্ষসের মুখোস ও পরচুল তুলিয়া লইল। স্বহস্তে সেই মুখোস ও সেই পরচুলের দাড়ি গোঁফ সে আমার মুখে পরাইয়া দিল।

সকলে তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিল। পাল মহাশয় বলিলেন, 'রাধারানী মা! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার বুদ্ধি! তোমার বুদ্ধিবলে ও ভগবানের কৃপায় মিহির বোধহয় এবার নিষ্কৃতি পাইবে। মিহির! উঠ বাবা! শীঘ্র মদনবাবুর ঘরে তুমি গমন কর!'

পাল মহাশয়ের কন্যার নাম রাধারানী।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া রাধারানী মিহিরকে আমার ঘর দেখাইয়া দিল। ভিতরবাটি হইতে বাহির-বাটিতে গমন করিয়া প্রথম বারান্দার দ্বারে শিকল দিল। তাহার পর আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া সে ঘরেরও দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। অবশেষে সে আমার বিছানায় শয়ন করিল।

দ্বার খুলিয়া দিবার নিমিত্ত পাল মহাশয় এখনও নিচে গমন করেন নাই। রাধারানী সে জন্য পুনরায় তাঁহাকে বলিল, 'বাবা! তুমি নিচে গিয়া পুলিশের লোককে দ্বার খুলিয়া দাও। দ্বার খুলিতে কিন্তু একটু নলপাত করিও। উপরে কেবল তোমার ঘরের দ্বার খোলা থাকুক। প্রদীপ নিভাইয়া মা ও আমি অন্য ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করি।'

পাল মহাশয় প্রথম বারান্দায় দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে পুলিশের লোককে বলিলেন, 'আপনাদের আর কষ্ট করিতে হইবে না। এখনি নিচে গিয়া আমি দ্বার খুলিয়া দিতেছি।'

এই বলিয়া সিঁড়ি দিয়া আস্তে আস্তে তিনি নিচে নামিতে লাগিলেন।

এখন আমার বড় ভয় হইল। আমি ভাবিলাম, 'এ মন্দ কথা নয়! রাক্ষসের হাত হইতে কত কষ্টে পরিত্রাণ পাইলাম, এখন দেখিতেছি আমার ফাঁসির জোগাড় হইতেছে। নিয়োগী মহাশয় পুলিশকে নিশ্চয় বলিয়াছেন যে রাক্ষসের সাজে সাজিয়া খুনি আসামী বাটিতে আগমন করে। সুতরাং পুলিশ আসিয়াই আমাকে ধরিয়া ফেলিবে। তাহার পর আমাকে থানায় লইয়া যাইবে। তাহার পর আমার নামে মোকদ্দমা করিবে। তাহার পর আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া দিবে। আমাকে দিয়া রাধারানী ভ্রাতার প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছে। মেয়েটি সামান্য মেয়ে নয়।

এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় মিহিরের সেই দুঃখের কাহিনী আমার স্মরণ হইল। আপনাকে ধিক্কার দিয়া আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, 'ছি, মদন! তুমি না এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে আজ হইতে আর পাগলামি করিবে না—আর

কখনও কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিবে না। আজ হইতে তুমি তোমার স্বভাব পরিবর্তন করিবে। ছি মদন! তোমার কি লজ্জা নাই?'

ভ্রাতাকে আমার ঘর দেখাইয়া দিয়া বারান্দার দ্বারে ভিতর হইতে খিল দিয়া রাধারানী পুনরায় আমার নিকট আসিয়া বলিল, 'ভয় করিবেন না। আপনি যে দাদা নহেন, তাহা জানিতে পারিলেই পুলিশ আপনাকে ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া আপনি শীঘ্র পরিচয় দিবেন না। যত বিলম্ব করিতে পারেন ততই ভাল। কারণ, বিলম্ব হইলে দাদাকে সরাইতে আমরা সময় পাইব।'

রাধারানীর বচনে আমার মন আশ্বাসিত হইল। আমিও তখন মনে মনে বুঝিয়া দেখিলাম যে, সত্য বটে, আমাকে কেন তাহারা ফাঁসি দিবে? আমি যে মিহির নই, জানিতে পারিলেই তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিবে। আমার নাম-ধাম প্রকাশ করিতে আমি যত পারি তত বিলম্ব করিব।

রাধারানী পুনরায় বলিল, 'আপনার এ ঘরে থাকা উচিত নহে। আপনাকে অন্যস্থানে যাইতে হইবে। আসুন।'

রাধারানীর সহিত সে ঘর হইতে আমি বাহির হইলাম। চক্ষুর উপরে মুখোসে দুইটি গোল ছিদ্র ছিল। তাহা পূর্বে রাক্ষসের ভয়াবহ, চক্ষুকোটর বলিয়া আমার প্রতীতি হইয়াছিল। সেই ছিদ্র দিয়া আমি দেখিতে পাইতেছিলাম। তেতলায় উঠিবার নিমিত্ত পূর্বে যে স্থানে সিঁড়ি ছিল তাহার পার্শ্বে সামান্য একটু নিভৃত অন্ধকারময় স্থান ছিল। সে স্থানে যে ভগ্ন প্রাচীর আছে তাহার কোণে বসিলাম। ঘর হইতে রাধারানী মাদুরটি তুলিয়া আনিয়াছিল। সেই মাদুর দিয়া সে আড়াল করিয়া দিল। মাদুরের অন্তরালে চুপ করিয়া আমি বসিয়া রহিলাম। নানারূপ আশ্বাসবাক্যে আমাকে প্রবোধ দিয়া রাধারানী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

প্রাচীরের কোণে মাদুরের আড়ালে বসিয়া শব্দ শুনিয়া সমুদয় ঘটনা আমি বুঝিতে পারিলাম। পাল মহাশয় দ্বার খুলিয়া দিলেন। সে শব্দ আমি পাইলাম। অনেকগুলি লোক বাটির ভিতর প্রবেশ করিল; সে শব্দ আমি পাইলাম। সাত-আট জন লোক তর-তর করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। সে পাল মহাশয়ের তিনটি ঘর পাঁতি-পাঁতি করিয়া তাহারা খুঁজিতে লাগিল; সে শব্দ আমি পাইলাম। তাহাদের অনুসন্ধান যে বৃথা হইল, তাহাদের কথাবার্তায় তাহাও বুঝিতে পারিলাম। অবশেষে দুইজন লোক আমার দিকে আসিতেছে, পদশব্দে তাহাও আমি বুঝিলাম।

যে স্থানে আমি লুক্কায়িত ছিলাম, দুইজন লোক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোল লণ্ঠনের প্রখর আলোক তাহারা মাদুরের উপর ধরিল। তাহার পর একজন অগ্রসর হইয়া মাদুরটি সরাইয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ সেই দুইজন লোক একসঙ্গে চিৎকার করিয়া উঠিল, 'আসামী পাইয়াছি। আসামী পাইয়াছি।'

সেই কথা শুনিয়া পুলিশের অন্যান্য লোক সেই স্থানে দৌড়িয়া আসিল। তাহাদের

মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ আমার হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া দিল। ঘরের ভিতর পাল মহাশয়ের কন্যা ও গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। একজন পুলিশের লোক আমার মুখ হইতে রাক্ষসের মুখোস খুলিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহাদের যিনি কর্তা তিনি নিষেধ করিয়া বলিলেন, 'উঁহু! মুখোস খুলিও না। এই অবস্থাতেই ইহাকে সাহেবের নিকট লইয়া যাইব।'

আমি থানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। সাহেবের সম্মুখে আমার মুখোস খোলা হইল কিন্তু পরচুলের দাড়ি গোঁফ যেমন তেমনি রহিল। থানার সাহেব আমাকে দুই-এক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমি কোন উত্তর করিলাম না। আমাকে গারদে কয়েদ করিয়া রাখা হইল।

গারদে আমি বসিয়া আছি। এমন সময়ে বাহিরে নিয়োগীর গলার শব্দ পাইলাম। নিয়োগীর সহিত পুলিশের যে কথাবার্তা হইল তাহাতে আমি বুঝিলাম যে মিহিরকে ধরিয়া দিবার নিমিত্ত পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিবার ঘোষণা ছিল। নিয়োগী সেই পুরস্কারের প্রার্থনা করিলেন। পুলিশের লোক বলিল, 'রও! আগে ইহার মোকদ্দমা হউক, তাহার পর তুমি পুরস্কার পাইবে।' সেই কথা শুনিয়া নিয়োগী মহাশয় প্রস্থান করিলেন।

পুলিশের লোক পরদিন আমাকে আর-একজন সাহেবের নিকট লইয়া গেল। সাহেবও আমাকে দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কিন্তু একটি কথাও মুখ দিয়া বাহির করিলাম না।

হুগলীতে সেই খুন হইয়াছিল। আমাকে হুগলীতে লইয়া গিয়া সে স্থানের পুলিশের হাতে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত সাহেব আজ্ঞা করিলেন। দুইজন পুলিশের লোক আমাকে হুগলীতে লইয়া চলিল। আমরা তিনজনে রেলগাড়ীতে গিয়া বসিলাম। আমার হাতে হাতকড়ি ছিল। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে কৌশল করিয়া আমি সেই পরচুলের দাড়ি গোঁফ খুলিয়া ফেলিয়া দিলাম। পরক্ষণেই পুলিশের লোক আমার দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইল। সে যে পরচুল, তাহা বোধ হয় তাহারা জানি না। তাহারা বলিল, 'তুই একজন পাকা বদমায়েস!'

যথাসময়ে আমরা হুগলীর থানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। কলকাতা পুলিশের লোক হুগলী পুলিশের হাতে আমাকে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেল। হুগলী থানার একজন কর্মচারী মিহিরকে জানিত। সে তখন থানায় উপস্থিত ছিল না। কিছুক্ষণ পরে সে আসিয়া আমাকে বলিল, 'মিহির পাল! এ কেন মিহির পাল হইবে?'

এই কথা শুনিয়া থানার দারোগা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে তুমি কে?'

এইবার আমার মুখ দিয়া কথা ফুটিল। আমি বলিলাম, 'আমি মদন ঘোষ।'

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মদন ঘোষ আবার কে?'

নাম ধাম প্রভৃতি বলিয়া আমি আমার সমুদয় পরিচয় প্রদান করিলাম। তাহা শুনিয়া উপস্থিত সকল লোকই ঘোরতর বিস্মিত হইল।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে কলকাতা পুলিশ তোমাকে ধরিয়া আনিল কেন? আর মিহির বলিয়া তোমাকে এ স্থানে রাখিয়া গেল কেন?'

আমি উত্তর করিলাম, 'পাল মহাশয় ও আমি এক বাটিতে বাস করি। তাঁহার সহিত আমার সদ্ভাব আছে। তামাসা-ছলে রাক্ষসের মত মুখোস পরিয়া পরিবারবর্গকে আমি ভয় দেখাইতে গিয়াছিলাম। সেই অবস্থায় কলকাতা পুলিশের লোক আমাকে মিহির মনে করিয়া ধৃত করিল।'

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কলিকাতার থানায় তুমি আপনার পরিচয় প্রদান কর নাই কেন?'

আমি বলিলাম, 'ভয়ে আমি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম।'

যাহা হউক, হুগলীর পুলিশের লোক আমাকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল না। সে স্থানের সাহেবের নিকট আমাকে লইয়া গেল। আরও দুই দিন ধরিয়া ভালরূপে তদন্ত করিল। হুগলীর যে সমুদয় লোক মিহিরকে জানিত তাহাদিগকে আনিয়া আমাকে দেখাইল। পাল মহাশয়ের গ্রামের কয়েকজন লোককে আনিয়া আমাকে দেখাইল। যখন সকলেই বলিল যে আমি মিহির নই, তখন আমাকে ছাড়িয়া দিল।

তিন দিন অপরাহ্নে আমি আমার কলিকাতার বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, পাল মহাশয় এখানে নেই। যে রাত্রিতে তাঁহার পুত্র ধরা পড়িল, সেই রাত্রিতেই সপরিবারে তিনি এ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। পুত্রের মোকদ্দমার তদ্বির করিবার নিমিত্ত তিনি বোধ হয় হুগলী গিয়াছেন।

পাল মহাশয় কোথায় গিয়াছেন, বিছানায় শুইয়া সেই কথা ভাবিতে লাগিলাম।

কয়দিন অনুপস্থিতির পর আমি অফিস যাইলাম। অফিস হইতে আসিয়া বাসার সকলকে আমি পাল মহাশয়ের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু কেহই আমাকে বলিতে পারিল না। রবিবার দিন আমি পুনরায় হুগলীতে গিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলাম। সে অনুসন্ধান নিষ্ফল হইল। তাহার পর আর একদিন রবিবার তাঁহার গ্রামে গিয়া তাঁহার অনুসন্ধান লইলাম। কিন্তু সে গ্রামেও কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এইরূপে বহুদিন ধরিয়া ক্রমাগত আমি তাঁহার অন্বেষণ করিলাম। কিন্তু আমার সকল চেষ্টা বিফল হইল। অবশেষে হতাশ হইয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

একদিন বেলা নয়টার সময় আমি অফিস যাইতেছি, এমন সময় বেচু আমাকে তাহার নিকট ডাকিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সে আর অধিক দিন বাঁচিবে না।

বেচু আমাকে বলিল, 'মদনবাবু। আপনাকে আমি একটি বড় গোপন কথা

বলিব। সেই কথা বলিবার নিমিত্ত আজ কয়দিন ধরিয়া আমি সুযোগই খুঁজিতেছি; কিন্তু পিতার ভয়ে আমি বলিতে পারি নাই। আজ পিতা আমাদের গ্রামে গিয়াছেন। সেইজন্য আপনাকে ডাকিলাম।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী কথা?'

বেচু বলিল, 'যে কথা বলিবার নিমিত্ত আমি আপনাকে ডাকিয়াছি, বড় বিষম সে কথা। কী করিয়া আপনাকে বলিব, তাই ভাবিতেছি। আজ এক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত ঘোর অনুতাপিত হৃদয়ে আমি ঈশ্বরকে ডাকিতেছি। যখন সেদিন মিহিরের আগমন সংবাদ পিতা পুলিশকে দিতে গেলেন, সেদিন মরিতে মরিতে অতি কষ্টে আমি পাল মহাশয়কে গিয়া সাবধান করিলাম। মিহিরের আমি সর্বনাশ করিয়াছি। আমি ভাবিলাম যে, নিরপরাধ মিহিরকে যে আমার সাক্ষাতে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে, তাহা আমি দেখিতে পারিব না।'

বিস্ময়ান্বিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মিহিরের আপনি সর্বনাশ করিয়াছেন? মিহিরের আপনি কী করিয়াছেন?'

নিয়োগী-পুত্র বলিল, 'যে খুনের জন্য মিহির পথে পথে ফিরিতেছে, যে খুনের জন্য তাহার ফাঁসি হইবার সম্ভাবনা, খুন সে করে নাই, সে খুন আমি করিয়াছি।'

আমি বলিলাম, 'কী!!! সত্য?'

নিয়োগী-পুত্র উত্তর করিল, 'সম্পূর্ণ সত্য। মিহির, আমি আর সেই ছোকরা—তাহার নাম বেণী, আরও তিন চার জন, হুগলীতে এক বাসায় থাকিয়া স্কুলে পড়িতাম। সকলেই আমরা এক জাতি। আমরা সকলে পরস্পরের কুটুম্ব ও পরিচিত। মিহির ও বেণী এক ঘরে থাকিত। পাল মহাশয়ের সহিত বেণীর পিতার ভূমি সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয়। কিন্তু তাহার্তে মিহির ও বেণীতে যে সদ্ভাব ছিল, তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। পরীক্ষায় টাকা ও অন্যান্য খরচের নিমিত্ত বেণীর পিতা একশত টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমার সাক্ষাতে বেণী সেই টাকাগুলি বিছানায় আপনার শিয়রদেশে বালিশের নিম্নে রাখিয়া দিল। আমার পিতা ধনবান ব্যক্তি নহেন। খরচের টানাটানি আমার সর্বদাই থাকিত। সেই টাকাগুলি দেখিয়া আমার লোভ হইল। দৈবের লিখন কেহ খণ্ডাইতে পারে না। সেইদিন রাত্রি দুইটা কি তিনটার সময় সহসা আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগ্রত হইয়া আমি বিছানায় শুইয়া আছি, এমন সময় মিহির ও বেণী যে ঘরে থাকে সে ঘরের দ্বার খুলিবার শব্দ হইল। বিছানা হইতে উঠিয়া আমিও আস্তে আস্তে আমার ঘরের দ্বার খুলিলাম। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে, গাড়ু হাতে লইয়া মিহির বাহিরে গেল। আমি ভাবিলাম, উত্তম সুবিধা হইয়াছে। দেখি, বেণীর বালিশের নিচে হইতে নোটগুলি লইতে পারি কি না। এই মনে করিয়া আমি আস্তে আস্তে তাহার ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। যাহা হউক, নিঃশব্দে বেণীর বিছানার নিকট গিয়া আমি নোটগুলি লইতে পারিলাম। নোট লইয়া

পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছি, আর বেণী সেই সময় জাগিয়া উঠিল।—চোর! চোর!! এই কথা বলিয়া আমাকে সে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিল।'

এতদূর বলিয়া বেচু আর বলিতে পারিল না। তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া অতি দ্রুতভাবে সম্পন্ন হইতে লাগিল। 'জল'। এই কথা বলিয়া সে আমাকে গেলাস দেখাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি জলের গেলাস লইয়া আমি তাহার মুখে ধরিলাম।

জলপান করিয়া বেচু কিছু সুস্থ হইল। অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় সে বলিতে আরম্ভ করিল—

'আমাকে ধরিয়া চোর বলিয়া বেণী পুনরায় চিৎকার করিতে উদ্যত হইল। আমি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলাম ও সেখান হইতে পলায়ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু বেণী আমাকে সহজে ছাড়িল না। সেই ঘরের দেওয়ালের নিকট সামান্য একটি মেঝে ছিল। তাহার উপর বেণী ও মিহিরের পুস্তক, কাগজ-কলম ইত্যাদি থাকিত। মিহিরের বড় একখানি ছুরি ছিল। ছুরিখানি সর্বদাই এই মেঝের উপর পড়িয়া থাকিত। অন্ধকারে বেণীর সহিত জড়াজড়ি করিতে করিতে ক্রমে আমি সেই মেঝের উপর গিয়া পড়িলাম। দৈবের ঘটনা। আমার দক্ষিণ হাতটি মেঝেস্থিত ঠিক সেই ছুরির উপর পড়িল। তখনও বেণী আমাকে সবলে ধরিয়া ছিল। তাহাকে যে খুন করিব সে ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। কিন্তু কোনরূপে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাইয়া আমি সেই ছুরি তাহার বুকে মারিয়া বসিলাম।—বাপ! বলিয়া বেণী তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল। আমি পলায়ন করিয়া আপনার ঘরে প্রবেশ করিলাম। হায় হায়! এক মিনিট পূর্বে আমি একজন সাধু, সচ্চরিত্রবান যুবক ছিলাম, এক মিনিটের মধ্যে আমি চোর, খুনে, নরপিশাচ হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে মিহির প্রবেশ করিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার ঘরে গিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিলাম যে বেণী মৃতপ্রায় হইয়াছে, তাহাকে তুলিতে গিয়া মিহিরের শরীর ও কাপড় রক্তে আরক্ত হইয়া গিয়াছে ও সেই স্থানে মিহিরের ছুরি পড়িয়া আছে। ইহা ব্যতীত সেইদিন বৈকালবেলা বেণী ও মিহিরের কিছু বচসা হইয়াছিল। আমি মনে করিলাম, ভাল হইয়াছে। এ দোষ সম্পূর্ণরূপে মিহিরের উপর আরোপিত হইতে পারিবে, আর তাহা হইলে আমাকে কেহ সন্দেহ করিবে না। এইরূপ ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিবার নিমিত্ত মিহিরকে আমি পরামর্শ দিলাম। মিহির সে সময় স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সে আমার কথামত কার্য করিল। আমার একখানা কাপড় পরিধান করিয়া সে পলায়ন করিল। তাহার পলায়ন, তাহার পরিত্যক্ত রক্তাক্ত কাপড়, তাহার রক্তাক্ত ছুরি, পূর্বদিন বেণীর সহিত তাহার বিবাদ, এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া পুলিশ তাহাকেই দোষী বলিয়া স্থির করিল। অন্য কাহাকেও সন্দেহ করিল না। সে খুনের প্রকৃত বিবরণ এই আমি আপনাকে বলিলাম।'

আমার অফিস-গমন ঘুরিয়া গেল। বেচুকে আমি বলিলাম, 'এ রোগে আপনার মৃত্যু নিশ্চয়, তাহার অধিক বিলম্বও নাই। আজ হউক, কাল হউক, পরশু হউক, শীঘ্রই আপনাকে ঈশ্বরের নিকট দাঁড়াইতে হইবে। নিজের এরূপ গুরুতর অপরাধ অন্যের ঘাড়ে দিয়া কোন্ মুখে আপনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে এ সকল কথা কেবল আমাকে বলিলে হইবে না।'

বেচু জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে আর কী করিতে বলেন?'

আমি উত্তর করিলাম, 'এ সকল কথা আপনাকে পুলিশের নিকট বলিতে হইবে।'

বেচু বলিল, 'তবে শীঘ্র পুলিশের লোককে আপনি দয়া করিয়া ডাকুন। আমার পিতা প্রত্যাগমন করিতে না করিতে আপনি এ কাজ করুন। আমি যে বেণীকে খুন করিয়াছি, তাহা তিনি জানেন না; এ কথা শুনিলে তিনি আমাকে কিছুতেই বলিতে দিবেন না।'

আমি তৎক্ষণাৎ থানায় দৌড়িয়া যাইলাম। থানার লোক আসিয়া নিয়োগী পুত্রের সমুদয় বিবরণ লিখিয়া লইল। তাহার পর পুলিশের কর্মচারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বেণীর নিকট হইতে যে নোট তুমি লইয়াছিলে, তাহা কি তুমি খরচ করিয়া ফেলিয়াছ?'

নিয়োগী-পুত্র উত্তর করিল, 'একখানি পঞ্চাশ টাকার ও পাঁচখানি দশ টাকার নোট ছিল। দশ টাকার পাঁচখানি ভাঙাইয়া আমি খরচ করিয়াছি; কিন্তু পঞ্চাশ টাকার নোটখানি নম্বরী বলিয়া তাহা ভাঙাইতে আমি সাহস করি নাই। সে নোট এখনও আমার নিকট আছে।'

এই বলিয়া বেচু তাহার তোরঙ্গের চাবি আমাকে দিল ও যে কোণে নোটখানি ছিল তাহা আমাকে বলিয়া দিল। নোটখানি বাহির করিয়া আমি পুলিশের হাতে দিলাম। ইহার কিছুদিন পরে নম্বর দেখিয়া প্রমাণ হইল যে, ইহা বেণীর পিতার প্রেরিত সেই নোট বটে।

পুলিশ বেচুকে থানায় লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। আমি ও বেচু দুইজনেই আপত্তি করিলাম। কিন্তু পুলিশ সে কথা শুনিল না। পাল্‌কি করিয়া বেচুকে তাহারা লইয়া চলিল। দুধ, জল, ঔষধ প্রভৃতি লইয়া আমিও সঙ্গে চলিলাম। থানা হইতে পুলিশ তাহাকে আদালতে লইয়া গেল। সাহেবের নিকট পুনরায় তাহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত প্রদান করিতে হইল। সাহেব তাহাকে জেলখানার হাসপাতালে পাঠাইতে আদেশ করিলেন। নিজের খরচে আমি উকিল দিয়া জামিনের প্রার্থনা করিলাম; কিন্তু সে খুনী আসামী, জামিন হইল না।

এক স্থান হইতে অন্যস্থানে নাড়া-চাড়া, তাঁহার উপর ঘোরতর মনের আবেগ, এই সমুদয় কারণে আমি দেখিলাম যে, বেচুর অবস্থা ক্রমশই মন্দ হইয়া আসিতেছে। অপরাহ্নে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের বৈলক্ষণ্য ঘটিল। এ অবস্থায় জেলখানায় তাহাকে গাড়ি

করিয়া লইয়া যাইতে পুলিশ সাহস করিল না। পাল্‌কিতে আস্তে আস্তে তাহাকে লইয়া চলিল। দুইজন পুলিশ-কর্মচারী সঙ্গে চলিল। পাল্‌কির উপর হাত রাখিয়া, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, রোগীর মুখের দিকে সতত দৃষ্টি রাখিয়া আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। গড়ের মাঠে গিয়া রোগীর চক্ষুর ভাব দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল। এক নিভৃত বৃক্ষতলে আমি পাল্‌কি নামাইতে বলিলাম। তাহার পর ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে বেচুর আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছে। আমি তাহার মুখে বিন্দু-বিন্দু জল দিয়া ধীরে ধীরে ভগবানের নাম করিতে লাগিলাম।

এবার আমার পানে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে বেচু এই কয়টি কথা বলিল, 'মদনবাবু! আমি চলিলাম। রাধারানীকে আপনি বিবাহ করিবেন। আপনি সংসারী হইবেন।'

তাহার প্রাণবায়ু অন্তর্হিত হইল। আমি কাঁদিতে লাগিলাম।

বেহারাগণ তাহার মৃতদেহ জেলখানায় লইয়া গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে যাইলাম। আমি মনে করিলাম যে মৃতদেহ দিবার অনুমতি হইলে আমি লোক ডাকিয়া আনিব। এইরূপ মনে করিয়া আমি বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে নিয়োগী মহাশয় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাসায় পৌঁছিয়া তিনি সমুদয় ঘটনা শুনিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি থানায় ও থানা হইতে আদালতে গিয়াছিলেন। আদালত হইতে এইস্থানে উপস্থিত হইলেন।

পাল মহাশয়ের ও তাঁহার পুত্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহার সহিত যাঁহাদের আলাপ পরিচয় ছিল, একে-একে সকলকে তাঁহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু কেহই তাঁহার সন্ধান আমাকে বলিয়া দিতে পারিল না। মিহির নিরপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে, আর লুক্কায়িত থাকিবার আবশ্যক নাই, এই মর্মে দুইখানি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলাম। তাহাতেও কোন ফল হইল না। কিন্তু তাঁহাদের সহিত পুনরায় যে আমার দেখা হইবে; সে বিষয়ে আমি হতাশ হইলাম না; কারণ পাল মহাশয় সম্পত্তিশালী লোক, একদিন না একদিন তাঁহাকে একদিন দেশে আসিতেই হইবে। তাহা ব্যতীত, কলিকাতার বাসা তিনি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। কলিকাতার সেই তিনটি ঘরে তাঁহার জিনিসপত্র আছে। তাহাতে চাবি দিয়া গিয়াছেন। একদিন না একদিন কেহ সে দ্রব্যাদি লইতে আসিবে। এই প্রত্যাশায় আমি দিনাতিপাত করিতে লাগিলাম।

এইরূপে আরও তিন মাস কাটিয়া গেল। ভাদ্র মাস পড়িল। সে বৎসর দারুণ বর্ষা হইয়াছিল। পথঘাট জলে জলময় ও কাদায় কর্দমময় হইয়াছিল। একদিন অপরাহ্ন চারিটার সময় অফিসে বসিয়া কাজ করিতেছি, এমন সময় এক উৎকলবাসী আমাকে একখানি চিঠি আনিয়া দিল। সে পত্রে কেবল এই কয়টি কথা লেখা ছিল, 'অনুগ্রহ করিয়া অতি গোপনে এই লোকের সহিত শীঘ্র আসিবেন। আসিলে আসল কথা জানিতে পারিবেন।'

পাল মহাশয় ও মিহিরের জন্য সর্বদাই আমার মন উদ্বিগ্ন ছিল। চিঠিখানি পাইবামাত্র আমার মনে হইল যে এইবার বোধহয় তাঁহাদের সন্ধান পাইলাম। কালবিলম্ব না করিয়া আমি সেই লোকের সহিত চলিলাম। কলিকাতার যে অংশে অতি ঘন বসতি, উড়িয়া আমাকে সেই স্থানে লইয়া গেল। সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর সঙ্কীর্ণতর গলি, তাহার ভিতর একখানি খোলার বাড়িতে আমি প্রবেশ করিলাম। অতি কুৎসিত স্থান, দুর্গন্ধে নাড়ি উঠিয়া যায়। চারিদিকে কাদায় ময়লায় পরিপূর্ণ। সেই মাটিতে অতি সামান্য ও ক্ষুদ্র একখানি ঘর উড়িয়া আমাকে দেখাইয়া দিল। ঘরের মেঝে নিতান্ত আর্দ্র, যেন জল সপ-সপ করিতেছিল। আমি দেখিলাম যে সেই ভিজা মেঝেতে সামান্য একটি মাদুরের উপর গেরুয়া পরিচ্ছদ পরিহিত এক যুবক পড়িয়া আছে। 'কে ও, মিহির?' এই কথা বলিয়া আমি তাহার নিকট গিয়া বসিলাম।

মিহির আমার দিকে চাহিয়া দেখিল। চিনতে পারিলাম বটে, কিন্তু সে মিহির আর নাই ; তাহার দেহ অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছে ; তাহার মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম যে শরীর হইতে অগ্নির ন্যায় উত্তাপ বাহির হইতেছে, মাঝে মাঝে অতি কষ্টের সহিত সে কাশিতেছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সাধন করিতেও যেন তাহার বড় ক্লেশ হইতেছে। আমি পুনরায় বলিলাম, 'মিহির!'

মিহির মৃদুস্বরে বলিল, 'চুপ চুপ! আমার নাম ধরিয়া ডাকিও না, কেহ শুনিতে পাইলে এখনি আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে!'

আমি বলিলাম, 'তবে তুমি এখনও সে কথা জান না? মিহির। সে ভয় আর কিছুমাত্র নাই! তুমি যে নিরপরাধ, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বেণীকে নিয়োগীপুত্র খুন করিয়াছিল, পুলিশের কাছে ও আদালতে সাহেবের কাছে সে তাহা স্বীকার করিয়াছে। তোমার আর কোন ভয় নাই।'

এই কথা শুনিয়া মিহির বলিল, 'আমাকে তুলিয়া বসাও। আমি উঠিতে পারি না।'

আমি মিহিরকে তুলিয়া বসাইলাম। আমার স্কন্ধে মাথা ও বক্ষস্থলে আপনার শরীর রাখিয়া সে বসিয়া রহিল। তাহার পর বেচুর আদ্যোপান্ত বিবরণ বার-বার সে আমার মুখ হইতে শুনিল। সেই বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাহার রোগ ও যাতনার যেন অনেকটা উপশম হইল, আর তাহার শরীরে যেন একটু বল হইল।

তাহার পর আমি তাহাকে বলিলাম, 'মিহির! ভাই! তোমাকে আর ক্ষণকালের জন্য আমি এ স্থানে রাখিতে পারি না। এ স্থানে সহজে মানুষ মরিয়া যায়। তুমি ভয়ানক জ্বর ভোগ করিতেছ। বুকেও বোধহয় কিছু রোগ হইয়া থাকিবে। অতএব তোমাকে আমি আমার বাসায় লইয়া যাইব।'

মিহির উত্তর করিল, 'কী করিয়া তাহা হইবে! আমার হাতে একটিও পয়সা নাই। এই সন্ন্যাসীবেশে বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া, আজ দশ দিন কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছি।

কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াই আমি শ্যামবাজারে গদাধর মোড়লের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তাহার পরদিন হইতে এই বিষম জ্বর দ্বারা আমি আক্রান্ত হইয়াছি। সেই অবধি বিছানায় পড়িয়া আমি ;—না ঔষধ, না পথ্য। গাড়িতে যাইতে পারিব না, পাল্‌কি করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু গাড়ি কি পাল্‌কি ভাড়া কোথায় পাইব যে তোমার সহিত তোমার বাসায় যাইব? তবে, তুমি যদি গদাধর মোড়লের নিকট একবার যাইতে পার, তাহা হইলে হয়।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গদাধর মোড়ল কে?'

মিহির উত্তর করিল, তিনি বাবার বন্ধু, আমাদের স্বজাতি। কলিকাতায় তিনি ব্যবসা করেন। শ্যামবাজারে তাঁহার বাসা। তোমার সহায়তায় যে রাত্রে আমি পুলিশের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই, সেইদিন বাবার নিকট যাহা কিছু নগদ টাকা ছিল তাহা তিনি আমাকে প্রদান করিয়া বলিলেন,—এ টাকা ফুরাইয়া গেলে তুমি গদাধর মোড়লের নিকট যাইবে, যখন যাহা আবশ্যক হইবে গদাধর তোমাকে দিবে। আমাকে কদাচ তুমি পত্র লিখিবে না। কারণ সেই পত্রের অনুসরণে পুলিশ তোমার সন্ধান পাইতে পারে।'

আমি বলিলাম, 'গদাধর মোড়ল বোধহয় তোমার পিতার ঠিকানা জানেন?'

মিহির উত্তর করিল, 'বোধহয় কেন? পিতার ঠিকানা তিনি নিশ্চয় জানেন।'

মিহিরকে আমি আমার বাসায় লইয়া যাইলাম! পরিষ্কৃত শুভ্র বসন পরাইয়া তাহাকে পরিষ্কৃত বিছানায় শয়ন করাইলাম। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনিয়া তাহাকে দেখাইলাম। ডাক্তার বলিলেন যে, 'মিহিরের পীড়া বড় কঠিন হইয়াছে। তাহার বক্ষস্থলের দুইদিকেই প্রদাহ হইয়াছে।' যাহা হউক, তাহার ঔষধ ও পথ্যের আয়োজন করিয়া আমি সেই রাত্রিতেই গদাধর মোড়লের অনুসন্ধানে গমন করিলাম।

বেসরকারী গোয়েন্দা

ধীরেন্দ্রলাল ধর

রবিবার। কাজের তাড়া নেই। খান চারেক বিস্কুট আর দু'কাপ কোকো খেয়ে গোবিন্দ আরামে খবরের কাগজের পাতা ওলটাচ্ছে। এমন সময় রবীন এসে পড়লো। সামনের চেয়ারখানি দখল করে বললো—কাগজে পড়লাম, ওকালতির সঙ্গে গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছো, তা বেশ! চায়ের পর্ব শেষ করে রবীন আসল কথায় এলো। বললো—তোমার কাছে এলাম, তুমি আমায় কিছু সাহায্য করো দিকি। এই দেখো—

একখানা চিঠি সে এগিয়ে দিলে গোবিন্দর সামনে।

নীল খামে, নীল কাগজে সৌখীন করে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ঃ

মহারাজের সেক্রেটারী মহোদয় সমীপে—

মান্যবর মহাশয়,

কাল সন্ধ্যায় মহারাজ দিল্লী গিয়াছেন। সামন্ত রাজ্য অধিকার করার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্যন্ত মহারাজকে যে বার্ষিক বৃত্তি দিয়া আসিতেছেন, মহারাজ তাহাতে সন্তুষ্ট নন। তিনি সেই বৃত্তি বাড়াইবার জন্য প্রথমাবধি তদ্বির করিয়া আসিতেছেন।

এবারও এজন্য দিল্লীতে কয়েকদিন তাঁহাকে থাকিতে হইবে। এই কয়দিন আপনিই মহারাজের কলিকাতার বাড়িতে একা থাকিবেন। সেখানে যথেষ্ট অলঙ্কার ও হীরা-জহরত আছে। সম্প্রতি সেইগুলির উপর একদল দস্যুর নজর পড়িয়াছে। সেগুলি হস্তগত করিবার জন্য তাহারা উৎসুক। আপনি সাবধান হইবেন। শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আপনাকে সতর্ক করিয়া দিলাম। ইতি—

অতি পরিচিত এক বন্ধু

(বিপদ ঘটিবার ভয়ে নাম প্রকাশ করিলাম না)

রবীন বললো—এই চিঠি পেয়েছি কাল সন্ধ্যায়। পরশু সকালে মহারাজ দিল্লী গেছেন। আমি একা আছি রাজবাড়িতে। সত্যি সেখানে লাখ লাখ টাকার হীরে-জহরৎ আছে। এখন আমার করণীয় কি বলো তো?

—বাড়িতে চাকর-দারোয়ান আছে, বন্দুকও তো আছে।

—চাকরদের উপর ভরসা রাখা যায় না। তাছাড়া সবচেয়ে পুরনো চাকরটা ছাড়া অন্য তিনজন দিন-তিনেকের জন্য গঙ্গাসাগরে গেছে পুণ্যি করার জন্য। আর দারোয়ান ও তার বন্দুক। দুটোই পোশাকী। দারোয়ান বোধ হয় সারা জীবনে তার বন্দুকটা ছোঁড়েনি, ছুঁড়তে জানে কিনা, তাই বা কে জানে!

—তাহলে পুলিশে খবর দাও।

—না, পুলিশে খবর দেওয়া চলবে না। রাজ্য দখল করার সময় মহারাজের হীরে-জহরতের একটা হিসাব দাখিল করতে হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। মহারাজ তখন অনেক গোপন করেছিলেন। পাগড়িতে পরার জন্য পাঁচখানা বড় বড় হীরে বসানো একটা 'ডায়মণ্ডপিন' আছে, সেটার মূল্যই অন্ততঃ দশ লাখ টাকা, হিসাবে তার কোন উল্লেখই নেই। এমনি আরো কত আছে, পুলিশ তো সে কথা জানবে। তখন আবার আরেক দিকে মুশকিল দেখা দেবে।

—সেগুলো আছে কোথায়?

—বাড়িতে।

—কেন? ব্যাঙ্কের সেফ্ ডিপোজিট ভলটে রাখেনি কেন?

—সেদিকে মহারাজার আবার ভয় আছে, যদি কোন দিন গভর্নমেণ্ট ভলট্ 'লক্' করে দেয়। সোনা যেভাবে কন্ট্রোল করলো, তাতে সেই ভয় এখন আরো বেড়েছে। এখন আমি পড়েছি বিপদে। এখানে এখন আমার জিম্মায় সব। আবার তার উপর এই চিঠি। তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম। তুমি একবার চলো, তুমি দেখেশুনে যা বলবে, আমি সেইমতো ব্যবস্থা করবো।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে গোবিন্দ ক' মিনিট চুপ করে রইল। তারপর বললো—আমার আজ জরুরী একটা কেস আছে। সন্ধ্যেবেলা কোর্ট থেকে ফিরে এসে

জামা-কাপড় বদলে রাত আটচা-ন'টা নাগাদ তোমার ওখানে যাবো। তুমি থেকো।

—আমি সারাদিনই আছি। বাড়ি পাহারা দিচ্ছি। রাতেও জেগে থাকি, ভয়ে ঘুম হয় না। তুমি রাত বারোটায় গেলেও দেখবে আমার ঘরে আলো জ্বলছে।

রাত ন'টা।

কলকাতার হঠাৎ-বড়লোকী পাড়া নিউ আলিপুরের একখানি সুদৃশ্য দোতলা বাড়ির সামনে এসে গোবিন্দ দাঁড়ালো। সামনে ছোট পাঁচিল। একটি ছোট ফটক পার হয়ে দু'সারি ফুলের গাছ। তার পরেই বারান্দা। দোতলায় আলো জ্বলছে, নীচেটা আগাগোড়া অন্ধকার। দরজা খোলাই ছিল, তবু গোবিন্দ কলিং বেল টিপলো।

কিন্তু বার তিনেক টিপেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

গোবিন্দ ডাকলো—রবীন, রবীনবাবু!

কোন সাড়া নেই। গোবিন্দর কি যেন মনে হলো। ঢুকে পড়লো বাড়ির মধ্যে। অন্ধকারে বরাবর দোতলায় উঠে যাবে নাকি? দরকার নেই। ডাইনের ঘরে পর্দা ঝুলছিল। সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলো। আলোটা জ্বেলে এইখানেই একটু বসা যাক। দরজার আশেপাশে আলোর সুইচটার জন্যে সে হাত বাড়ালো। সুইচ মিললো। আলো জ্বলতেই গোবিন্দ চমকে উঠলো।

সামনেই টেবিল। টেবিলের ওপাশে একখানি সোফায় রবীন ঢলে পড়েছে, জামার উপর দিয়ে রক্তের স্রোত নেমে এসেছে মেঝের উপর।

মরে গেছে। খুন! এগিয়ে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে তবু একবার দেখে নিলে। ছুরি মেরে রবীনকে হত্যা করা হয়েছে। এখনি পুলিশে খবর দেওয়া দরকার। মহারাজের মুকুটের হীরে রাখতে গিয়ে গরীব এম.এ. পাশ করা সেক্রেটারী প্রাণ হারালো।

ঘরে কোথাও জোর-জবরদস্তির চিহ্ন নেই। কোন চীৎকার কি আর্তনাদ শোনা গেলে আশেপাশের বাড়ির মানুষ নিশ্চয়ই কৌতূহলী হতো। বাড়ির অন্য লোকেরাও জানতো। কিন্তু বাড়িতে অন্য লোক কি আছে? তাহলে ডাকলে সাড়া পাওয়া গেল না কেন? দারোয়ানই বা গেল কোথায়? খুনী রবীনের খুবই পরিচিত মনে হয়। তার কাছ থেকে আক্রমণ রবীন বোধহয় আশাই করেনি। তাই বিনা বাধায় ঘটেছে ব্যাপারটা। গোবিন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বরাবর ভিতরে চলে গেল। নীচের অন্ধকার ঘরগুলি পার হয়েই সিঁড়ি। সিঁড়ি থেকে উপর অবধি সব ঘরেই আলো জ্বলছে। নীল পর্দা ঝুলছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রাণী নেই। ঠাকুর-চাকর গেল কোথায়? ছিমছাম সাজানো সব ঘর। কোন ঘরে চোর-ডাকাতের লণ্ডভণ্ড করে খোঁজাখুঁজির চিহ্ন নেই।

গোবিন্দ নীচে এলো। অন্ধকার ঘরগুলির ভিতরে ঢুকে একে একে আলো জ্বাললো। ভাঁড়ার ঘরে রেফ্রিজারেটারটা শুধু খোলা রয়েছে, আর কোন ঘরে কোথায় এতটুকু

বিশৃঙ্খলা নেই। কিন্তু দারোয়ান কোথায়? তার ঘর অন্ধকার। অনেক চেষ্টার পর সুইচ পাওয়া গেল। আলো জ্বলতেই গোবিন্দ আবার চমকে উঠে। মেঝেয় মাদুরের উপর দারোয়ান চিৎ হয়ে পড়ে আছে। অদূরে একটা এনামেলের গ্লাস। কোন পানীয় ছিল মনে হয়।

সব দেখেশুনে গোবিন্দ ফিরে এলো বৈঠকখানায়। কোন কিছু সে স্পর্শ করলো না। টেলিফোনের রিসিভারটা রুমাল জড়িয়ে তুলে নিল, ডায়াল করলো—লালবাজার। এখানে একটা খুন হয়েছে। মহারাজার সেক্রেটারী রবীন মিত্র খুন হয়েছেন। দারোয়ান তার ঘরে অজ্ঞান হয়ে আছে। বাড়িতে আর কেউ নেই। নিউ আলিপুর, ব্লক জেড...নং বাড়ি।

আকাশে জমাট মেঘ। গোবিন্দ স্থানত্যাগ করল। চেপে বৃষ্টি এলো একটু পরেই।

একদিন পরে খবরের কাগজে বেরুলো ঃ

'নিউ আলিপুরে দেবগড়ের মহারাজার সেক্রেটারী রবীন মিত্র খুন হইয়াছেন। বাড়িতে দারোয়ান ছাড়া আর কেহ ছিল না। বিষাক্ত জল পান করায় সে অজ্ঞান হইয়াছিল। সেই অবকাশে আততায়ী সন্ধ্যার খানিক পরেই রবীনবাবুকে হত্যা করিয়া সরিয়া পড়ে। পুলিশ গৃহভৃত্যকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। সে সিনেমার টিকিট দেখাইয়াছে, সন্ধ্যায় সে সিনেমা দেখিতে গিয়াছিল। কিন্তু পুলিশ তাহার জামার হাতায়, খুব সামান্য হইলেও, রক্তের দাগ পাইয়াছে। মহারাজার গৃহে কিছু মূল্যবান হীরে-জহরুত ছিল। সে-সব কতটা লুঠ হইয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

মহারাজ দিল্লী গিয়াছেন। তিনি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সঠিকভাবে কিছুই জানা যাইতেছে না। তবে ভৃত্য বলিতেছে, 'সে খুবই বিশ্বাসী, গত পনেরো বছর ধরিয়া সে ওই গৃহে কাজ করিতেছে। পুলিশ রহস্যভেদের চেষ্টা করিতেছে।'

মহারাজা কিন্তু বললেন—এই ভৃত্য জগারাম তার কাছে পনেরো বছর চাকরি করছে, কোনদিন তাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ ঘটেনি, এর পিতাও তাঁর কাছে ভৃত্যের কাজ করে গেছে। এরা তাঁর প্রজা।

ভৃত্য জগারাম সিনেমার টিকিট দেখিয়ে আদালতে কান্নাকাটি শুরু করে। সে বলে, রক্তের দাগের কথা সে জানে না, সে ছুটি নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিল। কিন্তু একটা হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে এতো সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। জগারামকে হাজতে পুরলো; এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হলো।

এদিকে অনেক কষ্টে দারোয়ানের প্রাণ রক্ষা পেল। কিন্তু পানীয় জল কিভাবে বিষাক্ত হলো, সে বলতে পারলো না।

তারপর মাসখানেক কেটে গেল, কিন্তু পুলিশ কোন সূত্র খুঁজে পেল না।

গোবিন্দ আসামী পক্ষের উকিল হয়ে দাঁড়ালো। ফী না নিয়েই সে মামলায়

নামলো। বললো—রবীন আমার সহপাঠী ও বন্ধু ছিল। তার আসল হত্যাকারীকে খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে হবে। একটা নিরীহ চাকরকে জেলে পাঠিয়ে আসল আসামী সন্দেহের বাইরে চলে যাবে, এ আমি হতে দেবো না। জগারাম খালাস পাবে, এবং আসল আসামী ধরা পড়বে—সেইভাবে কাজ করতে হবে।

আদালতে গোবিন্দ প্রশ্ন তুললো—আসামীর হাতের ছাপ কোথাও পাওয়া গেছে কি? কেউ আসামীকে ছুরি মারতে দেখেছে? দেখেছে কি কোন-কিছু নিয়ে বাড়ি থেকে সরে পড়তে? খুন করে হীরে-জহরত নিয়ে সরে পড়ার পর আসামী আবার ফিরে আসবে কেন? আসামী যেখানে থাকতো, সেখানে তো কিছুই নেই, তাহলে লুঠের মাল সব গেল কোথায়? এবং শেষ প্রশ্ন হত্যাকাণ্ডের পর লালবাজারে টেলিফোন করেছিল কে?

এসব প্রশ্নের জবাব পুলিশও পায়নি। কাজেই জগারাম দু'মাস পরে হাজত থেকে মুক্তি পেল।

তিন মাস জগারাম আর বাড়ি থেকে বেরোয়নি। সামান্য কাজকর্ম করে গুম হয়ে বসেছিল। চতুর্থ দিন সকালেই সে মহারাজকে বললো—হুজুর, আমি বাড়ি যাবো।

মহারাজা বললেন—সেই ভালো, আমিও এ বাড়ি বিক্রি করে দেব। এখানে মানুষ খুন হলো, আমার হীরে-জহরত চুরি গেল—এ বাড়ি আমি আর রাখবো না।

—এত জিনিসপত্তর?

—সব ফার্নিচার বেচে দেব।

হত্যাকাণ্ডের পর খুনী মূল্যবান হীরা-জহরত যা ছিল নিয়ে গেছে। সেজন্য মহারাজার মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। বললেন—কলকাতায় আমি আর বাড়িঘর রাখবো না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মহারাজা গাড়ি নিয়ে বেরুলেন। শখের গাড়ি, নিজেই ড্রাইভ করেন। এলোমেলো খানিকটা ঘোরাফেরা করে ফিরলেন সেই রাত সাড়ে-আটটায়। দারোয়ান সদর বন্ধ করলো। জগারাম তখন রাত্রের রান্না-খাওয়ার আয়োজন করতে ব্যস্ত।

ঘণ্টাখানেক পরে—অন্ধকার তখন বেশ জমাট বেঁধেছে। হঠাৎ দেখা গেল, নিঃশব্দে জগারাম গুটি গুটি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বাড়ির পিছন দিকে কয়েক কাঠা জমি পড়ে ছিল। সেখানে বেশ কিছু ফুল ও ফলের গাছ। মাঝে একটু বসবার মতো বাঁধানো চত্বর। জগারাম সন্তর্পণে সেই চত্বরটার একটা কোণে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর চারিদিকে নজর বুলিয়ে নিয়ে একটা রুটি-কাটা ছুরি দিয়ে সে মাটি খুঁড়তে শুরু করলো। নরম মাটি—অল্পক্ষণের মধ্যে প্রায় হাত দুয়েক গর্ত হয়ে গেল।

জগারাম এবার সেখানে হাত ভরে দিয়ে ঢাকনিওয়ালা বড় একটা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র বের করলো। তারপর আবার গর্তে মাটি চাপা দিয়ে পাত্রটা হাতে নিয়ে চলে গেল বাড়ির মধ্যে।

পাঁচিলের বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক—নিঃশব্দে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। কোন কিছুতেই তার নজর এড়াল না। জগারাম ভিতরে ঢুকে যেতেই সে গিয়ে টেলিফোন করলো কাছাকাছি এক বাড়ি থেকে ঃ হ্যালো! হ্যাঁ, আমি মৃণাল কথা বলছি—

রাত দশটায় মহারাজা যখন শোবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় টেলিফোন এলো—আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করছি বলে কিছু মনে করবেন না। আমি আপনার নিহত সেক্রেটারী রবীন মিত্রের পরিচিত। খুনখারাপির ব্যাপার নিয়ে এক-আধটু মাথা ঘামাই। রবীনবাবুর খুন ও আপনার বাড়িতে ডাকাতি নিয়ে আমি বেশ কিছু ভেবেছি। যদি আমার বিশ্লেষণ ঠিক হয়, তাহলে সমস্ত হীরে-জহরত উদ্ধার হতে পারে। খুনীর সন্ধান আমি পেয়েছি বলা যেতে পারে; তবে এজন্য আপনাকে দেড় লাখ টাকা নগদ খরচ করতে হবে। নিহত রবীনবাবুর বিধবা মাকে দিতে হবে এক লাখ টাকা, আর আমার ফী পঞ্চাশ হাজার।

—অতো টাকা এখন কোথায় পাই?

—আপনার ব্যাঙ্কে কয়েক লাখ টাকা ফিক্সড্ ডিপোজিট আছে। তা থেকে টাকাটা দেবেন। আপনার হীরে-জহরতের দাম তার চেয়ে অনেক বেশী। যদি দিতে রাজী থাকেন, কাল সকালে 'প্রতিশ্রুতি' লিখে রাখবেন, আমি কাজে বেরুবার পথে আপনার বাড়ি হয়ে যাবো। আপনার স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র পেয়ে তবে আমি কাজে হাত দেবো। হয়তো কালই সমস্ত জহরত আপনি পেয়ে যাবেন। আজ সারারাত এবং কাল সকাল দশটা অবধি ভেবে দেখুন, কি করবেন।

ওপার থেকে বক্তা টেলিফোন ছেড়ে দিল।

আড়াইটের ট্রেন। একটার সময় হাওড়া স্টেশনের টিকিট-ঘরের সামনে এসে লাইনে দাঁড়ালো জগারাম। তার হাতে একটা স্টিলের সুটকেস ছাড়া আর কিছু নেই। গোবিন্দ তারই জন্য অপেক্ষা করছিল। এগিয়ে গিয়ে তার হাত থেকে সুটকেসটা কেড়ে নিল। জগা চিৎকার করে উঠলো—একি! একি!

—এসো। একবার আপিসে যেতে হবে।

—কোন্ আপিসে?

—এই যে রেলওয়ে পুলিশ।

—পুলিশ! পুলিশ কেন?

—দরকার আছে।

জগা ঘাবড়ে গেছে। সে এদিক-ওদিক চায়—পালানোর মতলব। গোবিন্দ বললো—পালানোর চেষ্টা করো না। তার ব্যবস্থা করেই এসেছি।

তারপর সে জগার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বড় ঘড়িটার নীচে। চারপাশে কৌতূহলী জনতা। গোবিন্দ বললে—খোলো সুটকেস। কত টাকা আছে দেখি।

—টাকা!

—হ্যাঁ, মহারাজের জহরতের দাম।

—কী বলছেন!

—বাজে বকো না, সুটকেস খোলো। সেক্রেটারী রবীনবাবুকে খুন করে তুমি জহরত চুরি করেছিলে; এখন মাড়োয়াড়ীর কাছে বেচে ক' লাখ টাকা পেলে, তাই জানতে চাই।

—আমি খুন করেছি! আপনি কি বলছেন! অ্যাঁ, আপনিই তো আদালতের সেই উকিলবাবু, আপনিই তো আমাকে খালাস করে আনলেন আদালত থেকে!—জগারামের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ, তা না আনলে তোমার এই খুন-রাহাজানি ধরা পড়তো না। এখন সুটকেসটা খুলে ফেলো দিকি ভাল ছেলের মতো।

জগা থর-থর করে কাঁপছে। পরক্ষণে গোবিন্দর এক ধমক খেয়ে সুটকেসটা সে খুলতে বাধ্য হলো। কয়েকটি জামা-কাপড়ের নীচে একটি কাগজের প্যাকেট, প্যাকেটে তাড়া একশো টাকার নোট বাঁধা। গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করলো—কত?

—পঞ্চাশ হাজার।

গোবিন্দ বললো—হুঁ, বাকী পঁচাত্তর হাজার তাহলে দলের অন্য দু'জন নিয়েছে।

তারপর সুটকেস বন্ধ করে সেটাকে হাতে নিয়ে সে বললো—এসো আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—যে মারোয়াড়ী টাকাটা দিয়েছে তার বাড়ি।

জগা ছিটকে সরে পড়তে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক যুবক এসে তার হাত ধরলো। বললো—ছিঃ, ও চেষ্টা ক'রো না। চল।

বাইরে এসে পুলিশের গাড়িতে তারা গেল লালবাজার। তাপর সেখানে থেকে লোকজন নিয়ে বিবেকানন্দ রোডে এক মারোয়াড়ীর গদীতে গিয়ে হাজির।

মারোয়াড়ী মহানন্দে তাকিয়া হেলান দিয়ে ভুঁড়িতে হাত বোলাচ্ছিল, মহারাজার দশ লাখ টাকার জহরত এক লাখ পঁচিশ হাজারে সিন্দুক জাত করেছে—এ কি কম কথা! হঠাৎ পুলিশ দেখে হকচকিয়ে গেল।

গোবিন্দ জিজ্ঞেস করলো—খুনীকে সাহায্য করার ব্যাপার.....কালো টাকা কত জমিয়েছ শেঠজী? মহারাজের হীরেগুলো বের করে দাও আর থানায় চল—

মারোয়াড়ীর মাথায় চকিতে বুদ্ধি খেলে গেল। বললো—হৈ-চৈ করবেন না

বাবুজী, এখানে সবাই আমায় খাতির করে। হীরে-জহরত আমি দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা আমাকে নিয়ে আর জড়াবেন না। যা লাগে, আমি দেবো।

ঘুষে বাঙালীকে কেনা যায় বলে মারোয়াড়ীর ধারণা। সে-ভুল তার ভাঙলো। তাকে লালবাজারে যেতে হলো।

ঘণ্টা দুয়েক পরে পুলিশ গিয়ে মহারাজের বাড়ির পিছন দিকে মাটি খুঁড়ে রক্তমাখা ছোরাখানি বের করলো। জগার সাগরেদ দুজন আগেই ধরা পড়েছে। তাদের মধ্যে একজন হলো দাগী আসামী। তাদের দিক থেকে নজর সরিয়ে দেবার জন্যই সে চিঠিখানা লিখেছিল।

রবীন মিত্রের হত্যার মামলা নতুন করে শুরু হলো।

গোবিন্দ ইতিপূর্বে মহারাজার কাছ থেকে দেড় লাখ টাকা আদায় করে নিয়েছে। লাখ টাকা সে দিয়ে এল রবীনের বৃদ্ধা মায়ের হাতে আর নিজে রাখলো পঞ্চাশ হাজার। তার মন্তব্য—প্রজাদের শোষণ-করা টাকার তবু কিছুটা সদ্ব্যয় হলো।

মুখার্জী ভিলায় খুন

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাইভেট ডিটেকটিভ জটিলেশ্বর খাস্তগীর সবে ভোরবেলার প্রথম চায়ে চুমুক দিয়েছেন, টেলিফোনের রিং বেজে উঠল। গতকাল গভীর রাত অবধি মুখার্জী ভিলার সেই খুনের ঘটনা নিয়ে ওঁকে অনেক দৌড় ঝাঁপ করতে হয়েছে, ভেবেছিলেন আজ সারাটি দিন একটু বিশ্রাম নেবেন, কিন্তু ফোনটা বেজে উঠতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, কে রে বাবা! এত সকালে আবার কে ফোন করে।—রিসিভার ধরলেন, হ্যালো

উত্তর এলো, স্যার, আমি সাতকড়ি। পাখিটার খোঁজ পাওয়া গেছে স্যার।

পাখি! মাথাটা কেমন ভারী হয়ে আছে, কেমন একটু আমতা আমতা করলেন জটিলেশ্বর। পাখি? কেমন পাখি?

—সেই যে মুখার্জী ভিলায় খাঁচা থেকে উড়ে পালিয়ে ছিল স্যার। দুধরাজ পাখি! আপনি যার খোঁজ করতে বলেছিলেন।

এবার সব কিছু চোখের ওপর ভেসে উঠল জটিলেশ্বরের। হ্যাঁ, এই পাখিটাকেই

দরকার। মুখার্জী ভিলার ভেতরে যখন খুনের ঘটনা ঘটে। তখন ঐ পাখিটাই একমাত্র চাক্ষুষ সব ঘটনা দেখেছিল। ওকেই সাক্ষী মানতে হবে। জটিলেশ্বর এবার একটু উত্তেজিত বোধ করলেন। পেয়েছে! কোথায় পেলে?

সাতকড়ি বলল, এখনো স্যার ধরা পড়েনি। তবে চিড়িয়াখানার জঙ্গলে ওটা ঘোরাঘুরি করছে। এই মাত্র রামমূর্তি সাহেব খবর পাঠিয়েছেন স্যার।

—ঘোরাঘুরি করছে! ধরতে বলো নি?

—বলেছি স্যার। ওঁরা লোকও লাগিয়েছেন। ধরা পড়লেই আমাদের জানাবে স্যার।

জটিলেশ্বর এক মুহূর্ত কি ভাবলেন। গতকাল রক্তমাখা ডেডবডিটার পাশে ঐ খাঁচাটা দেখে কেমন যে সন্দেহ হয়েছিল জটিলেশ্বরের।

মুখার্জী সাহবে চোখ তুলে তাকিয়ে ছিলেন, দেখতেই তো পাচ্ছেন খাঁচা রয়েছে।

—কি পাখি?

মুখার্জীসাহেব বলেছিলেন, রেয়ার ভ্যারাইটি। দুধরাজ।

—দুধরাজ! কি রকম পাখি? জটিলেশ্বর ও রকম কোন পাখির নাম কোনদিন শোনেন নি। প্রশ্ন করলেন, কি রকম দেখতে? একটু দেখাতে পারেন?

মুখার্জীসাহেব তেরছা চোখে একবার তাকালেন, কি করে দেখাব, দেখছেন তো খাঁচা শূন্য। পাখিটা উড়ে গেছে।

জটিলেশ্বর বুঝতে পারছিলেন, মুখার্জীসাহেব এমনিতেই খুব ভেঙে পড়েছেন, তার উপর পাখির কথাতে এখন বিরক্তই হচ্ছেন। কিন্তু জটিলেশ্বরের ঐ পাখিটাকেই দরকার।

বললেন, পাখিটা সম্পর্কে একটু কিছু বলুন দয়া করে।

মুখার্জীসাহেব উঠে দাঁড়ালেন, উত্তেজনায় একটু এপাশ ওপাশ করলেন, তারপর জটিলেশ্বরের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি জানতে চান, বলুন?

—পাখিটা কিনেছিলেন নিশ্চয়ই? কোথা থেকে কিনলেন?

মুখার্জীসাহেব বললেন, কিনি নি। লোক লাগিয়ে সুন্দরবন থেকে আনিয়েছিলাম। সুন্দর বনের ওখানে ওরকম দুধরাজ, রক্তরাজ, ভীমরাজ, পাখিদের মাঝে মাঝে দেখা যায়। বেশ পয়সা খরচ হয়েছিল আমার ওরকম একটা পাখিকে আনাতে।

—নিশ্চয়ই পাখিটার কোন বিশেষত্ব আছে?

মুখার্জীসাহেব গম্ভীর হলেন, তা নিশ্চয়ই আছে, নইলে আর আনাব কেন? পাখিটা খুব অল্পতেই কথা শিখতে পারে। অনেক কথা শিখিয়েছিলাম ওকে।

জটিলেশ্বর খুব উৎসাহ পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, টেপ করেন নি?

—না

—ওর কোন ছবি নেই আপনার?

মুখার্জীসাহেব বললেন, অ্যালবাম ঘাঁটলে পেতেও পারেন।

—কি কি কথা শিখিয়ে ছিলেন, দুটো একটা বলুন না মিস্টার মুখার্জী?

মুখার্জীসাহেব আবার টুলের ওপর গিয়ে বসলেন, কি শিখিয়েছিলাম, শুনবেন? এমন কিছুই না, সাধারণ কিছু কথা, 'মলিনা, কথা কও।' 'রাগ করো না, মলিনা।'

—মলিনা, মানে আপনার স্ত্রী। যিনি খুন হয়েছেন?

—হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। মুখার্জীসাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

জটিলেশ্বরের বুকের ভেতর উত্তেজনা থরথর করে উঠল, পাখিটাকে একবার হাতের কাছে পেলেই যেন অনেক রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। যে ভাবেই হোক পাখিটাকে চাইই।

মলিনাদেবীর দেহটাকে আর একবার পরীক্ষা করে নিলেন জটিলেশ্বর। দুটো গুলির চিহ্ন রয়েছে ওর গায়ে। একটা বুকের বাঁ পাশে ঢুকে গেছে। আর একটা কাঁধের একপাশ লেগে বেরিয়ে গেছে। সন্দেহ নেই এই গুলিটাই মলিনাদেবীর কাঁধ ছুঁয়ে সটান পেছনের ওই খাঁচাটাকে আঘাত করেছিল। আর তাইতে খাঁচার জাল কেটে গিয়ে খানিকটা জায়গা ফাঁক হয়ে রয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে দুধরাজ পালিয়েছে।

আততায়ী মলিনাদেবীর খুন করার সময় ঐ পাখিটার কথা একদম খেয়াল করে নি। খেয়াল করার কথাও নয়। সামান্য তো একটা পাখি, সে কি ক্ষতি করবে।

মুখার্জীসাহেবের অ্যালবাম থেকে পাখির ছবিটাকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন জটিলেশ্বর। তারপর সেই ছবি নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন জুলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে। নাম করা জুলজিস্ট প্রতুলবাবুর সঙ্গে দুধরাজ সম্পর্কে অনেক আলোচনা সারলেন। প্রতুলবাবু যা বললেন, তাতে উৎসাহ পাওয়ারই কথা। দুধরাজ পাখির কথা শুনে প্রতুলবাবু খুব আশ্চর্যই হয়েছিলেন। সে কী মশাই, কলকাতা শহরে কেউ দুধরাজ পাখি পোষে জানতুম নাতো! যিনি পোষেন তিনি যে খুব রসিক তাতে সন্দেহ নেই। জানেন, এই পাখির স্মরণশক্তি খুব বেশি। তেমন কিছু উত্তেজক ঘটনা ঘটলে ও সাড়া দেবেই।

জটিলেশ্বর আর উত্তেজনা দমিয়ে রাখতে পারেন নি, তার মানে, এই পাখিটার সামনেই যে হত্যাকাণ্ড হল, পাখিটা নিশ্চয়ই সে ব্যাপারেও কোন প্রতিক্রিয়া করেছিল?

—করাই তো স্বাভাবিক। হেসেছিলেন প্রতুলবাবু! সাধে আপনাকে সবাই নাম করা ডিটেকটিভ বলে, ঠিক পয়েণ্টটা আপনি বেছে নিয়েছেন। কিন্তু কি জানেন, পাখিটা সত্যি সত্যি দুধরাজ কিনা, সেটা আগে ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার। কলকাতা শহরে কোন দুধরাজ পাখি আছে বলে কিন্তু আমাদের জানা নেই।

—চিড়িয়াখানায়?

—না, ওখানেও নেই। আমাদের এখানে অবশ্য দুটো স্পেসিমেন আছে, কিন্তু তা জীবন্ত নয়। একটু থেমে প্রতুলবাবু বলেছিলেন, দুধরাজ পাখিই যদি হয়ে থাকে,

তাহলে অবশ্য মনে তো হয় মার্ডারার খুঁজে বার করতে কিছুটা সাহায্য আপনি পেতেও পারেন। তবে হ্যাঁ, পাখিটার যদি সন্ধান পান, দয়া করে আমাদেরও একটু খবর দেবেন।

জটিলেশ্বর প্রতুলবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা চলে গিয়েছিলেন থানায়। থানা কি ভাবছে একটু জানা দরকার।

থানায় গিয়ে নির্মলবাবুর সঙ্গে দেখা করতেই নির্মলবাবু একগাল হাসলেন, আসুন জটিলদা। মুখার্জী ভিলা দেখে এলেন। চা না কফি?

খিদেও পেয়েছিল জটিলেশ্বরের। বললেন, শুধু চা কফিতে হবে না, কিছু সলিড খেতে হবে। শিককাবাব বা স্যাণ্ডউইচ আনান দেখি।

—তথাস্তু! নির্মলবাবু রঘুকে খাবার আনতে পাঠিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বুঝতে পারছেন কেসটা? আমার তো মনে হয়, সেই নেপালী দারোয়ানের কীর্তি ওটা।

—নেপালী দারোয়ান! মানে ভক্ত সিং? কিন্তু মুখার্জীসাহেবই তো বললেন, গতকাল সকালে লোকটা সাতদিনের ছুটি নিয়ে দেশে গেছে।

—হ্যাঁ, ঐ তো চাল। দেশে যাওয়ার নাম করে হয়তো কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। ওর দেশে ও গেছে কিনা তা আমরা খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করছি।

নির্মলবাবুর কাছে পাখিটার কথা ভুলেও উচ্চারণ করলেন না জটিলেশ্বর। থানার লোকগুলি সব মোটা মাথায় চিন্তা করে। ওদের যদি আসল পথটা দেখিয়েও দেওয়া যায়, তা হলেও ওরা সব কিছু ভণ্ডুল করে ফেলবে। মৃদু একটু হাসলেন জটিলেশ্বর।

—আপনিও কি জটিলদা ওই ভক্ত সিংকেই সন্দেহ করছেন?

জটিলেশ্বর বললেন, এত সহজেই এই কালপ্রিটকে পাওয়া যায় মশাই। খুন যখন হয়, যে খুন করে অনেক ভাবনা চিন্তা করেই করে।

—হঠাৎ মাথা গরম করেও তো কেউ খুন করতে পারে?

—তা পারে। তবে এ খুনের পেছনে অনেক কারসাজি আছে বলেই আমার ধারণা।

কেন, কেন?

রঘু খাবার নিয়ে এল। জটিলেশ্বরের আর দেরি সইছিল না। স্যান্ডউইচ তুলে নিয়ে মুখে পুরলেন। প্রথম কথা, বাড়িতে কে কে থাকেন?

নির্মলবাবু বললেন, মুখার্জীসাহেব আর গিন্নী। গিন্নীই তো খুন হলেন, এছাড়া মালি, চাকর দুটো, রাঁধুনি একজন। আর ওদের সেই নেপালী দারোয়ান ভক্ত সিং।

—ভক্ত সিং না হয় কাল ছুটি নিয়ে চলে গেছে। বাকি যারা তাদের স্টেটমেণ্ট নিয়েছেন?

—নিয়েছি বৈকি।

—তারা কি কাউকে সন্দেহের কথা জানিয়েছে?

নির্মলবাবু হাসলেন, এত সহজে কি কেউ এসব ব্যাপারে মুখ খোলে জটিদা। সবাই এখন নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যই স্টেটমেণ্ট দেবে। তবে কালই ওদের থানায় এনে রুলের গুঁতো দিয়ে কথা বার করার চেষ্টা করব। দেখি কতদূর করতে পারি।

—কাল কেন? আজই নয় কেন? জটিলেশ্বর প্রশ্ন করলেন।

—আজ আর সময় কোথায় বলুন। দশ ঝামেলায় দম বেরিয়ে যাচ্ছে জটিলদা। তা ছাড়া কাল দুপুরের মধ্যেই পোস্ট মর্টমের রিপোর্টটাও পেয়ে যাব।

কফির কাপটা সরিয়ে রাখলেন জটিলেশ্বর। চলি আজ। সেই কোন সকালে বেরিয়েছি। এবার সোজা বাড়ি ফিরব। চলি, গুড নাইট।

দরজা ঠেলে বেরিয়ে যাবার মুখে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন জটিলেশ্বর, ঐ ভক্ত সিংয়ের খবর পেলে কিন্তু দাদা, সঙ্গে সঙ্গে একটা রিং করবেন। লোকটা ছুটি নেওয়ার বারো ঘণ্টার মধ্যেই এরকম ঘটনা ঘটবে, সন্দেহ থাকাই স্বাভাবিক।

সকালে সাতকড়ি পাখিটার খবর জানাতেই জটিলেশ্বর আবার তৈরি হয়ে নিলেন। সাতকড়িকে ফোনে চলে আসতে বলে উনি দুধরাজ পাখির ছবিটা নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ভাবলেন, পাখিটা খুনের সময় ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিল, কিন্তু খুনিকে সে সনাক্ত করবে কি ভাবে! একটু ছেলেমানুষী হয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা। পাখি তো আর নিজের ইচ্ছে মতো কথা বলতে পারবে না। ওকে মুখার্জী সাহেব বা বাড়ির লোকজন যা শিখিয়েছে তাই বড় জোর ও বলতে পারে। তাতে আততায়ীকে খুঁজে পাওয়া যাবে কি ভাবে!

কিন্তু এখন আর পিছিয়ে আসারও সময় নেই। জটিলেশ্বর ঘরের ভেতর দুবার একবার উত্তেজনায় পায়চারি করলেন। এমন সময় গাড়ি নিয়ে হাজির হল সাতকড়ি। স্যার, চলুন পাখিটা নাকি ধরা পড়েছে।

—ধরা পড়েছে! বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন জটিলেশ্বর।

—হ্যাঁ স্যার। আমি ঠিক বেরুতে যাব, এমন সময় চিড়িয়াখানা থেকে রামমূর্তি জানাল, ধরা পড়েছে। ওকে একটা খাঁচায় আটকে রাখা হয়েছে।

—ঠিক বলছ সাতকড়ি? কি লাক আমাদের। চল চল। শিগগির চল।

সোজা চিড়িয়াখানার দিকে গাড়ি হাঁকিয়ে দিল ড্রাইভার। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চিড়িয়াখানায় চলে এল ওরা।

রামমূর্তি গেটেই অপেক্ষা করছিলেন ওদের জন্য। গাড়িটা দেখেই এগিয়ে গেলেন, আসুন জটিলদা, আসুন, নিয়ে যান আপনার পাখি!

—খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে বুঝি? তা হোক। তবু আপনারা ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হল। পাখিটার ভীষণ দরকার। আপনাদের কি বলে যে ধন্যবাদ দেব।

—আরে না, না, এ আবার ধন্যবাদ দেবার কি হল। আসুন, বহাল তবিয়তে পাখিটাকে রেখেছি।

ছোট্ট একটা খাঁচায় দুধরঙের ছোট্ট একটা পাখি। ভারী সুন্দর দেখতে। খাঁচার গায়ে হাত রাখলেন জটিলেশ্বর। পাখিটাকে আদর করতে ইচ্ছে করছিল ওর। আদর করলে পাখি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, অন্তত প্রতুলবাবুর মতো পাখিটার শরীরে তার প্রতিক্রিয়া হবে। কিন্তু কোনরকম প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ল না জটিলেশ্বরের। ব্যাগ থেকে দুধরাজের ছবিটা বার করলেন, হাঁ অবিকল মিল। এটা যে দুধরাজই সন্দেহ নেই!

সাতকড়ি বলল, স্যার, এটাই যে মুখার্জীসাহেব পুষতেন এমন তো নাও হতে পারে!

—কি রকম?

—হয়তো এটা অন্য কোন দুধরাজ। মুখার্জী ভিলারটা পালিয়ে গেছে কোথাও।

—অসম্ভব, হতে পারে না। এ পাখি কদাচিৎ চোখে পড়ে। কি বলুন মিস্টার রামমূর্তি, কখনো দেখেছেন এ পাখি?

রামমূর্তি স্বীকার করলেন, পশুপাখি নিয়েই ওদের কারবার কিন্তু এই দুধরাজ ওরা প্রথম দেখলেন।

জটিলেশ্বর বললেন, আসল হোক, নকল হোক, চল এবার সোজা মুখার্জী ভিলায় যেতে হবে! ও বাড়ির লোকেরাই বলতে পারবে এটা ওদেরই পাখি কি না।

গাড়ি মুখার্জী ভিলার দিকে ছুটল। পাখির খাঁচাটা যত্ন করে ধরে রাখলেন জটিলেশ্বর!

দু'একবার পাখিটার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেন, 'মলিনা, কথা কও!' নাঃ, পাখিটা যেন বোবা। কথা-ফথা কোনদিন ওকে শেখান হয়েছে বলেই মনে হয় না।

মুখার্জী ভিলার সামনে গাড়িটা যখন এসে দাঁড়াল ঘড়িতে তখন বেলা বারোটা।

দূর থেকে বাগানের মালি এগিয়ে এল। স্যার—

জটিলেশ্বর শুধোলেন, সাহেব কোথায়? তোমাদের দুধরাজ আমি নিয়ে এসেছি।

ততক্ষণে বাড়ির চাকর দুটোও এগিয়ে এসেছে। সাহেব তো বেরিয়েছেন হুজুর।

—বেরিয়েছেন? কোথায়?

—কিছু বলে যান নি স্যার। তবে এখনি ফিরে আসবেন বলে গেছেন!

এক মুহূর্ত কি ভাবলেন জটিলেশ্বর। ঠিক আছে, পাখিটা যেখানে থাকত সেখানে চল। পাখিটাকে চিনতে পারছ তো?

তিনজনেই এক সঙ্গে উত্তর দিল, হ্যাঁ, স্যার। এটাই আমাদের খাঁচায় ছিল।

ওরা মুখার্জী ভিলায় এসে ঢুকে পড়ল। সেই হলঘরের মতো জায়গায়, যেখানে মলিনাদেবীর বডিটা পড়েছিল সেখানে চলে এল ওরা!

জটিলেশ্বর পাখিটাকে তার নিজের জায়গায় বসিয়ে দিলেন! তারপর মালির দিকে তাকালেন, তোমাদের পাখি তো কথা বলতো?

—হ্যাঁ স্যার।

—দেখ না, আবার কথা বলতে পারে কিনা।

বুড়ো মালি খাঁচার কাছে এগিয়ে গেল। ডাকল দুধরাজ কেমন পালকের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে বসে আছে। সত্যি সত্যি কথা বলা যেন ভুলেই গেছে।

—দুধরাজ! আবার ডাকল মালি।

—এবারও উত্তর এল না।

চাকরদের মধ্যে একজন টুসটুসে পাকা একটা লঙ্কা এনে পাখিটাকে খেতে দিল। ওকি রে? খাবি না? না, পাখিটার যেন রুচিও নেই।

হতাশ হয়ে পড়েছিলেন জটিলেশ্বর। এত করে পাখিটাকে ধরা হল, কিন্তু—

সাতকড়ি বলল, স্যার, সব বাজে কথা। পাখি কথা বলে না হাতি।

জটিলেশ্বর খাঁচা থেকে খানিকটা দূরে একটা টুলের ওপর বসলেন। হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন পাখিটার দিকে। কে বলবে, এই পাখিকেই কথা শেখান হয়েছিল।

ওদিকে দরজার পাশে তখন রাঁধুনীকে দেখা যেতেই জটিলেশ্বর ডাকলেন, কে ওখানে? এদিকে এস।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাঁধুনী এসে ঘরে ঢুকল।

—তুমি রান্না কর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমাদের এই পাখি কথা বলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বলাও দেখি।

—মহিলাটি এগিয়ে গেল খাঁচার কাছে, দুধরাজ।

আশ্চর্য! চমকে উঠলেন জটিলেশ্বর। পাখিও উত্তর করল, দুধরাজ।

—কথা কও।

পাখিও আবৃত্তি করল, কথা কও।

অবিকল মানুষের গলা। পাখিটার দিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারলেন না জটিলেশ্বর।

রাঁধুনী এবার পিছিয়ে এল। জটিলেশ্বর বললেন, ঠিক আছে তুমি ওপাশে বস। আবার মালির দিকে তাকালেন, কি হল তুমি আবার চেষ্টা কর মালি? কথা বলাও।

মালি এগিয়ে যাচ্ছিল খাঁচার দিকে, এমন সময় বাইরে মোটরের শব্দ পাওয়া যেতেই সবাই চমকে উঠল, হ্যাঁ মুখার্জী সাহেবই ফিরলেন বোধহয়।

মালি এগিয়ে গিয়ে নরমভাবে ডাকল, দুধরাজ!

উত্তর এল, দুধরাজ।

—তবে যে তখন চুপ করে ছিলি? মালি আবার দু পা পিছিয়ে এল।

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন মুখার্জীসাহেব। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই নাটকীয় ঘটনাটা ঘটে গেল। দুধরাজ ছটফট করে লাফিয়ে উঠল খাঁচার মধ্যে, 'মেরো না, গুরুম।'

—হ্যাঁ পাখিটাই কঁকিয়ে উঠেছে, মেরো না, মেরো না, গুরুম।'

—দুধরাজ! চিৎকার করে উঠলেন মুখার্জীসাহেব। জটিলেশ্বর লক্ষ্য করলেন, মুখার্জীসাহেবের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে। আর পাখিটাও ভয়ে খাঁচার ওপাশে গিয়ে এইটুকুন হয়ে গেছে। কী ভীষণ ভয় পেলে তবে ওরকম হতে পারে কেউ।

—কোথায় পেলেন এ পাখি! দাঁতে দাঁত চেপে জটিলেশ্বরকে প্রশ্ন করলেন মুখার্জীসাহেব।

জটিলেশ্বর উঠে দাঁড়ালেন, এখন থানায় চলুন। সেখানেই জানতে পারবেন, কিভাবে দুধরাজকে আবার পাওয়া গেল।

—আপনি কি বলতে চান?

—না না, ওদিকে না। চলুন। বাইরে আমাদের গাড়ি রয়েছে, সে দিকে চলুন।

রিভালবারটা দু আঙুলে শক্ত করে চেপে মুখার্জীসাহেবের পিঠের উপর ঠেকিয়ে রাখলেন জটিলেশ্বর। পালাবার চেষ্টা করলে কি হবে বুঝতে পারছেন, চলুন বলছি।

মাথা নিচু করে মুখার্জীসাহেব বেরিয়ে এলেন বাইরে। জটিলেশ্বরের নির্দেশ মতো উঠে বসলেন গাড়িতে।

হীরের মুকুট উদ্ধার

তপতী চক্রবর্তী

আমাদের আড্ডার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু ছিল ভূতের গল্প। ভূতের গল্প ভাল বলতে পারতেন চৌধুরী মশাই। তিনি কেবল শনিবার দিন আসতেন।—আরে, এসো, এসো নবারুণ। সলজ্জ হেসে বললাম, আমার একটু দেরী হয়ে গেছে—

—হবার তো কথাই। সারাদিন যা চলেছে। ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা আর গরম পেঁয়াজী ভর্তি প্লেট নিয়ে নীলরতনের ভৃত্য রামদীন এল, চৌধুরী মশাই শুরু করলেন, বছর দশ আগের ঘটনা। কয়েকটা ব্যাপারে মোটা টাকার লোকসান হয়ে আমার অবস্থা খারাপ। মাথায় ঋণের বোঝা নিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। শুধু ভাবনা নিয়ে বসে থাকা আমার স্বভাব নয়।

একটা চরম দুঃসাহসের কাজ সেরে ফেললাম দুম্ করে। আমার পিতামহের আমলে গৃহদেবতার মাথায় একটা সোনার মুকুট ছিল, সেটা আমার এক ধনী বন্ধু উৎপলের কাছে রেখে পরিবর্তে টাকা ধার চাইলাম। এমনও বললাম সুদ হিসেবে নয়, ধর তোমারই টাকা খাটছে, তারই একটা লভ্যাংশ আমার টাকা শোধ করার

সময় ধার দেব। উৎপল বলল, ছাড় তো ওসব কথা। জানই তো আমি কুঁড়ে। বাপ ঠাকুর্দা যা রেখে গেছে এখনও তাতে আমার চলে যাবেই। বিপদে তোমায় সাহায্য করব—এর আবার শর্ত কি! শুনে আমার মনে খুবই আনন্দ হল। টাকাটা একটু বেশী যদি দাও। না, তা হবে না, এইবছর অজন্মা যাচ্ছে।

যাই হোক টাকা নিয়ে আমি চলে এলাম। ঘড়ির কাঁটার যেমন বিশ্বাস নেই, ঠিক তেমনই—যদি খাটতে পারতাম, এই কথাই শুধু মনে হোত। সুদিনের মুখ দেখলাম। যেমন কথা দিয়েছিলাম সেই মত টাকা নিয়ে উৎপলের কাছে গেলাম। সে বললো, যাক, তুমি এসে গেছ। আমার জিনিসটা? সে আর বলতে, উৎপল ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠে অন্দরমহলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে এনে দিল আমার বাঞ্ছিত বস্তু। টাকা গুণে নিয়ে সে বলল, ঠিক আছে।

তারপর—। আশ্চর্য! শুধু আশ্চর্য নয় অদ্ভুত। সেইদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম মিশকালো রঙ—যমদূতের মত ষণ্ডা চেহারার একটা লোক সিন্ধুক ভেঙে সেগুলো চুরি করছে। তার মুখটা সেই বন্ধুর মত অবিকল। মনের সব খুশী ম্লান করে দিল। বাকী রাতটুকু ঘুম এল না। কি সে দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে সময়টুকু কাটলো। সকাল হতে জুয়েলারকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সব পাথরগুলো খাঁটী তো? তিনি দেখে শুনে বললেন, পাথরগুলো সব ঝুটো। বিলিতি কাঁচ। আমি মাথা ঘুরে পড়েই যেতাম। জুয়েলার অমৃতবাবু বললেন, আমাকে আপনি না জানিয়ে কেন লেন-দেন করলেন? আমি নিষ্প্রাণ জড়দেহ প্রাপ্ত হয়েছি। অনেকটা সময় কাটলো ধাক্কা সামলাতে। মনে মনে ঠিক করলাম আমার উকিল বন্ধু শঙ্করের শরণাপন্ন হব। তাকে সমস্ত কথা সবিস্তারে বললাম তার বাড়ীতে গিয়ে। আমি কি করতে পারি? সে বললো, তুমি অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবে? তিনি এত বড় ধনী লোক। তোমার কথা লোকে বিশ্বাস করবে? কিছুদিন আগে তুমি যে লালবাতি জ্বেলে বসেছিলে একথা সকলে জানে। হিংসেয় বদনাম দিচ্ছ না তাই বা কে জানে। তাহলে কি প্রতিকার হবে না? উনি যে নিয়েছে সেটা প্রমাণ করতে হবে। জিনিসটা আদায় করতে হলে অনেক কাঠ খড় চাই। একটু হতাশ হলাম। তুমিই বল কি করি? শঙ্কর একটু চিন্তামগ্ন হল। কিছুক্ষণ পর বলল, একটা ফন্দি মাথায় এসেছে। কি? উত্তেজনায় আমার গলা কাঁপছে।

তোমার হাতের আংটিটা কি পাথর? রক্তমুখী নীলা না। কত দাম হবে পাথরটার? শঙ্করের এই কথা শুনে বুঝতে পারলাম না হঠাৎ আংটির পাথরের মূল্য কোন্ কাজে লাগবে? ছ'রতি ওজনের পাথর। 'তোমায়' দু'চার দিনের জন্য ওটা কাছ ছাড়া করতে হবে, পারবে না? না, ওটা কাছছাড়া করতে নেই। আমার একটা হীরের আংটি আছে এই দামেরই—।

ঠিক আছে সেটাতেই হবে। শঙ্কর বললে, তোমার সে মহাজন মহাশয়ের কাছে

যা পাও টাকার বিনিময়ে তোমার হীরের আংটিটা বাঁধা রাখতে হবে। অভিনয় যেন নিখুঁত হয়। বলবে, আচমকা টাকার দরকার বেশী না হলেও সামান্য হাজার দুই টাকার জন্য ঠেকে গিয়েছে একান্তই। আরো এ কথাটা অবশ্যই বলবে বেশী টাকার দরকার হলে মুকুটটাই রাখতে হত আবার। এখন সামান্যতেই চলে যাবে। তারপর?

তারপর দেখতেই পাবে, শঙ্কর হাসলো। শঙ্করের কথামত সেই মহাজন বন্ধু উৎপলের কাছে গেলাম আংটি নিয়ে। হীরেটার উজ্জ্বলতা চোখে লাগে। বেশ কিছুক্ষণ সে আংটিটার দিকে চেয়ে রইলো, বললে, টাকার দরকার? অভিনয় ত্রুটিহীন করার চেষ্টা করে বললাম, হঠাৎ এমন মুশকিলে পড়ে গেছি ভাই। সে তো বুঝতেই পারছি। তোমার তো বেশ চলছিল।

তা চলছিল, কিন্তু এখন নগদ টাকা একেবারে নেই। হুঁ। দু হাজার চাই? উপস্থিত ওতেই হবে।

বেশ, দিচ্ছি। বলে উৎপল একটু উৎসুক ভাব ফুটিয়ে তুললো মুখে। তোমার গৃহদেবতার মুকুট পরানো হয়েছে?

নিশ্চয়ই—একটা ভাল দিন দেখে পরিয়েছি। খুব ভালো, খুব ভালো।

টাকা নিয়ে চলে এলাম। শঙ্করের সঙ্গে দেখা করে বললাম সাক্ষাৎকারের বিবরণ। সব শুনে সে বললে, ঠিক আছে। এবার যা করবার করছি। কি করবে পরে বলবো। তুমি আগামী কাল এসো।

পরদিন গেলাম। আগ্রহভরে বলি, কতদূর শঙ্কর? শঙ্কর বিজয়ীর মত হাসলো। জাল পেতেছি। কিছু ধরা পড়লো?

নিশ্চয়ই, বলে ধোঁয়াটে হাসলো। অধৈর্য হয়ে পড়লাম, তুমি খুলে বলো। ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর! বাঁধ বাঁধ বুক—কবি বলেছেন।

ভাই শঙ্কর—। বুঝেছি তোমার খুব রাগ হচ্ছে আমার উপর। শঙ্কর উচ্চ হেসে বলে, শোন, জালে বিখ্যাত এক জুয়েলার ধরা পড়েছে। এরই মারফৎ চোরাবাজারী, লেনদেন তোমার মান্যবর বন্ধু করে থাকেন। তার বাড়ীতেই তোমার আংটি আর হীরে চলে গিয়েছে। তার বদলে অন্য পাথর লাগানো হয়েছে তোমার আংটিতে। লোক রেখেছিলাম তার বাড়ীতে নজর রাখার জন্য। কেমন দেখতে এবং কে কে সেখানে যায় তার একটা তালিকা সে আমায় দিয়েছে। এ জেনে কি করবে? আমি হতাশ হয়ে পড়ি। এই জুয়েলারটিকে ছলে বলে কৌশলে আমাদের দলে টেনে আনতে হবে। যদি জুয়েলার রাজী না হয়? যাতে হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। তোমার কোন বিপদ—

তা হবার সম্ভাবনা আছে। তা বলে ভয়ে বসে থাকলে চলবে না। শঙ্কর কঠোর কণ্ঠে বললে, সমাজের শত্রুদের উচ্ছেদ করার জন্যই আমার পুলিশের চাকরী নেওয়া। শত্রু আমার অনেক। চোর ছ্যাঁচোড় খুনী গুণ্ডাদের চেয়ে এই সব গভীর জলের

মাছেরা ভয়ানক। আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেই বুঝি শঙ্কর বললে, তোমার মুকুটের ঘটনা আমায় বলেছ বলেই এক ভীষণ শত্রুঘাঁটির সন্ধান পেয়ে গেলাম। নইলে সকলের চোখের সামনে দিনের পর দিন উনি ফলাও করে কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন কেমন বংশগত মর্যাদার আড়াল দিয়ে। শঙ্করের কাছ থেকে ভাবনা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরলাম।

তারপর দুদিন কেটে গেছে। শঙ্কর শব্দহীন, তার দেখা পর্যন্ত পেলাম না। সেদিন রাত্রে আকাশ ভেঙে জল নামলো।

চৌধুরী মশাই থামলেন। একটা নতুন চুরুট ধরালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি জানলা পথে বাইরের ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টির মাঝে যেন রহস্যের সন্ধান করছে।

চৌধুরী মশাই আবার শুরু করলেন, সেদিন রাতেও এমনি দুর্যোগ। অনেক রাত্রে একটানা দুম্‌দুম্ দরজায় কার ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল। উঠে পড়লাম। দরজা না খুলে জিজ্ঞেস করলাম, কে? সাড়া এলো পরিচিত কণ্ঠে, আমি শঙ্কর।

দরজা খুললাম। বারান্দার অন্ধকারে একটা লম্বাচওড়া ছায়ামূর্তি। বর্ষাতিতে সর্বাঙ্গ ঢাকা। মাথায় বর্ষরোধক টুপিটা সামনের দিকে হেলানো। কেবল চোখ দুটো যেন জ্বলছে। তোমার ঘুম ভাঙালাম। শঙ্কর হাসলো, বেশ ঘুমুচ্ছিলে আরামে না? তা ঘুমোবার মতই রাত বটে। একটু লজ্জিতভাবে বললাম, ভিতরে এসো।

না সময় নেই। ভরাট গম্ভীর কণ্ঠ। এই নক্সাটা দিচ্ছি। গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর সমরবাবুকে নিশ্চয়ই চেন। তাঁর হাতে এখুনি এটা পৌঁছে দেবে। বলবে নক্সায় পরিস্কারভাবে পথের নির্দেশ দেওয়া আছে। সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে তারা যেন যেতে বিলম্ব না করে আমি সেখানেই যাচ্ছি। তুমি অবশ্যই যাবে। বললাম, এখনি যাচ্ছি।

চাপা হাসির সঙ্গে শঙ্কর বললে, চললাম, সেখানে আমায় দেখতে পাবে। দেরী করো না। বলেই সে হন্ হন্ করে চলে গেল।

সমরবাবু নক্সা দেখে বললেন, শঙ্কর গত দুদিন ধরে ডুব দিয়ে এই করেছে। এই বর্ষায় আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেলল।

ভেতরে ঢুকলাম সকলে। চাপ চাপ অন্ধকার। ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। বাইরে থেকে যতবড় দেখায় তার চেয়ে মস্ত বড় বাড়ি। একটা বড় চৌকো উঠোনকে কেন্দ্র করে সারি সারি ঘর। দরজা জানলা বন্ধ। চামচিকে উড়ছে। টর্চের আলোয় চকিতে সবকিছু দেখে নিয়ে সমরবাবু বললেন, সব ঘরগুলো তল্লাস করবো। কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা তারি কিছু ডালা বন্ধ করার শব্দ হল। সমরবাবু জিহ্বার আওয়াজ করলেন সতর্কতার সঙ্গে, দোতলার দিক থেকে এলো না? তাই মনে হচ্ছে।

চলুন দেখি—।

একজন সিপাইকে নিচে রেখে আমরা দোতলার সিঁড়ির দিকে গেলাম। সিঁড়িতে

উঠছি, কানের কাছে চারদিকে স্পষ্ট কেউ বলছে, কোণের ঘরের দক্ষিণের—ভয় পেলাম। ভুতুড়ে বাড়ি নিশ্চয়ই। কিছু বললাম না কাউকে। শব্দহীন পদক্ষেপে উপরে উঠলাম। দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরটায় যেন কিছু নড়াচড়ার শব্দ, ক্ষীণ আলোর আভাষ। সমরবাবুর পিছনেই আমি। দরজার পাল্লা ভেজানো। একটুখানি ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, ষণ্ডামার্কা জনাচারেক লোক একটা নড়বড়ে কাঠের বাক্স তোলবার চেষ্টা করছে। একজন কেউ বললে, বাগানে গর্ত করে পুঁতে দে। গলার আওয়াজটা ঠিক যেন উৎপলের মত। হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়লাম। হাত তুলে দাঁড়া সব শয়তানগুলো। সমরবাবুর কর্কশ কণ্ঠের আদেশ। সার্জেন্ট, কেউ নড়লেই গুলি করবে।

হাতকড়া পর্ব শেষ হল। লোকগুলোর সব মড়ার মত ফ্যাকাসে মুখ। এখানকার সন্ধান কে দিল পুলিশকে? উৎপলের তখনও ফোঁসফোঁসানি। চোপরাও। সমরবাবু হাঁকলেন জমাদার বাক্স খোল—।

দুত্তোর, পেরেক আঁটা। একটা কিছু খোলবার মত—সমরবাবু ইতস্ততঃ দৃষ্টিচালনা করে বললেন, ঐ যে একটা শাবল—ওটা দিয়ে ডালাটা ভেঙে ফেল।

শাবলের চাপ দিতেই মড়মড় করে ডালাটা খুলে গেল। সমরবাবুর জোরালো টর্চের আলো পড়তেই শিউরে লাফিয়ে উঠলাম। একটা মুণ্ডুহীন দেহ। আর মুণ্ডুটাও হয়েছে বীভৎসতার ভীষণতম এক নমুনার মত। সেটা শঙ্করের। আমি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখলাম মাথার কাছে সমরবাবু ও দুজন পুলিশ। আমি চারিদিকে তাকালাম। বুঝতে পেরে সমরবাবু বললেন, ওদের সব থানাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর এই নিন আপনার আসল মুকুট।

সবাই মিলে জিপে উঠলাম। হারানো মুকুট উদ্ধার হলেও শঙ্করকে মুকুটের জন্য প্রাণ দিতে হল।